দাওয়াতে দীন
ও
তার কর্মপন্থা

মাওলানা আমীন আহসান ইসলাহী

দাওয়াতে দীন
ও
তার কর্মপন্থা

মাওলানা আমিন আহসান ইসলাহী
অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ মূসা

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা—চট্টগ্রাম—খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ২৫ ১৭ ৩১

আঃ প্রঃ ১৭৬

২য় সংস্করণ

জিলহজ্জ	১৪১৫
জৈষ্ঠ্য	১৪০২
মে	১৯৯৫

বিনিময় ঃ ৮৪.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

دعوت دین اور اس کا طریق کار-এর বাংলা অনুবাদ

DAWAT-E--DEEN-O-TAR KARMAPONTHA by Amin Ahsan Islahi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka : 84.00 Only.

ভূমিকা

আমি এই পুস্তকে নবী–রাসূলদের তাবলীগের পন্থা বিস্তারিতভাবে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। বর্তমান কালে লোকদের মনে দ্বীন সম্পর্কে যেমন অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাগ জ্ঞান রয়েছে, তেমনিভাবে দ্বীনের প্রচারের ব্যাপারেও তাদের মধ্যে অত্যন্ত সীমিত এবং ত্রুটিপূর্ণ ধারণা রয়েছে। এই পুস্তকে আমি দ্বীন ইসলামকে একটি জীবন ব্যবস্থা (বাস্তবেও তাই) হিসাবে উপস্থাপন করেছি। তদনুযায়ী এই জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এবং চেষ্টা–সাধনার যেসব দাবী পূরণ করতে হয়, তাও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছি। আমি এই পুস্তকের প্রতিটি অধ্যায়ের ভিত্তি কুরআন মজীদের শক্তিশালী দলীল প্রমাণের ওপর স্থাপন করেছি। অতপর যেখানে প্রয়োজন মনে করেছি, সহীহ হাদীস সমূহের সাহায্যে এর ব্যাখ্যাও করে দিয়েছি। আমি আশা করি, যিনি গভীর মনোযোগ সহকারে এই পুস্তক পাঠ করবেন, তিনি কুরআন বুঝবার ক্ষেত্রেও এ থেকে সাহায্য পাবেন।

আমার বিরুদ্ধে কোন কোন বন্ধুর অভিযোগ রয়েছে যে, আমি খুব সংক্ষেপে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করে থাকি। প্রতিটি পাঠক ভালভাবে বক্তব্য বুঝতে পারবে কিনা, সে দিকে আমি লক্ষ্য রাখিনা। এই পুস্তকের মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ দূর করার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা আমাকে সফলতা দান করুন এবং লোকেরা যেন এ থেকে অধিকতর ফায়দা অর্জন করতে পারে।

বিনীত
আমীন আহসান

সূচীপত্র

১

তাবলীগের প্রচলিত পন্থায় ত্রুটি

একটা উল্লেখযোগ্য সময় ধরে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব উপায় ও পন্থা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ও গৃহীত হয়ে আসছে, তাবলীগ (প্রচার) শব্দটি শুনা মাত্র লোকদের মন-মগজ ও চিন্তা-চেতনা স্বাভাবিক ভাবেই সেদিকে ছুটে যায়। একটা দীর্ঘ সময়ের অনুশীলন যখন কোন কাজের জন্য কোন কর্মপন্থাকে সুপরিচিত করে দেয়, তখন হৃদয়ের ওপর এর ছাপ এমন ভাবে বসে যায় যে, লোকেরা তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছু চিন্তা করতে পারে না। এই কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য ঐ কর্মপন্থাকেই সম্পূর্ন রূপে প্রকৃতিগত পন্থা বলে ধরে নেয়া হয়। যে ব্যক্তিই এই কাজ করতে অগ্রসর হন তিনিও এই পন্থাই অবলম্বন করেন। এমন কি কখনো কখনো কোন ব্যক্তি তা থেকে বেঁচে থাকার সংকল্প নিয়ে ঘর থেকে বের হয়, কিন্তু পথ চলতে চলতে পাও আবার সেদিকেই ফসকে যায় যা থেকে বাঁচার জন্য সে সংকল্প নিয়ে ঘর থেকে বের হয়েছিল। এ জন্য সর্বপ্রথম তাবলীগের বর্তমান পন্থার ভ্রান্তি সমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন।

আমাদের মতে তাবলীগের প্রচলিত পন্থায় জ্ঞানগত এবং কার্যগত উভয়বিধ ভ্রান্তি রয়েছে। অন্য কথায় বুঝানো যেতে পারে যে, তাবলীগের এই পন্থা দার্শনিক দিক থেকেও ভ্রান্ত এবং কর্মপন্থার দিক থেকেও ভ্রান্ত। অতএব এই কারণে ইসলামের তাবলীগের নামে এ পর্যন্ত যত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের দিক থেকে কেবল নিষ্ফলই প্রমানিত হয়নি, বরং এর দ্বারা ইসলামের দাওয়াতের যথেষ্ট ক্ষতিও হয়েছে। আমরা প্রথমে এই পন্থার তত্ত্বগত ত্রুটি সমূহের দিকে ইংগিত করব।

তাবলীগের প্রচলিত পন্থায় বুদ্ধিবৃত্তিক ত্রুটি

প্রথম ত্রুটিঃ ইসলামকে পেশ করতে গিয়ে আজ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় ভুল যা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, দাওয়াত পেশকারীগণ নিজেদের এবং ইসলামের সঠিক ভূমিকা অনুধাবণ করতে পারেননি। এ কারণে তারা ইসলামকে ঠিক সেভাবে তুলে ধরতে পারেনি যেভাবে কুরআন তা মানব জাতির সামনে তুলে ধরেছিল। কুরআন মজীদ ইসলামকে এভাবে উপস্থাপন করেছে যে, সৃষ্টির সূচনা থেকে ইসলামই হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত দীন। যখনই এবং যে জাতির কাছে আল্লাহ তায়ালা কোন নবী পাঠিয়েছেন, এই দীন সহকারেই পাঠিয়েছেন। বিভিন্ন জাতি আল্লাহর মনোনীত এই দীনের মধ্যে অনবরত দোষক্রটির অনুপ্রবেশ ঘটাতে থাকে। এবং আল্লাহ তায়ালা তাঁর

নবীদের মাধ্যমে এসব দোষত্রুটির সংশোধন করতে থাকেন। এমনকি তিনি তাঁর সর্বশেষ রসূলকে পাঠিয়ে তাঁর সব নবী–রসূলদের এই দীনকে সম্পূর্ন সঠিক এবং পূর্ণাংগ অবস্থায় নাযিল করে তাকে চিরকালের জন্য কোনরূপ মিশ্রণ, পরিবর্তন এবং বিকৃতির আশংকা থেকে সংরক্ষিত করে দিয়েছেন। এই দীন কুরআন মজীদের আকারে সংরক্ষিত রয়েছে। এটা কোন বিশেষ জাতির ধর্ম নয়, বরং গোটা মানব জাতির ধর্ম এবং আল্লাহর সব নবীদের আনিত দীন। যে ব্যক্তি তা মেনে নেবে সে মুসলমান নামে পরিচিত হবে। আর যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করবেনা সে অমুসলিম গণ্য হবে। এই দীন আল্লাহর নবীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্যও করেনা, তাঁর প্রেরিত কোন কিতাবকেও প্রত্যাখ্যান করেনা এবং কারো ওপর নিজের একচ্ছত্র মর্যাদাও দাবী করেনা। এর দাবী শুধু এতটুকু যে, এটা সমস্ত নবীদের শিক্ষার নির্ভরযোগ্য সারসংক্ষেপ এবং তাদের শিক্ষার পূর্ণতা বিধানকারী।

কিন্তু আমাদের প্রচারক এবং লেখকগণ এর সম্পূর্ণ উল্টা এই দীনকে মুসলিম জাতির দীন এবং দুনিয়ার সমস্ত ধর্মের শত্রু হিসাবে পেশ করেছেন। এর সত্যতা প্রমান করার জন্য অন্যান্য আসমানী কিতাব সমূহের শিক্ষাকে উপহাস করেছেন। তারা কখনো কখনো আবেগ ও উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করেছেন যে, মুসলমান হিসাবে এবং সমস্ত নবীদের প্রতি ঈমান আনার দাবীদার হিসাবে এই সব কিতাবের যেসব শিক্ষার প্রতি তাদের ঈমান আনার সর্বাধিক দায়িত্ব ছিল তারা এর প্রতিও ঠাট্টা বিদ্রূপ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অপরাপর নবীদের মধ্যে তুলনা করে তাঁদেরকে নীচ প্রমান করার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ কুরআন মজীদে এ ধরণের বিশেষ অগ্রাধিকার এবং মর্যাদা দেয়ার ব্যাপারে পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কুরআনে এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রত্যেক নবীকে কোন না কোন দিক থেকে মর্যাদা দান করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে দৃষ্টি কোন থেকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে বলে দেয়া হয়েছে। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য নবীদের তুলনায় তাঁর বিশেষ মর্যাদা দাবী করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। কিন্তু মুসলমানরা ইসলাম এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ধর্মীয় অন্ধ গোড়ামীর আবেগে তাড়িত হয়ে পেশ করেছে। কেবল সাধারণ পেশাদার বক্তা এবং প্রচারকগণই এই ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়নি, বরং আমাদের বিশিষ্ট লেখক, গ্রন্থকার এবং সংকলকগণও এই ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়েছেন, যাদের রচিত বই–পুস্তক মুসলমান অমুসলমান উভয়ের জন্য ইসলামকে বুঝবার একক মাধ্যম ছিল। আপনি আপনার বিশিষ্ট গ্রন্থকারদের বই পুস্তক খুলে দেখুন যা ইসলামের ওপর লেখা হয়েছে। এ সব

কিতাবে অন্যান্য নবীদের এবং তাদের শিক্ষা সম্পর্কে এমন বিষাক্ত কথাবার্তা পাবেন যা পাঠ করে পরিষ্কার মনে হবে –ইহুদ–খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিল–মুসলমানরাও একই রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু মুসলমানরা এ ধরণের বই পুস্তক সম্মান ও মর্যাদার সাথে হাতে তুলে নিয়েছে এবং এ ধরণের ওয়াজ ও বক্তৃতা উৎসাহ সহকারে শুনে থাকে। কেননা এর দ্বারা তাদের অহংকার ও গৌরবের চাকচিক্য ফুটে উঠে।

পক্ষান্তরে যেসব লোকের রচনাবলী ও বক্তৃতার এই টক–মিষ্টির সংমিশ্রণ ছিলনা–তারা সর্বসাধারণের মধ্যেও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি এবং বিশেষ মহলেও কোন গুরুত্ব পায়নি। এ কথা অস্বীকার করা যায়না যে, এই বিষাক্ত তাবলিগী সাহিত্য সৃষ্টিতে ইসলামের সমালোচনাকারীদেরও অনেকটা দখল রয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে মুসলিম সাহিত্যিকরাই ভুল করেছেন। তারা ভ্রান্তির জবাব ভ্রান্ত পন্থায় দিয়ে ইসলামের অনিষ্ট সাধনে শয়তানের সাহায্য করেছেন। এই ভ্রান্ত পন্থা অবলম্বনের পরিনতিতে অমুসলিমদের মনে পংকিলতা সৃষ্টি হয়ে গেছে এবং তারা ইসলামের ওপর এই দৃষ্টিকোন থেকে চিন্তা করেনি যে, ইসলাম তাদেরকে তাদের ভুলে যাওয়া সত্যকে স্মরণ করিয়ে দিতে এবং তাদের নবী–রসূলদের উত্তরাধিকারীদেরকে তাঁদের দিকে প্রত্যাবর্তন করানোর জন্য এসেছে। বরং এটাকে দুশমন এবং ডাকাতের মত ঘৃনার চোখে দেখেছে যা তাদের কাছ থেকে তাদের দীনধর্মকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের ওপর নিজেই বিজয়ী হতে চায়।

দ্বিতীয় ত্রুটিঃ ইসলামকে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে বুদ্ধিবৃত্তিক ভুল করা হয়েছে, তা হচ্ছে– ইসলামকে একটি জীবন–বিধান হিসাবে পেশ করা হয়নি, যা মানব জীবনের ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত, কর্মগত এবং আকীদাগত সমস্যাবলীকে একটি 'এককে' কেন্দ্রীভূত করে এবং বুদ্ধি ও স্বভাব সুলভ পন্থায় তার সমাধান করে। বরং আমাদের মুবাল্লিগ এবং তার্কিকগণ তাদের সমস্ত শক্তি এমন কতগুলো বিষয়ের ওপর ব্যয় করেছেন যা খ্রীষ্টান এবং হিন্দুদের সাথে ধর্মীয় সংঘাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। যেমন আত্মা এবং জড় পদার্থের চিরন্তনতা ও অতিনবত্ব প্রসংগ, পুনর্জন্মবাদ, মসীহ্ আলাইহিস সালামের প্রভুত্ব এবং ত্রিত্ববাদের ঝগড়া ইত্যাদি। প্রত্যেক ধর্মের একদল পেশাদার তার্কিক এধরণের বিষয়ে খুবই আকর্ষণ বোধ করে। তাদের আসল সাফল্য এই সমস্যাগুলো সমাধান নয়, বরং এগুলোকে আরো বেশী সংবেদনশীল করে তোলাই তাদের লক্ষ্য। এ ধরণের লোকদের লা–জওয়াব করার চেষ্টা করার অর্থ হচ্ছে নিজের শক্তি ও যোগ্যতাকে ক্ষয় করা এবং নিজের সময়কে বরবাদ করা।

কিন্তু আমাদের মুবাল্লিগগণ এ ধরণের দ্বন্দ্বক্ষেত্রে নিজেদের জীবনটা শেষ করে দিয়েছেন। তারা এ কথা চিন্তা করার প্রয়োজনও অনুভব করেননি যে, এগুলো কেবল তর্কপ্রিয় লোকদের আকর্ষণীয় বিষয়–যারা এগুলোর সমাধান চায়না বরং একে আরো জটিল করে তোলাই তাদের উদ্দেশ্য। বাকি দুনিয়া আজ ভিন্নরূপ সমস্যার সম্মুখীন। এগুলোর সমাধান করার জন্য দুনিয়া আজ অস্থির হয়ে পড়েছে এবং এগুলোর সমাধান হওয়ার ওপরই দুনিয়ার মুক্তি নির্ভর করছে। যে ধর্মই সামনে অগ্রসর হয়ে এসব সমস্যার গ্রহণ যোগ্য সমাধান পেশ করতে পারবে তাই হবে সারা দুনিয়ার আগামী দিনের ধর্ম। এমন একটি জগত যা নিজের উদ্ভাবিত পন্থার পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে এবং জীবনের সাংস্কৃতিক এবং সামগ্রিক সমস্যার কোন সমাধান খুজে পাচ্ছেনা সেখানে ইসলামকে যদি কয়েকটি আকীদা–বিশ্বাস ও রীতিনীতির আকারে পেশ না করে বরং একটি পূর্ণাংগ জীবন–বিধান হিসাবে পেশ করা হত তাহলে আজ দুনিয়ার চিত্র ভিন্নরূপ হত।

কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে যেসব ব্যক্তি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে সক্রিয় হয়েছেন, অথবা যারা ইসলামের ওপর বই–পুস্তক রচনা করেছেন সম্ভবত ধর্মের খ্রীষ্টবাদী দর্শনই তাদের সামনে ছিল, যা কয়েকটি দাবীর সমষ্টি– জীবনের বাস্তব সমস্যার সাথে এর কোন ইতিবাচক সম্পর্ক নেই। ফল হচ্ছে এই যে, খ্রীষ্টবাদের অনর্থক বাচালতার প্রতি দুনিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক সম্প্রদায় যেভাবে কোন আকর্ষণ অনুভব করেনি, অনুরূপভাবে ইসলামের এই সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধানের দিকেও শিক্ষিত সমাজ কোন মনোযোগ দেয়নি। ফলে ইসলামের প্রচারকার্যের এই গোটা তৎপরতা অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্মের নগণ্য সংখ্যক অনুসারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায়। ফলে সময় এবং সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কোন বিশেষ ফল পাওয়া যায়নি।

তৃতীয় ত্রুটিঃ এ ব্যাপারে আরেকটি বুদ্ধিবৃত্তিক ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে, আমাদের এখানে আজ পর্যন্ত ইসলামের ওপর যেসব কিতাব পত্র লেখা হয়েছে তা হয় তাত্ত্বিক ধরণের অথবা বিতর্কমূলক অথবা নতিস্বীকার মূলক অথবা কালাম শাস্ত্রের ঢংএ পেশ করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলা যায়, দীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর কোনটিই উপকারে আসেনি। তাত্ত্বিক আলোচনা কেবল এমন লোকদের উপকারেই আসতে পারে যারা ইসলামের কোন বিশেষ দিকে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে চায়। কিন্তু দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্য নিয়ে তা লেখাও হয়না এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের যোগ্যতাও তাদের মধ্যে পাওয়া যায়না। বিতর্কমূলক আলোচনা প্রথমত বিশেষ ধরণের কয়েকটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। এর সাথে ইসলামের দৃষ্টিভংগীর কোন সম্পর্ক থাকেনা। দ্বিতীয়ত, যেসব জিনিস হৃদয়–মনকে ইসলামের নিকটবর্তী করার পরিবর্তে বরং আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় সেসব দোষ এর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায়

বর্তমান রয়েছে। নতিস্বীকার মূলক প্রকাশভংগীতে লেখা জিনিস বলতে আমরা পাশ্চাত্য প্রভাবিত লোকদের ধর্মীয় বিষয়ের ওপর রচিত বইপুস্তকের দিকে ইশারা করেছি, ইউরোপবাসীদের কাছে যা প্রশংসিত হয়েছে। তারা পাশ্চাত্য প্রভাবিত চিন্তা ধারাকে ইসলামের মধ্যেও প্রবেশ করানোর চেষ্টা করে। যদিও এর সাথে ইসলামের দূরতম সম্পর্কও নেই। অনুরূপভাবে ইসলামের যেসব জিনিস পাশ্চাত্তের কাছে নিন্দনীয় হয়েছে তাকে ইসলাম বহির্ভূত প্রমান করার দলীলও তারা একত্র করেছে–তা ইসলামের রুকন বা মূল নীতির অন্তর্ভূক্তই হোকনা কেন। এই ধরণের দুর্বলচেতা এবং পরাজিত মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা যা কিছু লিখেছে–তা না ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করছে, আর না তার মধ্যে এমন বলিষ্ঠ আস্থা রয়েছে যা মনকে ইসলামের দিকে টেনে আনতে পারে এবং বিবেকের কাছে বলিষ্ঠ আবেদন রাখতে পারে।

দার্শনিক দৃষ্টিকোন থেকে যা কিছু লেখা হয়েছে তা আরো অধিক হতাশাজনক। কালাম শাস্ত্রবিদদের যুক্তির পদ্ধতি বুদ্ধি বিবেক এবং স্বভাব প্রকৃতির পরিপন্থী। এর দ্বারা কোন সমস্যার গিঠ বৃদ্ধি করা যেতে পারে, কিন্তু কোন গিঠ খোলা সম্ভব নয়। যুক্তির এই ধরণ বক্র বিতর্কের জন্যই উপযুক্ত হতে পারে। এর মধ্যে না আছে কোন আকর্ষণ, না আছে সৌন্দর্য। সুস্থ বিবেক ও মানব প্রকৃতির সাথে এর কোন সামঞ্জস্য নেই। একে ইসলামকে উপস্থাপন করার মাধ্যম বানানোর অর্থ হচ্ছে লোকদেরকে ইসলাম থেকে পলায়নমুখী করা এবং তাদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে খারাপ ধারণার সৃষ্টি করা।

ইসলামকে দুনিয়ার সামনে পেশ করার একক পন্থা ছিল তাই–যা আল্লাহর কিতাব এবং আল্লাহর রসূল (সঃ) অবলম্বন করেছেন। কিন্তু আমাদের কালাম শাস্ত্রবিদগণ গ্রীক দর্শনের দ্বারা এতটা প্রভাবিত হয়ে পড়েন যে, তারা কুরআনের যুক্তি পদ্ধতিকে শুধু উপেক্ষাই করেনি, বরং আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে তার সমালোচনা করেছে এবং তাকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। আমাদের প্রাচীন পন্থী কালামশাস্ত্রবিদগণও এই ভুল করেছেন এবং আমাদের আধুনিক কালামশাস্ত্রবিদরাও তার শিকার হয়েছেন। এর ফল হয়েছে এই যে, অমুসলিমদের সামনে পূর্নাংগ ও যেসব শিক্ষিত মুসলমান নিজেদের মুসলমান হিসেবে টিকিয়ে রাখতে অথবা অন্ততপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে পরিগণিত হতে চেয়েছিল তারাও বলতে শুরু করল যে, ইসলাম অন্তরে মেনে নেয়ার জিনিস মাত্র। বুদ্ধি–বিবেক খাটিয়ে বুঝবার মত জিনিস তা নয়। যারা নির্ভিক এবং বগ্লাহীন–তারা প্রকাশ্যেই ইসলামের ঠাট্টাবিদ্রুপ শুরু করে দিল। এবং শুধু নাম ছাড়া আর সব ব্যাপারেই তারা ইসলামের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ আযাদ হয়ে গেল।

২

তাবলীগের প্রচলিত পন্থায় বাস্তব কর্মগত ক্রটি

তাবলীগের প্রচলিত পন্থায় কর্মগত দিক থেকেও ভ্রান্তি কম নয়। এর কতিপয় ভ্রান্তির দিকে আমরা ইংগিত করব।

প্রথম ক্রটিঃ প্রথম বাস্তব কর্মগত ভ্রান্তি হচ্ছে মুসলমানদের দ্বিমুখী নীতি। অর্থাৎ একদিকে তারা একটি মৌলিক জামাআত হওয়ার দাবী করছে-যা ইসলাম ও ঈমানের মূলনীতির ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। কিন্তু অপরদিকে তারা নিজেদের মধ্যে এমন সব বৈশিষ্ট জমা করেছে যেগুলো বংশ-গোত্র, আঞ্চলিকতা ও ভাষার ভিত্তিতে গড়ে উঠা কোন জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। একদিকে তারা বলছে, মুসলমান সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ, তাঁর রসূল, তাঁর কিতাব এবং আখেরাতের ওপর ঈমান এনেছে এবং যাবতীয় কাজকর্ম, সামাজিকতা ইত্যাদি সার্বিক ক্ষেত্রে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলদের বাতানো পন্থায় অনুসরণ করে। অপরদিকে তাদের মধ্যে এমন অসংখ্য লোক রয়েছে, যাদের শুধু মুসলমান নামটাই অবশিষ্ট আছে এবং তারা মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। এ ছাড়া কোন দিক থেকেই ইসলামের সাথে তাদের কোনসামঞ্জস্য নেই।

একদিকে তাদের দাবী হচ্ছে-জীবনের প্রতিটি দিকে ও বিভাগে তাদের পথপ্রদর্শক হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রসূলল্লাহ (সঃ)। অপর দিকে তারা নিজেদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বাগডোর এমন লোকদের হাতে তুলে দিয়েছে-যারা জ্ঞান ও কর্ম উভয় দিক থেকে আল্লাহর রসূলের হেদায়াত থেকে সম্পূর্ন মুক্ত। একদিকে তারা নৈতিকতা ও কর্মের একটি পূর্নাংগ বিধান পেশ করে এবং দাবী করে যে, এ থেকে বিচ্যুত হয়ে কেউ মুসলমান থাকতে পারেনা। অপর দিকে দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্মের যত রকম ও প্রকার অন্য জাতির মধ্যে পাওয়া যায়, তার সবগুলোর নমুনা তারা নিজেরাই পেশ করছে। এবং এতে তাদের মুসলমানিত্বের কোনরূপ ক্ষতি হয়না। এ দিকে তারা একটি সত্য দীনের সাথে নিজেদের যাবতীয় সম্পর্ক প্রমান করছে এবং দাবী করছে যে, এ থেকে মুখ ফিরিয়ে পলায়ন করা জায়েয নয়। কিন্তু অপর দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুস্তফা কালাম (তুরস্ক) পর্যন্ত গোটা

ইতিহাসকে ইসলামের ইতিহাস বলে চালিয়ে দিচ্ছে। অথচ এই ইতিহাসের একটা বিরাট অংশের সাথে ইসলামের সত্য জীবন বিধানে সামান্যতম সামঞ্জস্যও নেই।

একদিকে তারা দাবী করছে, ইসলাম একটি স্বয়ং সম্পূর্ন জীবন–বিধান এবং আজ যদি কোন বিধানে দুনিয়ার মুক্তি থেকে থাকে তাহলে তা এই বিধান গ্রহণ করার মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু অপর দিকে তারা ইউরোপ আমেরিকা সফর করে দেখতে চেষ্টা করছে যে, ইংরেজদের ব্যবস্থা অধিক ইসলামী না আমেরিকানদের ব্যবস্থা?

মুসলমানরা তাদের এই দ্বিমুখী নীতি উপলব্ধি করতে পারুক বা না পারুক, কিন্তু অন্য জাতির লোকদের তা অনুধাবণ করতে কষ্ট হওয়ার কোন কারণ নেই। তারা মুসলমানদের কথা ও কাজের মধ্যেকার বৈপরিত্য দেখে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। এরপর যদি তাদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তির ইসলামের প্রতি আকর্ষণ থেকেও থাকে তাহলে এই বৈপরিত্য দেখে থেমে যায় এবং সে মনে করে মুসলমানরাও তাদের মতই একটি জাতি। অতএব এ ধরণের এক জাতিকে পরিত্যাগ করে আরেক জাতির অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কি অর্থ থাকতে পারে?

আমাদের এই দ্বিমুখীপনা সত্বেও যদি কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেও থাকে তাহলে বিশ্বাস করা উচিৎ যে, সে আমাদের দাওয়াত পেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেনি। বরং আল্লাহ তায়ালা তার সামনে তার ধর্মের ভ্রান্তি তুলে ধরার সাথে সাথে মুসলমানদের ভ্রান্তিও তার সামনে পরিষ্কার করে তুলে ধরেছেন। সে ইসলামকে মুসলমানদের থেকে স্বতন্ত্র করে দেখে থাকে।

দ্বিতীয় ত্রুটিঃ দ্বিতীয় বাস্তব কর্মগত ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে, মুসলমানরাও খৃষ্টান মিশনারীদের দেখাদেখি তাবলীগের জন্য সব সময় সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকদের ওপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। অথচ এই পন্থা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দীনের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমত সেই শ্রেণীর লোকদের সম্বোধন করা উচিত যাদের চিন্তা ও দর্শনের নেতৃত্বে সমাজের ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। এই শ্রেণীর লোকেরাই মূলত কোন জাতিকে গড়ে তুলে বা তার পতন ঘটায়। যদি তাদেরকে সৎপথে নিয়ে আসা যায় তাহলে গোটা ব্যবস্থাপনা আপনা আপনি সৎপথে চলে আসবে। যদি তারা ভ্রান্ত পথে থেকে যায় তাহলে প্রথমত নিম্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে এমন কোন যোগ্যতা বর্তমান নেই যা তাদের সংশোধন করতে পারে। যদিওবা এ ধরনের যোগ্যতা তাদের মাঝে থেকে থাকে তাহলে সেটা একটা ব্যতিক্রম মাত্র। বরং তাদের পরাজিত মনোবৃত্তি খুব দ্রুত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর ভ্রান্তিকে গ্রহণ করে নেয়। এর দৃষ্টান্ত অনেকটা হৃদয় এবং অংগ–

প্রত্যংগের মত। যদি অন্তরের সংশোধন হয়ে যায় তাহলে গোটা দেহ আপনা-আপনি সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু যদি অন্তরে রোগ বর্তমান থাকে তাহলে অংগ-প্রত্যংগে তৈল মালিশ করে কোন ফায়দা নেই।

খৃষ্টান মিশনারীদের সামনে শুধু নিজেদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রশ্নই ছিল। অতএব তাদের জন্য এই পন্থা ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের জন্য শুধু সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে তাবলীগ করা জায়েয হতে পারেনা। তাদের কাজ হচ্ছে পথহারা লোকগুলোকে সঠিক পথে নিয়ে এসে আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক জুড়ে দেয়া, সঠিক দিক থেকে তাদের জীবনকে পুনর্গঠিত করা। গোটা সমাজকে পুনর্গঠিত করতে পারলেই ব্যক্তির পুনর্গঠন সম্ভব। সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকেরা যখন সংশোধন কার্যক্রমকে গ্রহণ করবে তখনই সমাজের পুনর্গঠন আশা করা যেতে পারে। যারা সমাজ ও সংগঠনের কমবেশী দৃষ্টি রাখে তারা এই সত্যকে অস্বীকার করতে পারেনা যে, গণবিপ্লব ও বৈপ্লবিক আন্দোলন নীচে থেকে শুরু হয়ে উর্ধতন ব্যবস্থাপনাকে বিশৃংখল করে দিতে পারে। কিন্তু সংশোধন মূলক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দাওয়াত কেবল তখনই শিকড় মজবুত করতে পারে যখন তা উপর থেকে নীচের স্তরের দিকে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

মুসলমানদের মধ্যে যারাই দাওয়াতের কাজ করেছে-তা মুসলমানদের মধ্যেই হোক অথবা তাদের বাইরে-তারা সাধারণভাবে যে ভুল করেছে তা হচ্ছে-তাদের দৃষ্টি সব সময় নিম্ন শ্রেণীর লোকদের ওপরই পতিত হয়েছে। তারা তাদেরকে শুধু কলেমা পড়িয়ে অথবা নামায শিখিয়ে মনে করে বসেছে যে, এখন তাদের সংশোধন হয়ে গেছে। নিসন্দেহে এভাবে কিছুটা আংশিক সংশোধন হতে পারে। কিন্তু সামগ্রিক জীবনে এ ভাবে কোন পরিবর্তন আসতে পারেনা। সামগ্রিক পরিবেশ যখন খারাপ থাকে তখন রোগের চিকিৎসার পরিবর্তে বরং রোগের কারণ সমূহের মূলোৎপাটন করার চেষ্টা করা উচিৎ। যেসব আবর্জনাপূর্ণ নালা জীবানু ছড়ায় এবং বাতাসকে দূষিত করে সেগুলো মাটি দিয়ে ভরে ফেলার চেষ্টা করা উচিৎ। এছাড়া যে সংশোধন প্রক্রিয়া চালানো হবে তা কোন ব্যক্তিকে মহামারী-পূর্ন এলাকায় আটকে রেখে টিকা-ইনজেকশন দেয়ার মতই হবে। এতে সাময়িক ভাবে মহামরীর আক্রমন প্রতিহত করা যেতে পারে হয়ত, কিন্তু স্থায়ী ফল লাভ করা সম্ভব নয়।

একারণেই নবী-রসূলগণ প্রথমে সাধারণ লোকদের সম্বোধন করার পরিবর্তে সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের মন-মানসিকতায় পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করেছেন এবংতাদেরসংশোধনকেজনসাধারণেরসংশোধনেরমাধ্যমবানিয়েছেন।

তৃতীয় ত্রুটিঃ বাস্তব কর্মগত তৃতীয় ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা কেবল মৌখিক উপদেশকেই তাবলীগের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। প্রকৃত ইসলামী জিন্দেগীর বাস্তব নমুনা পেশ করার চেষ্টা করেনি। অথচ একক ভাবে ইসলামের মূলনীতি সমূহের সৌন্দর্য অবলোকন করে খুব কম সংখ্যক বুদ্ধিমান এবং অসাধারণ নৈতিক যোগ্যতা সম্পন্ন লোকই ইসলাম গ্রহণ করতে পারে। দুনিয়ার বিরাট সংখ্যক লোক কেবল তখনই এসব মূলনীতির সত্যতা স্বীকার করবে যখন তারা বাস্তব জীবনে তার কার্যকরিতা এবং উত্তম ফল সৃষ্টি করতে দেখতে পাবে। কিন্তু আমাদের এখানে ইসলামের তাবলীগের নামে যে চেষ্টা সাধণা চালানো হচ্ছে তার রহস্য কেবল এতটুকু যে-বক্তাগণ সুললিত কন্ঠে, প্রচারকগণ আবেগ-উত্তেজনা সহকারে এবং লেখকগণ দুনিয়ার মানুষকে ইসলামী জীবন-পদ্ধতির কাল্পনিক বেহেশতে পরিভ্রমন করাচ্ছেন। আরো মজার কথা হচ্ছে এই যে, একদিকে তারা ইসলামের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কল্যাণের প্রশংসায় আসমান ও জমীনের মধ্যবর্তী স্থানকে মুখরিত করছে, অপর দিকে গোটা মুসলিম সমাজ নিজেদের মধ্যে জাহেলিয়াতের যাবতীয় নোংরামী পুঞ্জিভূত করে তাদের দাবীকে মিথ্যা প্রমান করছে। কর্মের নিরব ভাষা দাবীর সকল ভাষার তুলনায় অধিক প্রভাবশালী। এ কারণে এইসব ওয়াজ-নসীহত শূন্যে বিলীন হয়ে গেছে এবং দুনিয়ার বুকে এর কোন স্থায়ী প্রভাব অবশিষ্ট থাকেনি।

অতএব, শুধু মৌখিক বক্তব্যের পরিবর্তে যদি কিছু সংখ্যক আল্লাহর বান্দা যেসব মূলনীতির ওপর ঈমান এনেছে তার ভিত্তিতে একটি সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার চেষ্টা করত এবং এই প্রচেষ্টায় তারা যদি সফলকাম নাও হত-তবুও তারা অধিক কার্যকার খেদমত আঞ্জাম দিতে পারত-বক্তাগণ নিজেদের ওয়াজ-নসীহতে সফল হয়েও যে খেদমত আঞ্জাম দিতে ব্যর্থ হয়েছে। ইসলামকে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্য কল্যাণকর প্রমান করার জন্য শুধু অতীতের কিছু বিস্ময়কর ইতিহাস বর্ণনা করাই যথেষ্ট হতে পারেনা। ইসলাম বর্তমানেও মানব জাতির জন্য অতীতের সেই কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসতে পারে-একথার সমর্থনে শুধু প্রবন্ধ রচনা করা ও বক্তৃতা বিবৃতি দেয়ায়ও কোন ফায়দা নেই। এর একমাত্র পন্থা হচ্ছে এই যে, ইসলামের মৌলনীতির ওপর ঈমান আনয়নকারী জামায়াত একতাবদ্ধ হয়ে এসব মূলনীতির বাস্তব উদাহরণ পেশ করবে। দুঃখের বিষয়, সবকিছুই হয়েছে কিন্তু শুধু এটাইহয়নি।

চতুর্থ ত্রুটিঃ চতুর্থ ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে, মুসলমানরাও ইসলামের প্রচারের ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান মিশনারীদের মত কতিপয় খোলা পন্থা অবলম্বন করেছে। খ্রীষ্টানরা দুনিয়ার পতিত শ্রেণীকে যেসব লোভ-লালসা ও স্বার্থের টোপ দেখিয়ে খ্রীষ্টান বানিয়েছে,

মুসলমানরাও সে সব পন্থা অবলম্বন করতে চাচ্ছে। ব্রাহ্মণ সমাজ নিজেদের স্বার্থে যেসব টোপ ব্যবহার করছে, মুসলমানরাও তাই ব্যবহার করতে চাচ্ছে। বিতর্কের ক্ষেত্রে অন্যরা যে বাড়াবাড়ি, যে বক্র পন্থা এবং যে উদ্যত মুষ্টি ব্যবহার করছে, মুসলমানরাও তাতে মোটেই পিছিয়ে নেই। মুসলমানদের মধ্যে কোন ব্যক্তি লালসার শিকার হয়ে অথবা কোন ভ্রান্তির শিকার হয়ে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলে ব্রাহ্মন্যবাদীরা নিজেদের বিজয়ঢংকা বাজাতে থাকে। অনুরূপ ভাবে কোন হিন্দু ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে দিলেই মুসলমানরা তাকে আসমানে তোলার চেষ্টা করে।

নির্বোধ কিশোরদের ফুসলিয়ে বিপথগামী করা অন্যদের কাছে যেমন ধর্ম প্রচারের কর্মসূচীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল, অনুরূপ ভাবে মুসলমানদের মধ্যেও এরূপ পন্থাকে বৈধ মনে করা হল। মানসিক উত্তেজনায় বশতবর্তী হয়ে যদি কোন হিন্দু নারী কোন বল্গাহীন মুসলমানের হাত ধরে পলায়ন করে তাহলে এটাকে ইসলামের প্রচার কার্যের এক বিরাট বিজয় মনে করা হত। এ ধরনের নির্লজ্জতা ও লামপট্য ধর্মকে সহায়তা করার উপাদানে পরিণত হল। এর ফলে অসংখ্য ভ্রষ্টা নারী এবং লম্পট পুরুষ ধর্মান্তরকে একটা পেশায় পরিণত করে নিয়েছে। সকাল বেলা নিজেকে মুসলমান বলে জাহির করে মুসলমানদের কাঁধে সওয়ার হত এবং বিকেল বেলা নিজেকে হিন্দু অথবা খ্রীষ্টান বলে ঘোষনা করে তাদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা লাভ করত।

যে যুগে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় শুদ্ধি সংগঠনের খুব প্রভাব ছিল, এক মুসলমান বুযর্গ দিল্লীর মুসলমান পতীতাদের কাছে আবেদন করল—তারা যেন তাদের অমুসলিম খদ্দেরদের কাছে ইসলামের তাবলীগ করে। এর ফলে অমুসলিমদের দৃষ্টিতে ইসলাম একটি মূল্যহীন বস্তুতে পরিণত হল। তারা মনে করে বসল, ইসলাম হচ্ছে একটা ব্যবস্থা, যা নিজ জাতির সংখ্যা বৃদ্ধির একটি উপায় মাত্র। সাধারণ লোকদের ধোকা দেয়ার জন্য মুসলমানরা এটাকে আল্লাহর দীন বলে তাদের সামনে পেশ করে থাকে। এরূপ ধারণা করাটা তাদের জন্য সম্পূর্ণ সংগত ছিল। কেননা যে উদ্দেশ্যে এবং যে পন্থায় অমুসলিমরা নিজেদের ধর্মকে ব্যবহার করছিল, ঠিক সেই উদ্দেশ্যে এবং সেই একই পন্থায় যখন তারা মুসলমানদেরকেও তাদের ধর্মকে ব্যবহার করতে দেখল তখন তাদের অন্তরে ইসলামের শ্রেষ্টত্বের ছাপ কি করে পড়তে পারে?

পঞ্চম ত্রুটিঃ পঞ্চম বাস্তব কর্মগত ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা দুনিয়ার যে কোন কাজের জন্য কোন না কোন যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কিন্তু দুটি কাজের জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন আছে বলে তারা মনে করেনা। মসজিদের ইমামতী ও দীনের তাবলীগ। এমন এক যুগ ছিল যখন নামাযের ইমামতী করত

ইসলামী রাষ্ট্রের আমীর অথবা তার প্রতিনিধি। আর আজকের দিনে যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন কাজ আঞ্জাম দেয়ার যোগ্যতা রাখেনা মুসলমানরা নিজেদের মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করার জন্য তাকে খুজে বেড়ায়। এক কল্যাণময় যুগের মুসলমানরা মনে করত আল্লাহর রসূল যে দায়িত্বানুভূতি, কর্মতৎপরতা ও মনোনিবেশ সহকারে এই দীনকে মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন-ঠিক সেই দায়িত্বানুভূতি, কর্মতৎপরতা ও মনোনিবেশ সহকারে এই দীনকে মানুষের কাছে পৌছে দেয়ার জন্যই আল্লাহতায়ালা এই উম্মাতকে মনোনীত করেছেন। আর ইসলামী খিলাফত তার সার্বিক বিভাগ ও কর্মচারীদের নিয়ে রিসালাতের এই দায়িত্বই পালন করার একটি মাধ্যম ছিল। এদায়িত্ব আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে এই উম্মাতের ওপর অর্পিত হয়েছিল। আর আজকের অবস্থা হচ্ছে এই যে, গোটা মুসলিম সমাজ তার সমস্ত বুদ্ধিমান ও কর্মতৎপর সদস্যদের নিয়ে একটি জাহেলী ব্যবস্থার খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে।

প্রচলিত তাবলীগের পন্থার মধ্যে যেসব মোটা মোটা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং কর্মগত ভ্রান্তি রয়েছে আমরা সেদিকে ইংগিত করলাম। এগুলোর সার্বিক মূল্যায়ন করলে আরো অনেক ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হবে। কিন্তু আমরা আলোচনাকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাইনা। এই ভ্রান্তিগুলোর উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচেছ এই যে, নবী-রসূলগণ যে পন্থায় দীনের প্রচারকার্য চালিয়েছেন তার সাথে বর্তমানে প্রচলিত পন্থায় কোন দূরতম সম্পর্কও নেই। নবীদের সামনে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল, এদের সামনে সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অনুপস্থিত। তাঁদের যে কর্মপন্থা ছিল তার সাথে এদের কর্মপন্থার কোন যোগসূত্র নেই। এদের উদেশ্য-লক্ষ্য এবং কর্মপন্থায় অমুসলিম সংগঠন সমূহের অনুকরণ বিস্তার লাভ করেছে। এজন্য আমরা বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করতে চাই যে, নবী-রসূলগণ কি উদ্দেশ্যে তাবলীগ করেছেন এবং কিভাবে তাবলীগ করেছেন। এজন্য তাঁরা কি কি উপায় উপকরণ এবং কি পন্থা অবলম্বন করেছেন তাও আমরা উল্লেখ করব। প্রচারকার্যে তাঁদের কোন কোন স্তর অতিক্রম করতে হয়েছে। প্রতিটি স্তরের দাবী এবং যিম্মাদারী তাঁরা কিভাবে পূরণ করেছেন এবং তাঁদের এই সংগ্রামের ফলে দুনিয়া কি কি কল্যাণ লাভ করেছে-আমরা তাও আলোচনা করব।

৩

তাবলীগ কেন?

নবীরসুলের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ্ তায়ালা মানুষের প্রকৃতির মধ্যে ভাল এবং মন্দকে চেনার যোগ্যতা এবং ভালকে গ্রহন করার ও মন্দ থেকে বেচেঁ থাকার আকাংখা লুকিয়ে রেখেছেন। এদিক থেকে মানুষ এক উন্নত বৈশিষ্ট এবং স্বভাব নিয়ে দুনিয়ায় পদার্পন করেছে। সে নিজের অনুধাবন ক্ষমতার মাধ্যমে ভালকে গ্রহণ এবং মন্দকে পরিহার করে আল্লাহ তায়ালার কাছে পুরস্কার পাবার যোগ্য হতে পারে। অপর দিকে নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে কল্যাণের পরিবর্তে খারাপ পথ অবলম্বন করে স্রষ্টার পক্ষ থেকে শাস্তির যোগ্য হয়ে যেতে পারে। কিন্তু একদিকে যেমন তার স্বভাবে সৌন্দর্য ও পূর্ণতার দিক রয়েছে, অপর পক্ষে তার মধ্যে ত্রুটি ও অপূর্ণতাও রয়েছে। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতেও তার হেদায়াত ও গোমরাহীর ব্যাপারটি এককভাবে তার স্বভাব প্রকৃতির হাতে ছেড়ে দেননি এবং আখেরাতেও তাকে শাস্তি অথবা পুরস্কার দেয়ার ব্যাপারে কেবল স্বভাবগত পথনির্দেশকে যথেষ্ট মনে করেননি। বরং ফিতরাতের দাবী সমূহ এবং তার লুকায়িত যোগ্যতাকে উদ্ভাসিত করার জন্য এবং সৃষ্টির সামনে নিজের চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করার জন্য তিনি নবী রসূলদের পাঠিয়েছেন। যাতে লোকেরা কিয়ামতের দিন এই অভিযোগ উথাপন করতে না পারে যে, ভাল মন্দের রাস্তা তাদের জানা ছিলনা। এজন্যা তারা গোমরাহীর পংকে নিমজ্জিত হয়েছে। এই সত্যকে কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে।

رُسُلاً مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّيَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا (نساء- ١٦٥.) ـ

"আমরা রসূলদের পাঠিয়েছি সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসেবে। যেন রসূলদের আসার পর লোকদের জন্য আল্লাহর কাছে ওজর পেশ করার আর কোন সুযোগ না থাকে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সর্বজয়ী।"

–(সূরা নিসাঃ ১৬৫)

يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيْرٍوَّلَا نَذِيْرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (مائده ١٩) ـ

"হে কিতাবধারীগণ! আমাদের এই রসূল এমন এক সময় তোমাদের কাছে এসেছে ও দ্বীনের সুস্পষ্ট শিক্ষা তোমাদের সমনে পেশ করছে– যখন রসূল আগমনের ক্রমিক ধারা দীর্ঘ দিনের জন্য বন্ধ ছিল। যেন তোমরা বলতে না পার যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী আসেনি। অতএব, এই সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী এসেছে। আর আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের ওপরই শক্তিশালী।"–(সূরা মায়েদাঃ১৯)

নবীদের ব্যাপারে আল্লাহর বিধান

এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী–রসূল পাঠিয়েছেন যেন লোকদের সামনে সত্য পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং বক্রতা ও গোমরাহির পথে অবিচল থাকার মত কোন ওজর তাদের কাছে অবশিষ্ট না থাকে। নবীদের ব্যাপারে আল্লার বিধান এই ছিল যে, কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই তারা সবাই মানব–জাতির মধ্য থেকে এসেছেন, ফেরেশতা অথবা জিনদের মধ্য থেকে আসেননি। মানুষের কাছে যাতে মানব–স্বভাবের দাবীসমূহ মানুষের মাধ্যমেই পরিষ্কার করে তুলে ধরা যায়– সেজন্যই তাদের মধ্য থেকে নবী–রসূল পাঠানো হয়েছে। মানুষ যেন একথা বলার সুযোগ না পায় যে, মানুষের জন্য অ–মানবের (অন্য সৃষ্টিজীবের) জ্ঞান ও কর্ম কি করে আদর্শ হতে পারে? এজন্য আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জাতির কাছে তাদের মধ্য থেকে নবী–রসূল পাঠিয়েছেন, যাতে জাতিগত অপরিচিতি লোকদের জন্য সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াতে না পারে। আল্লাহর নবীগণ নিজ নিজ জাতির কাছে তাদের ভাষায়ই আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন, যাতে তাদের সামনে পরিষ্কার ভাবে সত্য উপস্থাপিত হতে পারে। তাঁদের ভাষাও ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, বোধগম্য এবং চিত্তাকর্ষক। তাছাড়া রসূলগণ কেবল একবার তাদেরকে সত্যের দিকে আহবান করে থেমে যাননি, বরং গোটা জীবনটাই এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছেন। তাঁরা যে কাজ করার জন্য লোকদের আহবান জানিয়েছেন, নিজেরাও তা করে দেখিয়েছেন এবং তাঁদের সাথীরাও নিজেদের কর্মময় জীবনে তার অনুশীলন করেছেন। এই ব্যবস্থা কেবল এজন্য করা হয়েছে যে, স্রষ্টার সন্তুষ্টি অর্জন এবং দুনিয়াতে জীবন যাপনের

জন্য সৃষ্টির যা কিছু জানা দরকার, তা বলে দেয়ার ক্ষেত্রে যেন কোনরূপ ত্রুটি ও অপূর্ণতা না থাকতে পারে এবং কিয়ামতের দিন লোকেরা নিজেদের দুষ্কর্মের অপবাদ আল্লাহর ওপর চাপাতে না পারে।

সর্বশেষ নবীর আগমন

দুনিয়া যতক্ষণ সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের এমন সব উপায় উপকরণ সৃষ্টি করতে পারেনি–যা গোটা দুনিয়াকে একজন মাত্র আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেয়ার জন্য একত্র করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জাতির কাছে স্বতন্ত্রভাবে নবী–রসূল পাঠানো অব্যাহত রেখেছেন। কিন্তু যখন নবীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতি সমূহের নৈতিক এবং সামাজিক চেতনা ও অনুভূতি এতটা সজাগ হয়ে গেল যে, তারা এখন একটি বিশ্বব্যাপক জীবন–ব্যবস্থার অধীনে জীবন যাপন করতে পারবে এবং সাথে সাথে সমাজ–সাংস্কৃতির বস্তুগত উপায়-উপকরণেরও এতটা উন্নতি হল যে, একজন মাত্র পথপ্রদর্শকের আহবান অতি সহজেই গোটা দুনিয়ায় পৌছে যেতে পারে–তখন আল্লাহ তায়ালা নিজ অনুগ্রহে সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়ায় পাঠালেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি দুনিয়ার মানুষকে একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান দান করলেন। এই জীবন বিধান গোত্র বর্ণ নির্বিশেষে গোটা মানব জাতির মেজাজ প্রকৃতি এবং তাদের অবস্থা, পরিবেশ ও প্রয়োজনের সাথে সমপূর্ণ সংগতিপূর্ণ। এটাই হল খোদায়ী জীবন–বিধান, যাকে আমরা "ইসলাম" নামে জানতে পেরেছি।

ইসলাম তার প্রাণসত্তার দিক থেকে সেই দ্বীন যা নিয়ে সমস্ত নবীদের আগমন ঘটেছে। শুধু কিছু কিছু ব্যাপারে সামান্য পার্থক্য ছিল। প্রথম দিককার নবীগণ নিজ নিজ জাতির ধারণ–ক্ষমতা অনুযায়ী আকীদা বিশ্বাসের তালীম দিয়েছেন। খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির অনুধাবন ক্ষতা–যা আল্লাহ তাদের দান করেছেন তদনুযায়ী তাদের আকীদা বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়েছেন। অপরাপর নবীগণ আইন কানুন শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে নিজ নিজ জাতির বিশেষ মেজাজ এবং বিশেষ বিশেষ রোগের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন। কিন্তু ইসলামের আইন বিধান কোন বিশেষ জাতিগত বা সামাজিক মেজাজ ও ঝোঁক প্রবণতাকে বিবেচানা করার পরিবর্তে শুধু মানব জাতির মেজাজকে বিবেচনা করা হয়েছে। অন্য নবীদের যে জীবন ব্যবস্থা আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছিল তা কেবল নিজ নিজ জাতির প্রয়োজন অনুপাতে ছিল। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষ যে জীবন ব্যবস্থা লাভ করেছে, তা কেবল কোন বিশেষ জাতির প্রয়োজনই পূরণ

করেনা, বরং গোটা মানব জাতির সমস্ত ব্যক্তিগত এবং সামগ্রিক প্রয়োজন সমূহও পূরণকরে।

রসূলুল্লাহর আগমনের দুটি দিক

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর গোটা বিশ্বের হেদায়াত ও পথ প্রদর্শন এবং গোটা সৃষ্টির সামনে চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাঁর পরে আর কোন নবী আসার প্রয়োজন নেই । এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দুটি নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। একটি বিশেষ ভাবে প্রেরণ, অপরটি সাধারণভাবে প্রেরণ। তাঁকে বিশেষভাবে আরববাসীদের মধ্যে পাঠানো হয়েছে। আরবদের সাথে এই বিশেষ সম্পর্কের কারণে তাঁকে উম্মী নবী অথবা রসূলে আরাবী বলা হয় এবং তাঁর ওপর যে অহী নাযিল হয় তার ভাষাও ছিল আরবী। এই দৃষ্টিকোন থেকে তাঁর যে দায়িত্ব (তাবলীগ ও হুজ্জাত পূর্ণ করণ) ছিল তা তিনি সরাসরি পালন করেছেন।

তাঁকে সাধারণভাবে গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই প্রেরণের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে একটি উম্মাত দান করেছেন এবং উম্মাতকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, রসূল তোমাদের কাছে যে দীনে হকের প্রচার করছেন—তোমরা সেই দীনের প্রচার অন্যদের কাছে করতে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا (بقره ١٤٣-) ـ

"আর এভাবেই আমরা তোমাদের একটি মধ্যপন্থী উম্মাত বানিয়েছি, যাতে তোমরা দুনিয়ার লোকদের জন্য সাক্ষী হতে পার, আর রসূল সাক্ষ্য হবে তোমাদেরওপর।"–(সূরাবাকারাঃ১৪৩)

وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ –

"আর এই কুরআন অহীর মাধ্যমে আমার কাছে পাঠানো হয়েছে; যেন আমি তোমাদেরকে এবং আর যাদের কাছে তা পৌছবে–তাদের সবাইকে সতর্ক করে দিতেপারি।"–(সূরাআনআমঃ১৯)

দীনের হেফাজতের জন্য দুটি বিশেষ ব্যবস্থা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধারণ প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ তায়ালা একটি পূর্ণাংগ উম্মাতের আবির্ভাব ঘটিয়েছেন। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, প্রতিটি দেশ, প্রতিটি জাতি এবং প্রতিটি ভিন্ন ভাষাভাষীর কাছে কিয়ামত পর্যন্ত দীনে হকের দাওয়াত পৌছে দেয়া এবং দুনিয়া যাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় নাযিল হওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে চিরকালের জন্য মুখাপেক্ষীহীন হয়ে যায়। যেহেতু তাঁর পরে আর কোন নবীর আগমন ঘটবেনা, তাই সৃষ্টি কুলের পথপ্রদর্শন এবং দীনে হকের প্রমান চূড়ান্ত করার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে এবং চিরকালের জন্য তাঁর উম্মাতের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। একজন্য আল্লাহ তায়ালা দীনের হেফাজতের জন্য দুটি বিশেষ ব্যবস্থাকরেছেন।

একঃ কুরআন মজীদকে তিনি যে কোন ধরণের পরিবর্তন পরিবর্ধন, তাহরীফ এবং সংশোধন ও সংকোচন থেকে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত রেখেছেন, যাতে আল্লাহর বিধান জানার জন্য দুনিয়ার মানুষ কোন নতুন নবীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করে।

দুইঃ তিনি এই উম্মাতের একটি দলকে সব সময়ের জন্য হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন। একথা সহীহ হাদীস থেকেও প্রমানিত। ফলে যেসব লোক সত্যের সন্ধানী হবে তাদের জন্য এদের জ্ঞান ও কর্ম আলোক-বর্তীকার কাজ দিতে থাকবে।

এ ধরণের একটি জামাআত (তাদের সংখ্যা যত নগন্যই হোক না কেন) এই উম্মাতের মধ্যে অবশিষ্ট থাকবে। যত বিপর্যয়ই আসুক না কেন, এই পূন্যবান জামাআত' রসূলুল্লাহ (স) এবং তাঁর সাহাবীদের জ্ঞান ও কর্মকে জীবন্ত রাখবে। গোমরাহীর প্রভাব যখন এই উম্মাতের শিরাউপশিরায় এমন ভাবে প্রবাহিত হবে যেভাবে পাগলা কুকুরের বিষ আহত ব্যক্তির দেহে ছড়িয়ে পড়ে সে সময়ও আল্লাহ তায়ালা এই উম্মাতের একটি অংশকে গোমরাহী থেকে নিরাপদ রাখবেন। যখন দুনিয়ার মানুষের স্বভাব এতটা বিকৃত হয়ে যাবে যে, ন্যায় নিষ্ঠা অন্যায় হিসেবে গণ্য হবে এবং অন্যায়-অশ্লীলতা ন্যায় নিষ্ঠা ও ভদ্রতা হিসাবে পরিগণিত হবে; বিদআত পন্থীদের শক্তি এতটা বৃদ্ধি পাবে যে, ন্যায়ের দিকে আহবানকারীগণের অবস্থা দুনিয়াতে অপরিচিতজনের মত হয়ে যাবে-সে সময়ও এই লোকেরা সৃষ্টিকুলকে সত্য দীনের দিকে আহবান জানাতে থাকবে এবং প্রতি পদে পদে বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও মানুষের সৃষ্ট বিকৃতির সংশোধন করার চেষ্টা করতে থাকবে।

প্রতিটি যুগে এ ধরণের একটি জামাআতকে সক্রিয় রাখার পেছনে আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তিনি অহীর জ্ঞানকে যেভাবে কুরআনের আকারে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য সুরক্ষিত করে দিয়েছেন, অনুরূপভাবে আল্লাহর রসূল এবং রসূলের সাহাবীদের জ্ঞান ও কর্ম এই জামাআতের মাধ্যমে যেন চিরকালের জন্য সংরক্ষিত থাকতে পারে এবং সৃষ্টির পথ প্রদর্শন ও রসূলের প্রমান (হুজ্জাত) চূড়ান্ত করার জন্য যে আলোর প্রয়োজন তা যেন কখনো নির্বাপিত হয়ে না যেতে পারে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ভাষায়–এই লোকেরা হবে পাহাড়ের প্রদীপ। এর সাহায্যে পথহারা ব্যক্তি পথ খুজে পাবে। এরা হবে জমীনের লবণ যার সাহায্যে কোন জিনিস লবণাক্তকরা যেতে পারে।

রিসালাতের দায়িত্ব হিসেবে তাবলীগ

ওপরের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার ভাবে জানা গেল যে, লোকদের ওপর সাক্ষী হওয়া বা দীনের প্রচারকার্য চালানো শুধু একটি নেকীর কাজই নয় বা কেবল মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধিই উদ্দেশ্য নয়; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাধারণ ভাবে পাঠানোর যে উদ্দেশ্য এই উম্মাতের হাতে পূর্ণ হবার রয়েছে–তাবলীগের দাবীই হচ্ছে তাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতের অন্তর্ভূক্ত প্রতিটি ব্যক্তির তাবলীগের এ দায়িত্ব পালান করা একান্ত আপরিহার্য কর্তব্য। দ্বীনের প্রচারকার্য রসূলের একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। তাঁর অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা এ দায়িত্ব তাঁর উম্মাতের ওপর অর্পণ করেছেন। মুসলমানরা যদি এ দায়িত্ব পালনে কোনরূপ ত্রুটি করে, তাহলে তারা প্রকারান্তরে রিসালাতের দায়িত্ব পালনেই ত্রুটি করল। এ দায়িত্ব আল্লাহ তায়ালাই তাদের ওপর অর্পন করেছিলেন। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে যে দায়িত্ব পালনের জন্য ''খাইরা উম্মাত'' বা সর্বশ্রেষ্ট জাতির মর্যাদায় আসীন করেছিলেন, সেই মর্যাদা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেবেন এবং দুনিয়াবাসীর পথ ভ্রষ্টতার সমস্ত দায়দায়িত্ব তাদের মাথায় চাপবে। কেননা তারাই এখন খোদার সৃষ্টির সামনে দীনকে চূড়ান্তভাবে পেশ করার মাধ্যম। যদি তারা এ দায়িত্ব পালান না করে তাহলে দুনিয়ার মানুষ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে এই ওজর পেশ করার সুযোগ পেয়ে যাবে যে, তুমি যাদেরকে 'শুহাদা আলান–নাস' বানিয়েছিলে এবং তাদের ওপর আমাদের পথ প্রদর্শণের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে তারা আমাদের কাছে তোমার দীনের দাওয়াত পেশ করেনি। অন্যথায় আমরা এই গোমরাহীর শিকার হতামনা। মুসলমানরা তখন এই অভিযোগের কোন জবাব দিতে পারবেনা।

তাবলীগের শর্তাবলী

লোকদের ওপর সাক্ষী হওয়া বা সাধারণভাবে তাবলীগ ও প্রচার কার্যের এই দায়িত্ব দুনিয়াতে কেবল মুসলমান নামে একটি জাতির অস্তিত্ব বর্তমান থাকলেই আদায় হতে পারেনা—চাই তারা মানুষের ওপর সাক্ষী হওয়ার দায়িত্ব পালন করুক বা না করুক। এটা রিসালতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ কারণে আল্লাহ তায়ালা তাবলীগের জন্য যেসব শর্ত আরোপ করেছেন এবং নবী–রসূলগণ যেসব শর্তের প্রতি খেয়াল রেখে তাবলীগের কাজ করেছেন–সেসব শর্ত পূরা করেই আল্লাহর দীনের প্রচারকার্য আঞ্জাম দিতে হবে। এখানে আমরা এ ধরনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শর্তের উল্লেখ করব যেগুলোকে এই দায়িত্ব পালান করার ক্ষেত্রে বিবেচনা করতেহবে।

প্রথম শর্তঃ প্রচার কার্যের প্রথম শর্ত হচ্ছে এই যে, আমরা যে দীনে হকের সাক্ষী, প্রথম আমাদেরকেই সেই দীনের ওপর বিশ্বস্তমন নিয়ে ঈমান আনতে হবে। নবী–রসূলগণ যে দীনের দাওয়াত দিতেন প্রথমে তাঁরা নিজেরা সেই দীনের ওপর ঈমান আনতেন। তাঁরা নিজেদেরকে এই দীনে হকের উর্ধে মনে করতেননা। "আমানার রসূলু বিমা উনযিলা ইলাইহি ওয়াল মুমিনূন"–(রসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে–তিনি নিজে এবং মুমিনগণ তার ওপর ঈমান এনেছে)।

এই সত্য দীনের ওপর ঈমান আনার পর যেসব জিনিস তার পরিপন্থী মনে হল তা পরিহার করার জন্য তাঁরাই সর্বপ্রথম এগিয়ে আসলেন। চাই তা বাপ–দাদার ধর্মই হোক, অথবা গোত্র ও সাম্প্রদায়িক বন্ধনই হোক,অথবা নিজের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত স্বার্থই হোক। এটা করতে গিয়ে তাদের সামনে যে বিপদই এসেছে, তাঁরা বলেছেন, "আমিই প্রথম মুমিন,আমিই প্রথম মুসলমান।"এমনটি কখনো হয়নি যে,তাঁরা নিজেদেরকে বিপদ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে অন্যদেরকে উত্তেজিত করেছেন–যদি তোমরা নাজাত পেতে চাও তাহলে এই বিপদের মধ্যে লাফিয়ে পড়।

দ্বিতীয় শর্তঃ দীনে হকের প্রচার কাজের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, মানুষ যে সত্যের ওপর ঈমান এনেছে তারা মৌখিকভাবে তার সাক্ষ্য দেবে। যে ব্যক্তি কোন সত্যের ওপর ঈমান আনার পর তা প্রকাশ করার ক্ষমতা রাখা সত্যেও যদি তা প্রকাশ না করে তাহলে সে একটি বোবা শয়তান। কিয়ামতের দিন সে সত্য গোপন করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে– যেভাবে ইহুদীরা এই অপরাধে অপরাধী সাব্যস্তহয়েছে। কুরআনের বাণীঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهٗ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهٗ - (اٰل عمران ١٨٧)

"আল্লাহ তায়ালা যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে ওয়াদা গ্রহণ করেছিলেনঃ তোমরা এই কিতাবের শিক্ষা লোকদের মধ্যে প্রচার করতে থাকবে এবং তা গোপন করে রাখতে পারবেনা। কিন্তু তারা এই কিতাবকে পেছনের দিকে নিক্ষেপ করেছে এবং সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে তা বিক্রি করেছে।"

–(সূরা আলে ইমরানঃ১৮৭)

এ ব্যাপারে যে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিৎ তা মূলত দীনে হকের স্বার্থেই করা উচিৎ। আর তা হচ্ছে এই দীনকে সঠিক পন্থায় সঠিক স্থানে এবং উপযুক্ত ব্যক্তির সামনে প্রচার করতে হবে। এতে সত্য দীনের দাওয়াত ব্যক্তির অন্তরে স্থান করে নিতে পারবে। যদি কোন ব্যক্তি সত্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কেবল নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে দীনে হকের প্রচার থেকে বিরত থাকে অথবা এ ব্যাপারে অনীহা প্রদর্শন করে তাহলে সে হয় মোনাফিক, অথবা ব্যক্তিত্বহীন এক কাপুরুষ। কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতে সত্যকে প্রকাশ করা থেকে সাময়িকভাবে বিরত থাকার অনুমতি আছে। যেমন, তা করতে গেলে বাস্তবিক জীবন নাশের আশংকা রয়েছে এবং প্রচারকও মনে করে যে, এসময় দীনে হকের খেদমতের দৃষ্টিকোন থেকে নিজের জীবন রক্ষা করাটাই অধিক শ্রেয়।

তৃতীয় শর্তঃ তৃতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, এই সাক্ষ্য কেবল মৌখিক ভাবে দিলেই চলবেনা, বরং বাস্তব কর্মের মাধ্যমেই এই সাক্ষ্য দিতে হবে। যে সাক্ষ্যের পেছনে বাস্তব কর্মের উপস্থিতি নেই–ইসলামে এ ধরনের সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হয়না। কোন কোন ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসত এবং তাঁর সামনে শপথ করে বলত, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের এ সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি। তিনি বলেছেন, এরা মোনাফিক এবং মিথ্যাবাদী। এর সমর্থনে তিনি তাদের সামনে তাদের কার্যকলাপ ও বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন। এর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে তাদের বিরূপধারণা ও হকের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুতা প্রকাশ পেয়েছে।

যে ব্যক্তি একটি সত্যকে মেনে নিয়েছে এবং লোকদেরও সেদিকে আহবান জানাচ্ছে, তার অপরিহার্য কর্তব্য হচ্ছে তার কাজকর্মও এই সত্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অন্যথায় সে সেই ইহুদী আলেমদেরই পদাংক অনুসারী

বিবেচিত হবে–কুরআন মজীদ যাদের কঠোর সমালোচনা করেছে। তারা অন্যদেরকে আল্লাহর বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য আহবান করত, কিন্তু নিজেদের প্রসংগটি ভুলে যেত। যে ব্যক্তি বা দলের কার্যকলাপ তাদের দাওয়াতের পরিপন্থি, তারা মূলত নিজেদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার প্রমাণ নিজেরাই পেশ করছে। বাস্তব কর্মের মাধ্যমে যে প্রমাণ পেশ করা হয় তা মৌখিক প্রমাণের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। তাদের নিজেদের কার্যকলাপ তাদের দাবীর বিরুদ্ধে এতটা শক্তিশালী প্রমাণ বহন করে যে, এরপর তাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার জন্য অন্য কোন প্রমানের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকেনা।

মুসলমানরা যদি আল্লাহর দীনের সাক্ষী হয়ে থাকে, তাহলে তার অত্যাবশ্যকীয় দাবী হচ্ছে এই যে, তারা এই দীনের ওপর ঈমান আনবে অন্যদের কাছে এর দাওয়াত পৌছাবে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে এই দীন অনুযায়ী আমল করবে। এছাড়া এই সাক্ষ্যের হক আদায় হতে পারেনা, যেজন্য আল্লাহ তায়ালা তাদের মনোনি ঃ করেছেন। জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে এই দীনের সাথে সম্পর্ক না থাকা এবং মৌখিক ভাবে এটা সত্য দীন হওয়ার সাক্ষ্য দেয়া –সৃষ্টির সামনে হুজ্জাত (প্রমাণ) পূর্ণ করার দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণতই একটি হাস্যস্পদ ব্যাপার। এ ধরণের কর্মবিমুখ বক্তাদের ওয়াজের ভিত্তিতে আল্লাহ তায়ালা যদি তাঁর সৃষ্টিকে অপরাধী সাব্যস্থ করেন তাহলে এটা তাঁর ইনসাফের পরিপন্থী হবে। এর অত্যাশ্যকীয় পরিণতি হবে এই যে, মুসলমানদের ওপর এই দীনের হুজ্জাত চূড়ান্তভাবে পূর্ণ হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন তারা নিজেদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই গ্রেপ্তার হবে।

বাস্তব কর্মক্ষেত্রে দীন থেকে পদাস্খলনে যেসব দিক ক্ষমার গোগ্য তা কুরআন মজীদ নিজেই বর্ণনা করেছে এবং সাথে সাথে এর চিকিৎসার পদ্ধতিও বলে দিয়েছে। ক্ষমার যোগ্য পদাস্খলনের একটি দিক হচ্ছে এই যে, আবেগ–উত্তেজনা অথবা প্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যদি হকের পরিপন্থী কোন কাজ করে বসে। এর চিকিৎসা হচ্ছে সাথে সাথে তওবা করা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমার প্রার্থনা করা। অপর একটি দিক হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তিকে হকের পরিপন্থী কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এর চিকিৎসা হচ্ছে এই যে, মানুষ এই অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে। তওবা ও সংশোধনের চেষ্টা করার পরিবর্তে মানুষ যদি নিজের ভ্রান্তিকে চাদর এবং বিছানা বানিয়ে নেয় এবং যে সংকটাপন্ন অবস্থার মধ্যে সে পতিত হয়েছে তাকে যদি নিজের ধর্মে পরিনত করে নেয়, তাহলে এই অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নয়। তাকে

জনগণের ওপর সাক্ষী হওয়ার যে পদমর্যাদায় আসীন করা হয়েছিল, বাতিলের ওপর সন্তুষ্ট থাকার কারণে তাকে সেই মর্যাদাপূর্ণ পদ থেকে হটিয়ে দেয়া হবে।

চতুর্থ শর্তঃ তাবলীগের চতুর্থ শর্ত হচ্ছে এই যে, সাক্ষ্যকে যে কোন প্রাকারের জাতিগত ও গোত্রগত গোড়ামী থেকে মুক্ত রাখতে হবে। যে দীনে হকের দাওয়াত আমরা পেশ করছি তার পথ থেকে কোন জাতির শত্রুতা অথবা মিত্রতা আমাদেরকে যেন বিচ্যুত করতে না পারে। আমাদের বিরোধীদের মোকাবিলায় আমাদেরকে যেভাবে নিরপেক্ষ থাকতে হবে, তার শিক্ষা কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত বাক্যে দিয়েছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ـ (مَائده – ٨)

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর জন্য সত্যনীতির ওপর স্থায়ীভাবে দন্ডায়মান থাক এবং ইনসাফের সাক্ষ্যদাতা হও। কোন বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এতটা উত্তেজিত করে না দেয় যে, তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায় বিচার কর। এটা তাকওয়ার সাথে গভীর সামঞ্জস্যপূর্ণ।" (সূরা মায়েদাঃ ৮)

নিজেদের বন্ধু ও আপনজনদের বেলায় যেভাবে নিরপেক্ষ থাকতে হবে তার শিক্ষাও কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত আয়াতে তুলে ধরেছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ـ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইনসাফের ধারক হও এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষী হও। তোমাদের এই সুবিচার ও সাক্ষ্যের আঘাত তোমাদের নিজেদের ওপর অথবা তোমাদের পিতামাতা ও আত্নীয়-স্বজনদের ওপরই পড়ুক না কেন, আর পক্ষদ্বয় গরীব অথবা ধনীই হোকনা কেন –তাদের সকলের অপেক্ষা আল্লাহর

এই অধিকার অনেক বেশী যে, তোমরা তাঁর দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে। অতএব নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে সুবিচার থেকে বিরত থেকনা"
–(সূরা নিসাঃ১৩৫)

পঞ্চমশর্তঃ দীন প্রচারের পঞ্চম শর্ত হচ্ছে এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পূর্ণাংগ ও পরিপূর্ণ দীন আমাদের কাছে এসেছে সেই গোটা দীনের সার্বিক সাক্ষ্য দান করতে হবে। কোনরূপ তিরস্কার অথবা বিরোধিতার ভয়ে এর মধ্য থেকে কোন কিছু বাদ দেয়া যাবেনা। যেসব বিষয়ের সাক্ষ্য ব্যক্তিগত জীবনের কর্তব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত জীবনে সেগুলো সাক্ষ্য বহন করতে থাকবে। প্রতিটি ব্যক্তিকে নামায পড়তে হবে, রোযা রাখতে হবে, প্রতিটি ধনবান ব্যক্তিকে যাকাত দিতে হবে এবং প্রতিটি সামর্থবান ব্যক্তিকে হজ্জ করতে হবে। সৎকাজ, বিশ্বস্ততা, পবিত্র জীবন প্রত্যেক মুসলমানই অবলম্বন করবে।

কিন্তু যেসব জিনিসের সাক্ষ্য দেয়ার জন্য সমষ্টিগত জীবন শর্ত, সেখানে ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে, সমষ্টিগত জীবন গঠন করার জন আপ্রাণ চেষ্টা করা। যখন তা অস্তিত্বে এসে যাবে, তখন ঐসব বিষয়ের সাক্ষ্য দেবে। যেমন, সামাজিক ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং দেশের রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তোলা একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এগুলোকে ইসলামী ছাঁচে ঢেলে সাজানোর জন্য একটি সাংগঠনিক শক্তির প্রয়োজন। এজন্য সর্বাগ্রে একটি সালেহ জামাআত গঠণ করা একান্ত প্রয়োজন। এই সংগঠন কায়েম করার পর সমষ্টিগত জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে দীনে হকের সাক্ষ্য দেয়া অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়বে। নিম্নে আমরা কয়েকটি আয়াত উধৃত করছি। তা থেকে জানা যাবে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনরূপ হ্রাস–বৃদ্ধি ছাড়াই গোটা দীনের সাক্ষ্য বহন করার জন্য কতটা তাকিদ করা হয়েছে।

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ(٦٧–مائده) ـ

"হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে, তা লোকদের কাছে পৌঁছে দাও। তুমি যদি তা না কর, তাহলে তুমি তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব পালন করলেনা। লোকদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন।" –(সূরা মায়েদাঃ ৬৭)

اَلَّذِيْنَ يُبَلِّغُوْنَ رِسٰلٰتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ

"যারা আল্লাহর পয়গাম সমূহ পৌঁছায়, তাঁকেই ভয় করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করেনা।" (সূরা আহযাবঃ৩৯)

وَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

"কাফের এবং মোনাফিকদের কথায় মোটেই কর্ণপাত করোনা। তাদের নিপীড়নকে মোটেই পরোয়া করোনা। আল্লাহর ওপর ভরসা করো"
-(সূরা আহযাবঃ ৮৮)

فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ وَقُلْ اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ (الشورى- ١٥)

"অতএব তুমি সেই দীনের দিকে দাওয়াত দাও এবং তোমাকে যেমন হুকুম করা হয়েছে-সেই দীনের ওপর অবিচল থাক। কিন্তু এই লোকদের কামনা বাসনার অনুসরণ করোনা। তুমি বল, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তার ওপর ঈমান এনেছি।" (সূরা শূরাঃ ১৫)

ষষ্ঠ শর্তঃ দীন প্রচারের ষষ্ঠ শর্ত হচ্ছে এই যে, আল্লাহর দীনের দিকে আহবানকারীগণ প্রয়োজনবোধে জীবন দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবে, জীবন দিয়ে দেবে। এটা সাক্ষ্যদানের সর্বোচ্চ স্তর। এ কারণেই যেসব লোক আল্লাহর দীনের জন্য জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং যে সত্যের ওপর তারা ঈমান এনেছেন, তা সত্য হওয়ার সাক্ষ্য তরবারীর ছায়াতলেও দিয়েছেন, তখন তাদেরকে শহীদ করা হয়েছে। এ ধরণের প্রাণ উৎসর্গকারী ব্যক্তিদের ছাড়া আর কে শহীদের এই মহান খেতাব লাভ করতে পারে। আর কার জন্য তা উপযুক্ত হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা এই উম্মাতের ওপর লোকদের জন্য সাক্ষী হওয়ার যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা পূর্ণ করার জন্য হাজারো লাখো মানুষ দাঁড়িয়ে যেতে পারে এবং তাদের প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে নিজ নিজ শ্রমের প্রতিদান লাভ করবে। কিন্তু যারা এ পথে নিজেদের গোটা জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছে এবং নিজেদের জীবনের বিনিময়ে সত্যের সাক্ষ্য দিয়ে গেছে- মূলত সেই ব্যক্তিই 'শহীদ' উপাধি লাভ করার যোগ্য। কেননা কোন একটি জিনিসের সত্য হওয়ার পক্ষে এর চেয়ে আর বড় সাক্ষ্য কি হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি সত্য

দীনের সাহায্যের জন্য নিজের অমূল্য জীবনকেও বিলিয়ে দিল। যে ব্যক্তি নিজের জীবনকে বাজি রেখে সত্যের সাক্ষ্য দান করল, যার পরে সত্যের সাক্ষ্যের আর কোন পর্যায় অবশিষ্ট থাকেনা সেই হল প্রকৃত শহীদ।

মুসলমানদের দায়িত্ব

রিসালাতের এই দায়িত্বের কারণেই মুসলিম উম্মাতকে "সর্বোত্তম জাতি " বলা হয়েছে। মুসলমানরা যদি এই দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে যায় তাহলে তারা দুনিয়ার অন্যান্য জাতির মত একটি জাতি মাত্র। তাদের মধ্যে না আছে কোন বিশেষ সৌন্দর্য, আর না আছে বিশেষ মর্যাদা লাভের কোন কারণ। আল্লাহ তায়ালারও দেখার প্রয়োজন নেই যে, তারা দুনিয়াতে সুসম্মানে বসবাস করছে,না অপমানিত অবস্থায় জীবন যাপান করছে। বরং এই দায়িত্ব ভুলে যাবার পর তারাও আল্লাহর অভিশাপে পতিত জাতিতে পরিনত হবে। যেমন, তাদের পূর্বে অন্য জাতিকে এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অর্পিত দায়িত্ব পালন না করার পরিনতিতে তারা অভিশপ্ত হয়েছে। অতএব যে আয়াতে মুসলমানদের সর্বোত্তম জাতি বলে ঘোষণা করা হয়েছে তাতে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যও পরিষ্কার ভাবে বলে দেয়া হযেছে।

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ (ال عمران-١١٠) ـ

"তোমরা সর্বোত্তম জাতি, যাদেরকে মানুষের হেদায়াতের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও, অন্যায় কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আন।"

–(সূরা আলে ইমরানঃ১১০)

এই সমষ্টিগত দায়িত্ব পালন করার পন্থাও আল্লাহ তায়ালা নিজেই বলে দিয়েছেনঃ

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (آل عمران- ١٠٤) ـ

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে, যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, ন্যায়ানুগ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সফলকাম হবে।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১০৪)

এই নির্দেশ পালন করার ক্ষেত্রে মুসলমানরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর সর্ব প্রথম যে কাজ করেছে, তা হচ্ছে এই যে, তারা অবিকল নবুওয়াতের পন্থায় খেলাফতের ভিত্তি স্থাপন করে। এই সংস্থা কল্যাণকর কাজের দাওয়াত, ন্যায় কাজের নির্দেশ এবং অন্যায় কাজ থেকে প্রতিরোধ করার জন্য একটি সাংগঠনিক সংস্থা হিসাবে কাজ করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর মুসলমানদের ওপর দীনে হক্কের যে সামষ্টিক দায়িত্ব অর্পিত হয়, তা আঞ্জাম দেয়ার জন্যই তারা এই সংস্থা কায়েম করে। এই সংস্থা মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসাবে তাদেরকে সত্যের ওপর কায়েম রাখার এবং দুনিয়ার মানুষকে হকের দিকে আহ্বান করার দায়িত্ব পালন করে। খেলাফত নামক এই সংস্থা যতদিন সঠিক ভাবে কায়েম ছিল, মুসলমান–অমুসলমান সবাই নিজের দায়িত্ব পালনে সক্রিয় ছিল। এসময় পর্যন্ত তাবলীগের দায়িত্ব পালন ফরজে কিফায়ার পর্যায়ভুক্ত ছিল। খেলাফত ব্যবস্থা তা আঞ্জাম দিয়ে জামাআতের প্রতিটি সদস্যকে আল্লাহর কাছে এই ফরজের যিম্মাদারী থেকে মুক্ত করতে থাকে। কিন্তু এই ব্যাবস্থা যখন এলোমেলো হয়ে গেল, তখন সত্যের সাক্ষ্যের এই দায়িত্ব পুনরায় সমাজের প্রতিটি সদস্যের উপর এসে পড়েছে। যেমন কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ভেংগে পড়ার পর তার বাসিন্দাদের জানমালের হেফাজতের দায়িত্ব রাষ্ট্রের পরিবর্তে তাদের নিজেদের ওপর এসে পড়ে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পুনরায় নিজেদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারে, ততক্ষন এ দায়িত্ব তাদের ওপরই ন্যস্ত থাকে। অনুরূপ ভাবে খেলাফত ব্যবস্থা ভেংগে পড়ার পর লোকদের ওপর সাক্ষ্য হওয়ার দায়িত্ব উম্মাতের প্রতিটি সদস্যের ওপর এসে পড়েছে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য তারা যতক্ষণ ইসলামের সঠিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলতে না পারবে, ততক্ষণ এ দায়িত্ব পালন না হওয়ার গুনাহ প্রতিটি মুসলমানের ওপর বর্তাবে। কিয়ামতের দিন প্রতিটি ব্যক্তিকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

সারসংক্ষেপঃ

এই গোটা আলোচনার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে এই যে,

(ক) কিয়ামত পর্যন্ত গোটা বিশ্বে আল্লাহর দীন প্রচারের যে দায়িত্ব রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অর্পন করা হয়েছিল, তা পূর্ণতায় পৌঁছানোর জন্য তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মাতের ওপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করে গেছেন। এখন এই উম্মাত কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিটি দেশ, জাতি এবং ভাষাভাষীর কাছে আল্লাহর দীনের প্রচারকার্য চালাতে থাকবে।

(খ) প্রচার কার্যের জন্য আল্লাহ তায়ালা এই শর্ত নির্ধারণ করেছেন যে, তা মৌখিক ভাবে, আন্তরিকভাবে এবং বাস্তব কর্মের মাধ্যমে করতে হবে। কোনরূপ পার্থক্য ও শ্রেণী বিভাগ না করে গোটা দীনের তাবলীগ করতে হবে। নিন্দুকের নিন্দাকে উপেক্ষা করে পক্ষপাতহীন ভাবে তা করতে হবে। প্রয়োজন বোধে প্রচারক তার জীবনকে কোরবানী করে এ দায়িত্ব পালন করবে।

(গ) এই সামগ্রিক দায়িত্ব পালন করার জন্য যথারীতি খেলাফত নামক সংস্থা বর্তমান ছিল। এই সংস্থা যতদিন কায়েম ছিল, প্রতিটি মুসলামান এই দায়িত্ব থেকে মুক্ত ছিল।

(ঘ) এই সংস্থা অবলুপ্ত হয়ে যাওয়ার পর ইসলামের প্রচার কার্যের দায়িত্ব উম্মাতের প্রতিটি সদস্যের ওপর এসে পড়েছে। যোগ্যতা ও মর্যাদার তারতম্য অনুযায়ী এ দায়িত্ব তাদের মধ্যে বন্টিত হবে।

(ঙ) এখন এই ফরজের জবাবদিহি এবং দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দুটি পথ মুসলমানদের জন্য খোলা আছে। তারা হয় খোলাফত নামক এই সংস্থা পুনরায় কায়েম করবে অথবা অন্তত পক্ষে তা কায়েম করার জন্য জীবনকে বাজি রাখবে।

(চ) মুসলমানরা যদি এর কোনটিই না করে, তাহলে তাদের ওপর আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালাতের যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল–তা পালন না করার অপরাধে তারা অপরাধী সাব্যস্ত হবে। তাদেরকে কেবল নিজেদের অপরাধের বোঝাই বহন করতে হবেনা; বরং গোটা সৃষ্টির পথভ্রষ্টতার শাস্তিও তাদের ভোগ করতে হবে।

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের ওপর দীন প্রচারের যে মহান দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে–তা আঞ্জাম দেয়ার মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে তাদের চেতনা ও অনুভূতি। কল্যাণের দিকে আহবানের এই খেলাফত ব্যবস্থা যাতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সে দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হবে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদের সহজেই আল্লাহর দীনের দিকে পথ দেখানো যেতে পারে এবং দুনিয়ার সামনে চূড়ান্ত প্রমান পেশ করা যেতে পারে। দুনিয়াতে এই ব্যবস্থা যতদিন কায়েম না হবে, ততদিন প্রতিটি মুসলমানের সবচেয়ে অগ্রগণ্য, সবচেয়ে বড় এবং সর্বশ্রেষ্ট উদ্দেশ্য হবে এই ব্যবস্থা পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য কিছু না কিছু করা। শয়নে–জাগরনে প্রতিটি মুসলমানের এটাই হবে একমাত্র চিন্তা। এজন্যই তাদের পানাহার, এজন্যই তাদের জীবন–মরণ। এছাড়া মুসলমানদের জীবন যদি হয় আল্লাহর ইচ্ছার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, আল্লাহর কাছে তারা নিজেদের এই ত্রুটির কোন

গ্রহনযোগ্য ওজর পেশ করতে সক্ষম হবেনা। আল্লাহর জমীনে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠাই তাদের জীবনের উদ্দেশ্য। যদি তারা এ উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে যায়, তাহলে তারা পৃথিবীর বুকে কীট–পতঙ্গ ও খড়কুটার চেয়ে অধিক গুরুত্ব পাবার দাবী করতে পারেনা। এবং তারা কখনো মধ্যপন্থী উম্মাত অথবা সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মাত হওয়ার মর্যাদাও পেতে পারেনা বা আল্লাহর তরফ থেকে কোনরূপ সাহায্য সহযোগিতা লাভের আশাও করতে পারে না।

৪

নবী–রাসূলগণ প্রথমে কাদের সম্বোধন করতেন

আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম নিজেদের উদ্দেশ্যের প্রচারের জন্য সর্বপ্রথম কোন্ লোকদের সম্বোধন করতেন এবং কিভাবে সম্বোধন করতেন?

প্রশ্নের প্রথম অংশের অর্থ হচ্ছে এই যে, এমনি তো নবীদেরকে গোটা জাতির কাছে পাঠানো হয়, কিন্তু তাঁরা কি কাজের সূচনাতেই জাতির সব লোকদের আহবান জানাতেন অথবা প্রাথমিক পর্যায়ে জাতির বিশেষ স্তরের লোকদের সম্বোধন করতেন? যদি বিশেষ পর্যায়ের লোকদের আগে সম্বোধন করে থাকেন তাহলে তারা কোন্ পর্যায়ের লোক? সাধারণ পর্যায়ের লোকদের না যারা সর্ব সাধারণের নেতৃত্ব দান করত তাদের সর্বপ্রথম দাওয়াত দিতেন?

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, এটা একটা বাস্তব ব্যাপার যে, প্রত্যেক নবীর উম্মতের কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর দাওয়াত অপরিচিত বলে মনে হত, বরং তারা এর চরম বিরোধিতা করত। অতপর নবীগণ কি তাদের সবাইকে কাফের অথবা প্রত্যাখ্যানকারী মনে করে নিয়ে নিজেদের দাওয়াতের সূচনা এভাবে করতেন যে, হে কাফেরগণ! ঈমান আন, হে মুশরিকগণ! আল্লাহকে এক বলে মেনে নাও, অথবা তাদের সম্বোনের ধরন ভিন্নরূপ ছিল?

এ দুটি প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তা সঠিক ভাবে উপলব্ধি করতে না পারার করণে লোকেরা দাওয়াতের সূচনাবিন্দু নির্ধারণ করতে গিয়েও ভুল করে বসেছে। উপরন্তু তারা নিজেদের এবং নিজেদের সম্বোধিত ব্যক্তিদের সঠিক পজিশন অনুধাবন করতে গিয়েও বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। এর ফলে হয় গোটা দাওয়াত একটি ভ্রান্ত বিন্দু থেকে শুরু হওয়ার কারণে প্রভাবশূণ্য হয়ে থেকে গেছে,অথবা আহবানকারী এবং আহবানকৃত ব্যক্তির সঠিক অবস্থান নির্ধারিত না হওয়ার কারণে তা এটি ফিৎনার রূপ ধারণ করে নেয় এবং সংশোধনের পরিবর্তে এর মাধ্যমে বিরাট বিরাট বিপর্যয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে।

নবীগণ সমসাময়িক নেতাদের সম্বোধন করেছেন

এই অনুচ্ছেদে আমরা প্রশ্নের প্রথমাংশের জবাব দেয়ার চেষ্টা করব। কুরআনের পেশকৃত ইতিহাসের আলোকে আমাদের মতে এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে এই যে, আম্বিয়া

আলাইহিমুস সালাম সর্ব প্রথমে জাতির প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আল্লাহর দীনকে কবুল করার জন্য আহবান জানিয়েছেন। তাঁরা এদের সংশোধনকে জনসাধারণের সংশোধনের উপায় বানাতেন। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম নিজ বংশের লোকদের কাছে দীনের দাওয়াত পেশ করেন। সে সময় তারাই জনগণের ধর্মীয় নেতার পদে সমাসীন ছিল। অতপর তিনি সমসাময়িক বাদশার কাছে দীনের দাওয়াত পেশ করেন–যার হাতে জাতির রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল এবং যে নিজেকে লোকদের জীবন মৃত্যুর মালিক বলে মনে করে নিয়েছিল।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَاجَّ اِبْرَاهِيْمَ فِى رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ـ

"তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার রব সম্পর্কে বক্র বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল? তা হয়েছিল এইজন্য যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছিলেন।"–(সূরাবাকারাঃ২৫৭)

আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন সর্বপ্রথম ফিরাউনকে তার দীনের দিকে আহবান জানান।

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ـ

"তুমি ফিরাউনের কাছে যাও। সে সীমা লংঘন করেছে। তাকে জিজ্ঞাসা কর, তুমি পবিত্রতা অর্জন করতে প্রস্তুত আছ? আমি কি তোমাকে তোমার রবের দিকে পথ দেখাব যাতে তুমি তাঁকে ভয় করতে পার।"

–(সূরা নাযিআহঃ১৭–১৯)

হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম তাঁর সমসাময়িক প্রভাবশালী বাদশা নবুখায নসরকে সর্ব প্রথম দীনের দাওয়াত দেন। ইরমিয়া নবী শামালের বাদশাদের সামনে তাঁর নবুওয়াতের দাবী পেশ করেন। মসীহ আলাইহিস সালাম সর্বপ্রথম ইহুদী আলেমদের সম্বোধন করেন। অনুরূপভাবে নূহ আলাইহিস সালাম, হুদ আলাইহিস সালাম, লূত আলাইহিস সালাম, শুআইব আলাইহিস সালাম সবার দাওয়াত কুরআন মজীদে উল্লেখিত আছে। তাদের প্রত্যেকে সমসাময়িক যুগের সমাজপতি ও গর্ব–অহংকারে ফেটে পড়া লোকদের সর্বপ্রথম আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানান এবং তাদের চিন্তাধারা ও মতবাদের ওপর আঘাত হানেন। সবশেষে নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটে। তাকে নির্দেশ দেয়া হয় যে, নিজের কোরাইশ বংশীয় আত্মীয়-স্বজনদের শাস্তির ভয় দেখাও। এই লোকেরা আরবের ধর্মীয় এবং গোষ্ঠীপতি-শাসিত রাষ্ট্রের কর্ণধার ছিল। তিনি তাদের মাধ্যমে গোটা আরবের নৈতিক এবং রাজনৈতিক পথপ্রদর্শকের কাজ করিয়েছেন।

আরব বিশ্ব ছাড়া অবশিষ্ট দুনিয়ায় ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য তিনি মধ্যপন্থী উম্মাতকে যে পন্থা শিখিয়েছেন তা হচ্ছে এই যে, তিনি দুনিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে চিঠি লিখেছেন এবং সর্বপ্রথম তাদের সামনে ইসলামকে তুলে ধরেছেন। তিনি তাদের কাছে দাবী করলেন "তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকতে পারবে। অন্যথায় তোমাদের এবং তোমাদের অধীনস্তদের পথভ্রষ্টতার দায়দায়িত্ব তোমাদেরই বহন করতে হবে।" উম্মাতের নেতৃবৃন্দও যেন সাধারণ ভাবে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এই পন্থার অনুসরণ করে। উল্লেখিত বক্তব্য সেদিকে ইংগিত করছে। খেলাফতে রাশেদার গোটা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম সাধারণ ভাবে দীনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এই পন্থারই অনুসরণ করেছেন। মানব জাতির ওপর 'সাক্ষী' হওয়ার দিক থেকে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তাঁদের সাধারণ দাওয়াতের যে দায়িত্ব তার অর্পণ করেন তা তাঁরা রসূলের প্রদর্শিত পন্থায়ই আঞ্জাম দেন।

হযরত ঈসার আহ্বান

একটি বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, যাদের দরজায় সর্বপ্রথম হেদায়াতের সূর্য আলো বিচ্ছুরণ করে তারাই আল্লাহর দীনকে গ্রহণ করার ব্যাপারে সবচেয়ে পেছনে থেকে গেছে। যারা নবীদের ইতিহাস সম্পর্কে খোজ রাখে তারা এসত্যকে অস্বীকার করতে পারেনা। আবিসিনিয়ার বিলাল (রা), এশিয়া মাইনরের সুহাইব (রা), পারস্যের সালমান (রা) এবং মদীনার কৃষিজীবী মানুষেরাই দূরদূরান্ত থেকে আসতেন এবং ইসলাম গ্রহণ করে চলে যেতেন। কিন্তু কুরাইশ নেতা আবু লাহাব, আবু জাহল, উমাইয়া ইবনে খালফ প্রমুখ এবং তায়েফের যেসব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সামনে আল্লাহর রসূল রাতদিন হকের দাওয়াত দিয়েছেন, তারা এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থেকে গেল। আরবের সাধারণ লোকেরাই বরং এই দাওয়াতের কল্যাণ লাভ করে ধন্য হল। অথচ তখনো তাদের কাছে সরাসরি দাওয়াত পৌঁছেনি, পরক্ষভাবে পৌঁছে ছিল।

যেসব লোক প্রথমে দাওয়াত পায় তারা দাওয়াত গ্রহণের বেলায় পেছনে পড়ে থাকে। আর যারা দাওয়াত পরে পায় তারা দাওয়াত কবুল করার বেলায় সবার আগে থাকে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কথা সত্য প্রমানিত হয়েছে।

তিনি বলেছেন, "কত লোক অগ্রবর্তী হয়ে আছে তারা পেছনে থেকে যাবে। আর কত লোক আছে যারা পেছনে রয়েছে, তারা সামনে এসে যাবে।"

কিন্তু তা সত্ত্বেও নবী রসূলগণ তাঁদের দাওয়াতের ক্রমিক ধারা পরিবর্তন করেননি। তাঁরা প্রথমে সমাজের প্রতিপত্তিশালী লোকদের সামনে দাওয়াত পেশ করতেন। এদের বাড়াবাড়ি এবং একগুঁয়েমী যখন তাদের নিরাশ করে দিত তখন তাঁরা সাধারণ মানুষের কাছে দাওয়াত নিয়ে উপস্থিত হতেন। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে অনবরত ইহুদী আলেমদের অনমনীয়তার ওপর আঘাত করতে থাকেন। কিন্তু একটা উল্লেখযোগ্য সময় ধরে চেষ্টা-সাধনার পরও যখন তাদের গর্ব-অহংকার এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণর্থ কূটনীতির প্রস্তর ভেংগে দেয়া সম্ভব হয়নি, তখন তিনি তাদেরকে পরিত্যাগ করে ঝিলের পাড়ের জেলেদের কাছে চলে গেলেন। তিনি তাদের ডেকে বললেন, "হে মাছ শিকারীগণ! এসো আমি তোমাদেরকে মানুষ শিকারী বানিয়ে দেই।" আল্লাহ তাআলা তাঁকে তাদের মধ্য থেকে এমন একটি ঈমানদার সম্প্রদায় দান করলেন যারা তাঁর নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে।

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِيْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (آل عمران- ٥٢)

"ঈসা যখন তাদের (ইহুদী আলেম) কুফরীর ওপর অবিচল থাকার ব্যাপারটি অনুভব করল, তখন (সাধারণ লোকদের উদ্দেশ্য করে) বলল, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম। আপনি সাক্ষী থাকুন,আমরা তাঁর অনুগত হয়ে গেলাম।"-(সূরা আলে ইমরানঃ৫২)

উল্লেখিত আয়াতে ঈসা আলাইহিস সালামের সাধারণ আহবানের দিকে ইংগিত করা হয়েছে-যখন তিনি সাধারণ ভাবে দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং যখন তিনি সমসাময়িক ধর্মীয় নেতা ও সমাজপতিদের সত্যকে গ্রহণ করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছিলেন। এ সময় তিনি গরীব শ্রেণী এবং সাধারণ লোকদের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করেন। তিনি আবেগময় ভংগীতে দাওয়াত পেশ করলেন, ফলে তা নদীর পাড়ের জেলেদের মনকে মোমের মত গলিয়ে দিল। কিন্তু এই দাওয়াত জেরুজালেমের কেতাদুরস্ত ধর্মীয় নেতাদের মন গলাতে পারলনা। অবশেষে এই

সাধারণ লোকদের মধ্য থেকেই হকের পতাকাবাহী এমন একদল খাদেম সৃষ্টি হল– যারা ঈমানের বিরাট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর দীনকে এই দুনিয়ায় বিজয়ী করেছে। (সূরা সফ–এ এই সত্যের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে)।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ–

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়াম হাওয়ারীদের বলেছিল, আল্লাহর রাস্তায় কে আমার সাহায্যকারী হবে। হাওয়ারীগণ বলল, আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। অতএব বণী ইসরাঈলের একটি দল (হাওয়ারী) ঈমান আনল এবং অপর একটি দল (ইহুদী আলেম ও সমাজপতিগণ) কুফরীর পথ অবলম্বন করল। অতপর আমরা ঈমানদার লোকদের তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলাম। অতএব তারা জয়যুক্ত হল।"–(সূরা সফঃ১৪)

হযরত ঈসা মসীহ আলাইহিস সালাম হেদায়াত এবং গোমরাহির প্রসংগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মন্তব্য করেছেন যে, "অগ্রগামী ব্যক্তি পেছনে থেকে যাবে, আর পশ্চাদবর্তী ব্যক্তি সামনে এসে যাবে।" আল্লাহর দীনকে আপন করে নেয়ার ক্ষেত্রে যদিও সাধারণ লোকেরাই সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও নবী রসূলগণ যতক্ষণ সমসাময়িক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ব্যাপরে নিরাশ না হতেন– ততক্ষণ সাধারণ লোকদের সরাসরি সম্বোধন করতেন না।

রসূলুল্লাহর আহবান

গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে ঠিক এই অবস্থা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের মধ্যেও দৃষ্টিগোচর হবে। তিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সর্বপ্রথম কুরাইশ গোত্রের লোকদের কাছে আল্লাহর দীনের দাওয়াত পেশ করেন। তারা সে সময় গোটা আরব জাহানের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নেতা ছিল। কুরাইশ গোত্রের প্রতিটি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সামনে তিনি এক এক করে দাওয়াত পেশ করেন। তাদের পক্ষ থেকে যখন ঘৃনা বিদ্বেষ, বিরোধিতা প্রকাশ পেল, তখন তিনি

তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়াও করেছিলেন। তাদের মধ্যে যারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল–তিনি তাদের কতেকের নাম ধরেও দোয়া করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে যে, তিনি দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ, উমর অথবা আবু জাহলকে হেদায়াত দান করে ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করে দিন।"

এই লোকদের হেদায়াতের জন্য তিনি এতটা উদগ্রীব ছিলেন, অনেক সময় তিনি নিজের আরাম–আয়াশের প্রতিও লক্ষ রাখতেননা এবং নিজের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার খেয়ালও করতেন না। এজন্য কোন সময় এমনও হত যে, ইতিপূর্বে যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মুখাপেক্ষী–তাদেরকেও সময়মত শিক্ষা–প্রশিক্ষণ দেয়ার অবসর পেতেন না। এসব সত্ত্বেও তিনি একটি উল্লেখযোগ্য সময় পর্যন্ত এসব লোকদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন এবং তাদের যে কোন ধরণের তিরস্কার,উপহাস, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বিরোধিতা সহ্য করতে থাকেন। এমনকি যখন প্রমান চূড়ান্ত করার হক আদায় হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তাআলা তাকে এদের পেছনে সময় নষ্ট করতে নিষেধ করে দিলেন এবং যাদের সম্পর্কে ঈমান আনার আশা করা যায়, তাদের দিকে মনোযোগ দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কারণ এরা নেতৃত্বের বিশেষ রোগ থেকে মুক্ত ছিল। এজন্য আশা করা যাচ্ছিল যে, হকের উপদেশ দিলে তারা তা শুনবে এবং মানবে। এই স্থানে পৌঁছে আল্লাহ তাআলা তার নবীকে গর্ব অহংকারে ফেটে পড়া লোকদের উপেক্ষা করার নির্দেশ দেন।

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا اَنْتَ بِمَلُوْمٍ وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

"অতএব তুমি তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। এজন্য তুমি তিরস্কৃত হবেনা। তুমি নসীহত করতে থাক। কেননা নসীহত ঈমানদার লোকদের জন্য উপকারী।"–(সূরা যারিয়াতঃ ৫৪,৫৫)

عَبَسَ وَتَوَلّٰى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهُ يَزَّكّٰى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدّٰى وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى وَهُوَ يَخْشٰى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ (عبس)

"সে ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এইজন্য যে, তার কাছে অন্ধ ব্যক্তি এসেছে। তুমি কি জান হয়ত সে পবিত্রতা অর্জন করবে, অথবা নসীহত গ্রহণ করবে এবং তা তার উপকারে আসবে। যে লোক উন্নাসিকতা দেখায়, তুমি তার পেছনে লেগে গেছ। অথচ সে যদি পবিত্রতা অর্জণ না করে, তাহলে তোমার ওপর কোন অভিযোগ নেই। আর যে ব্যক্তি তোমার কাছে আগ্রহ সহকারে আসে সহকারে আসে এবং সে খোদাকেও ভয় করে তার প্রতি তুমি অনীহা প্রদর্শন করছ। কক্ষণও নয়। (এই অহংকারীদের এতটা পরোয়া করার প্রয়োজন নেই) এতো এক উপদেশ মাত্র। যার ইচ্ছা তা গ্রহণ করবে। তা এমন এক সহীফায় লিপিবদ্ধ যা সম্মানিত, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং পবিত্র। তা মর্যাদাবান এবং পূণ্যবান লেখকদের হাতে থাকে।"-(সূরা আবাসাঃ১-১৬)

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ (الحجر - ٨٨) ـ

"তুমি দুনিয়ার এই দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি চোখ তুলে তাকাবেনা যা আমরা কাফেরদের কোন কোন দলকে দিয়েছি। তাদের দূর্ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করনা। নিজের দয়া-অনুগ্রহের ডানা মুমিনদের ওপর প্রসারিত করে রাখ।"
-(সূরা হিজরঃ৮৮)

এই পন্থায় দাওয়াত দেয়ার কারণ

নবী রসূলদের দাওয়াত পেশ করার এই ক্রমিক ধারা অবলম্বন করাটা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। বরং এর কতগুলো বিশেষ কারণ রয়েছে। এর কতিপয় কারণ আমরা এখানে উল্লেখ করব।

প্রথমকারণঃ এর সবচেয়ে বড় এবং সর্বাধিক সুস্পষ্ট কারণ হচ্ছে এই যে, সাধারণ লোকেরা জ্ঞান ও কর্মে এবং চরিত্র নৈতিকতার ক্ষেত্রে সমাজের প্রভাবশালী এবং কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকদের অনুসারী হয়ে থাকে। প্রবাদ আছে যে,
"প্রজা চলে রাজার চালে।" এজন্য সমাজের ও রাষ্ট্রের কর্ণধরগণ যদি সংশোধণ কর্মসূচীকে গ্রহণ করে নেয, তা হলে সাধারণ লোকেরা আপনা আপনী সংশোধন হয়ে যাবে। যদি তারা এ পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়, তাহলে সাধারণ লোকেরা প্রথমে কোন সংশোধন কার্যক্রম গ্রহণ করেনা। যদিও বা কবুল করে তাহলে এর প্রভাবগুতি দ্রুত খতম হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণঃ নবী–রসূলগণ সমাজের বিশিষ্ট শ্রেণীর বিরুদ্ধে না কোন রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক প্রতিহিংসায় লিপ্ত হন, আর না পতিত শ্রেণীর জন্য তাদের অন্তরে কোন অনর্থক পক্ষপাতিত্ব থাকে। তাঁরা কখনো নিম্ন শ্রেণীর লোকদেরকে উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রমে লিপ্ত হওয়ার জন্য উত্তেজিত করেননা এবং এই উচ্চ শ্রেণীকে নিম্নস্তরে ঠেলে দেয়ার এবং নিম্ন শ্রেণীকে উচ্চ স্তরে তুলে দেয়ার চেষ্টাও করেন না। তাঁরা যে মিশন নিয়ে দুনিয়ায় এসেছেন, কোন বিপর্যয় ও দুষ্কৃতিকে অন্য কোন বিপর্যয় ও দুষ্কর্মের সাহায্যে পরিবর্তন করে দেয়ার মাধ্যমে তা সফল হতে পারেনা। বরং গোটা সমাজকে খোদাভীতি, আত্মীয়–সম্পর্কে এবং আখেরাত ভীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমেই এই মিশন সফল হতে পারে। এজন্য সাধারণ এবং বিশেষ উভয় শ্রেণীকেই তাঁরা সমান ভালবাসা ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে থাকেন। উভয়ই যাতে নিজ নিজ রোগ থেকে মুক্ত হয়ে সুস্থতাকে গ্রহণ করতে পারে সেজন্য তাঁরা সমানভাবে চেষ্টা করে যান। অবশ্য এই সংশোধন প্রচেষ্টায় তাঁরা বিশেষ শ্রেণীর সংশোধনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এর কারণ হচ্ছে এইযে, সমাজের মধ্যে মূলত তারাই রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে এবং তাদের স্পর্শে অবশিষ্টরা রোগাক্রান্ত হয়। এজন্য তাঁরা প্রথমে এদের চিকিৎসার চিন্তা করে থাকেন। তাদের সুস্থ করে তুলতে পারলে অন্যদের সুস্থ করতে তেমন বেগ পেতে হয়না।

অপরদিকে যেসব লোক উচ্চ শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক ধরণের অর্থনৈতিক প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধের আবেগ দ্বারা তাড়িত, তাদের কর্মপন্থা নবীদের কর্মপন্থার সম্পূর্ণ বিপরীত। এরা সাধারণ মানুষকে পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে শ্রেণী সংগ্রাম বাধিয়ে দেয়। এর পরিনতিতে তাদের মতানুযায়ী এমন গণ–একনায়কতন্ত্র কায়েম হয় যা তাদের ধারণায় যাবতীয় কল্যাণ ও মুক্তির চাবিকাঠি। আসলে এই খুন–খারাবী ও রক্তপাতের পরিনতি এছাড়া আর কিছুই হয়না যে, পুরানো পুঁজিপতিদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব খতম হয়ে যায় এবং নতুন পুঁজিপতিদের একনায়কত্ব তাদের স্থান দখল করে নেয়। যুলুম, নির্যাতন ও অন্যায় অবিচারের ইজারা যা এতদিন গুটিকয়েক পুরানো পুঁজিপতি পরিবারের হাতে ছিল, তা গুটিকয়েক নতুন পরিবারের দখলে চলে যায়। এই বিপ্লবের দ্বারা দুনিয়ার যদি কোন উপকার হয়েও থাকে তা শুধু এই যে, একদলের প্রতিশোধের আগুন নির্বাপিত হয়ে যায় এবং যুলুম–নির্যাতন, অন্যায়–অবিচার চালানো এবং শক্তি ও ক্ষমতা প্রদর্শনের যে খাহেশ তারা এ পর্যন্ত দাবিয়ে রেখেছে এবং যা প্রকাশ করার সুযোগ এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি তা প্রকাশ করার এবং নতুন খেলা শুরু করার রাস্তা খুলে যায়। যাদের দৃষ্টিসীমা কেবল এধরণের

সংশোধনের দিকে নিবদ্ধ–তারা নিসন্দেহে জনগণকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যাবহার করে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে পারে।

কিন্তু নবী–রসূলগণ যে বিপ্লব সাধনের জন্য আসেন–তা কেবল জারকে ষ্টালিন এবং লেলিনের মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হতে পারেনা। বরং তা বড় এবং ছোট সবার মধ্য থেকে যুলুমনির্যাতন এবং অন্যায়–অবিচারের প্রবণতাকে খতম করে দেয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হতে পারে। একারণে এই ধরণের হৈহুল্লোড় ও দাংগাবাজী তাদের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

তৃতীয় কারনঃ তৃতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, জাতির মধ্যে যেসব লোক উচ্চ পর্যায়ের হয়ে থাকে, তারা সাধারণত বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও উন্নততর হয়ে থাকে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাধান্যই মূলত তাদেরকে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করে। একারণে যে দাওয়াতের উদ্দেশ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাগত ও কর্মগত বিপ্লব সাধান তা তাদেরকে উপেক্ষা করতে পারেনা। এই লোকেরা যদি কোন নির্ভুল চিন্তাধারাকে গ্রহণ করে নেয়, তাহলে এর ভিত্তিতে তারা কোন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর ব্যবস্থাকে পরিচালিত করতে পারে। এদিক থেকে তাদের একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে। তাদেরকে বিনষ্ট করলে ক্ষতি মূলত তাদের হয়না, বরং যে সমাজ থেকে তাদের শেষ করে দেয়া হয় সেই সমাজেরই ক্ষতি হয়। গনবিপ্লব সাধনের মাধ্যমে যদি তাদের শেষ করে দেয়া হয়, তাহলে গোটা সমাজ মাখন তোলা দুধের সমতুল্য হয়ে যায়। এই সমাজ যখন বিপ্লবের প্রচন্ডতা থেকে অবসর হয়ে জীবনের পুনর্গঠনের নতুন নকসা প্রনয়ন করে, তখন সে নিজের দেউলিয়াত্ব অনুভব করতে পারে। এসময় সে পরিস্কার দেখতে পায় সামনের কাজের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক এবং চিন্তাগত যোগ্যতার খুবই প্রয়োজন। কিন্তু এ যোগ্যতা তাদের বাহিনী সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে।

রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্যায় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এই অবস্থাই সৃষ্টি হয়েছিল। বিপ্লব শেষ হওয়ার পর যাদের হাতে ক্ষমতা আসে তার মোটেই জানতনা যে, নিজেদের মতাদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনা কিভাবে চালাতে হবে। ফল হল এই যে, আগুন এবং রক্তের হোলিখেলা করে তারা যে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করেছে তা নিজেরা সামলাতে পারলনা। বরং তা সামলানোর জন্য সেই লোকদের ওপর ন্যস্ত করতে হল, যাদের কাছ থেকে তা ছিনিয়ে আনা হয়েছিল। এই গ্রুপটি জনতার হট্টগোলে প্রভাবিত হয়ে এই নতুন মতবাদের সামনে মাথা নত করে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু নিজেদের মনের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ঘৃনা এবং শত্রুতা লুকিয়ে রেখেছিল। একারণে তারা এই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে সম্পূর্ণরূপে মোনাফিকী পন্থায়

ব্যবহার করেছিল এবং তাদের হাতে এই সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সেই পরিনতিই হল–যা কোন বিপ্লবকে মোনাফিকী পান্থায় অবলম্বনকারীদের হাতে হয়ে থাকে।

নবীদের দাওয়াতের পদ্ধতি এ ধরনের ভ্রান্তি থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁরা নিজেদের দাওয়াত সর্বপ্রথম প্রতিভাবান সম্প্রদায়ের কাছে পেশ করেছেন। এই স্তরের যেসব লোক প্রজ্ঞার সাথে সাথে ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকেও উন্নত ছিল, তারা দাওয়াত কবুল করার সাথে সাথে তাদের সহায়তায় দাওয়াতের শক্তিও বেড়ে যেত।

خيارکم في الجاهلية خيارکم في الاسلام ـ

"জাহেলী যুগে তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তারা উত্তম প্রমানিত হবে–যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করবে।"

এ হাদীসে সেই সত্যের দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। এটা দাওয়াতের সেই পন্থারই বরকত যে, ইসলাম হযরত আবুবকর (রা) ও হযরত উমরের (রা) মত লোক পেয়ে গেল। একদিকে তারা নিজেদের প্রতিভাবলে দাওয়াতের প্রাণ সত্তাকে নিজেদের মধ্যে এমন ভাবে শুষে নিলেন যে, তাঁরা নিজেরাই দাওয়াতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাকার হয়ে গেলেন। অপরদিকে নিজেদের উন্নত নৈতিক ও চারিত্রিক যোগ্যতার কারণে তারা এতটা শক্তির অধিকারী ছিলেন যে, এই দাওয়াতের ভিত্তিতে একটি পূর্নাংগ সমাজ–ব্যবস্থা গঠন করে তা পরিচালনা করেছেন এবং দুনিয়াকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলাম বাস্তব দিক থেকে এসব কিছুই করতে চায়।

চতুর্থ কারণঃ চতুর্থ কারণ এই যে, এই শ্রেণীর লোকেরা বস্তুগত দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকে এই বস্তুগত শ্রেষ্ঠত্ব স্বয়ং কোন খারাপ জিনিস নয় যে, তাকে অবশ্যই ঘৃণা করতে হবে। এর মধ্যে যদি কোন খারাপ দিক থেকে থাকে তাহলে এটা কেবল তখনই হতে পারে, যখন তা বাতিলের সমর্থন ও শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিণত হয়। তা যদি বাতিলের পরিবর্তে হকের সাহায্য সমর্থণ ও শক্তি বৃদ্ধির উপায়ে পরিনত হয়–তাহলে সুলায়মান আলাইহিস সালামের শানশওকত এবং যুল কারনাইনের রাজত্ব যেভাবে একটি বিরাট নিআমত ও বরকত ছিল, অনুরূপ ভাবে প্রত্যেক বস্তুগত প্রাধান্যও আল্লাহ তাআলার এক বিরাট নিআমত। কুরাইশ নেতাদের দাওয়াত পৌছানোর ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এতটা ব্যতিব্যস্ত ছিলেন; তাতে তাঁর দৃষ্টির সামনে অন্য যেসব দিক ছিল সেখানে বিশেষ করে এই জিনিসটিও তাঁর বিবেচনায় ছিল যে, এসব লোক যদি দাওয়াত কবুল করে নেয়,

তাহলে যে বস্তুগত উপায় উপকরণ তাদের অধিকারে রয়েছে তাও ইসলামের সাহায্য–সহযোগিতায় আপনা আপনি উৎসর্গীকৃত হবে। এর ফলে একদিকে যেমন বাতিলের হাত থেকে এক বিরাট শক্তি খসে পড়বে, অপরদিকে এই শক্তি দীনে হকের হাতে এসে বাতিলের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী তরবারিতে পরিণত হবে।

প্রতিটি হকের দাওয়াতের সূচনা সহায় সম্বলহীন অবস্থায় হয়ে থাকে। অতপর তা ধীরে ধীরে সমসাময়িক বস্তুগত উপায়–উপাদানকে হস্তগত করে এবং আবিষ্কার উদ্ভাবন ও জ্ঞান–বিজ্ঞানের শক্তিকে অধীন করে নেয়। পরে সুযোগ মত তা বাতিলের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। এই জিনিসটা দুনিয়ার অন্য আন্দোলনের নেতারা যেমন আশা করে থাকে অনুরূপ ভাবে আম্বিয়ায়ে কেরামগণও তা চান। কিন্তু অন্যদের চাওয়ার মধ্যে এবং নবীদের চাওয়ার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাঁদের কাছে এই বৈষয়িক উপায়–উপকরণ এতটা গুরুত্ব লাভ করতে পারেনা যে, এর সামনে আসল উদ্দেশ্য গুরুত্বহীন হয়ে থেকে যাবে। এ কারণে যে স্তরে বৈষয়িক উপায়–উপকরণের আকাংখা নির্দিষ্ট সীমা লংঘন করতে যায় সেখানেই আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদের থামিয়ে দেন। তিনি নির্দেশ দেন, তোমরা কাফেরদের বিষয় সম্পদের দিকে দৃষ্টি দিওনা। তোমাদের দাওয়াত তার পাথেয় ও বাহন এবং তার নিরাপত্তা ও উন্নতির উপায়–উপকরণ তার নিজের সাথেই রাখে। আল্লাহ তাআলা নিজের তোমাদের এবং তোমাদের দাওয়াতের পৃষ্ঠপোষক।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَوٰةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ (طـه- ٣١)

"আর এই কাফেরদের মধ্যে যেসব লোকদের পরীক্ষার সম্মুখীন করার জন্য আমরা বৈষয়িক সম্পদের চাকচিক্য দান করেছি–তুমি সেদিকে চোখ তুলে তাকাবেনা। তোমার প্রভুর রেযেক অধিক উত্তম এবং স্থায়ী। তুমি নিজের ঘরের লোকদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং এর ওপর অবিচল থাক। আমরা তোমার কাছে রেযেক চাচ্ছিনা। আমরাই তোমাকে রেযেক দান করছি। আর পরিনামে তাকওয়ারই কল্যাণ হয়ে থাকে।" –(সূরা তা হাঃ ১৩১, ১৩২)

পঞ্চম কারণঃ পঞ্চম কারণ হচ্ছে এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম এমন একটি সত্য জীবন বিধান কায়েম করার জন্য দুনিয়ায় এসেছেন, যার ভিত্তি আল্লাহর বন্দেগী, ঈমানদার সুলভ পর্যালোচনা, নিরপেক্ষ সমালোচনা, গবেষনা এবং পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতে যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার (শূরা) নীতির উপর রাখা হয়েছে। এখানে ব্যক্তি পুজার কোন স্থান নেই। এ কারণে তাঁরা স্বাভাবিক ভাবেই সর্বপ্রথম এমন লোকদের পেছনে চলার পরিবর্তে নিজেদের চিন্তাধারা ও সিদ্ধান্তের অনুসরণ করতে পারে। যেসব লোকের মধ্যে এই সৌন্দর্য বর্তমান নেই তারা নবীদের মিশন সফল করার জন্য মোটেই যোগ্য নয়। এই ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন লোক এমনিতেই যে কোন স্তরের লোকদের মধ্যেই থাকতে পারে এবং আছে। কিন্তু মনিমুক্তার অন্বেষন প্রথমে খনিতেই করা হয়, আবর্জনার মধ্যে নয়। এজন্য এজন্য নবী-রসূলগণ নিজেদের উদ্দেশ্যের উপযুক্ত লোক বাছাই করার জন্য প্রথমে সমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীকে সম্বোধন করে থাকেন। যতক্ষন তাদের ব্যাপারে নিরাশ না হন ততক্ষণ অন্যদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন না।

পক্ষান্তরে যেসব লোক মূলনীতি ও উদ্দেশ্যের পরিবর্তে নিজেদের ব্যক্তিত্বের পূজা করতে চায়, তারা সর্বদা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণীকে এড়িয়ে সর্বসাধারণের মধ্যে নিজেদের আন্দোলন পরিচালনা করে থাকে। এ ধরণের লোকদের মধ্যে যদি রাজনৈতিক যোগ্যতা ও শক্তি থেকে থাকে তাহলে তারা নিজেদের ডিকটেটরশীপ কায়েম করে। যদি তাদের মধ্যে রাজনৈতিক যোগ্যতা না থেকে থাকে , অথবা যোগ্যতা তো আছে কিন্তু এজন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা নেই তাহলে এরা সাধারণ নেতা হয়েই থেকে যায়। আবার যদি তার ধর্মীয় ব্যাপারে প্রতারনা, ভন্ডামি ও ছলচাতুরির আশ্রয় নিতে সিদ্ধহস্ত হয়ে থাকে তাহলে পীর-মুরিদীর ব্যবসা ফেঁদে বসে। এ ধরনের লোকেরা প্রতিভাবান শ্রেণীকে এতটা ভয় করে-দিনের আলোকে চোর যতটা ভয় করে থাকে। তাদের যাবতীয় খেলা অন্ধকারেই ভাল জমে থাকে। এজন্য তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে।

ষষ্ঠ কারণঃ ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে এই যে, যদি কোন সমাজের প্রতিভাবান স্তরকে বাদ দিয়ে সাধারণ লোকদের মাধ্যমে কোন আন্দোলন শুরু করা হয়, তাহলে সাধারণের মধ্যে যেসব লোক এ আন্দোলনকে কবুল করে নেয়-তারা সংশয়-সন্দেহের শিকারে পরিনত হয়। বরং তারা একধরণের হীনমন্যতার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে এবং যতক্ষণ সমাজের উচ্চ শ্রেণীর কিছু লোক এই আন্দোলনের অনুসারী না হয়ে যায়, ততক্ষণ তাদের মধ্যে এতটা আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হতে পারেনা যার প্রভাবে

প্রভাবান্বিত হয়ে তারা বিপ্লবের জন্য বাজি লড়তে পারে। এর মনস্তাত্বিক কারণ সুস্পষ্ট। তা হচ্ছে এইযে, তারা যদিও মনেপ্রাণে আন্দোলনকে কবুল করে নিয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে তারা এও দেখতে পাচ্ছে যে, যেসব লোকের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং বস্তুগত প্রাধান্য তারা এপর্যন্ত স্বীকার করে আসছে আন্দোলন তাদেরকে এখনো জয় করতে পারেনি। তারা কখনো এর কারণ এই মনে করে থাকে যে, আন্দোলনকে যারা কবুল করেনি এটা তাদেরই ত্রুটি। আবার কখনো এইমনে করে থাকে যে, খুব সম্ভব আন্দোলনের দর্শনের মধ্যেই কোন দুর্বলতা রয়েছে–যা তাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, কিন্তু এদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছেনা। এই দোটানা রোগ তাদেরকে আন্দোলনের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য বানিয়ে রেখে দেয় এবং তারা আন্দোলনকে স্বীকার করে নিয়েও যেনপ্রত্যাখ্যান কারীদের কাতারেই থেকে যাচ্ছে।

আম্বিয়ায়ে কেরামদের কর্মপন্থা এই ত্রুটি থেকে সম্পূর্ন পবিত্র। তাঁরা প্রথমেই সেইসব লোকদের চিন্তধারা ও মতবাদের ওপর আঘাত হানেন, যাদের নেতৃত্বে সমাজব্যবাস্থা পরিচালিত হয়। কিছুকাল ধরে দ্বন্দ্ব–সংঘাত চলার পর একদিকে তাঁরা সমসাময়িক নৈতিক,রাজনৈতিক এবং আধিভৌতিক দর্শনের মূল্যৎপাটন করে রেখে দেন, অপর দিকে যেসব লোক ভ্রান্ত দর্শনের ওপর সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালানা করে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করে ফেলেন। এসময় সাধারণ লোকেরা নিরপেক্ষ থেকে এই সংঘাতকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করতে থাকে এবং অনুমান করতে থাকে এই যুদ্ধে কোন পক্ষে সত্য রয়েছে। চিন্তাশীল লোকেরা প্রথম পর্যায়েই বুঝতে সক্ষম হয় যে, নবীদের সাথেই সত্য রয়েছে এবং তারা তা কবুলও করে নেয়। কিন্তু যারা প্রখর মেধার অধিকারী নয় তারা কিছুকাল দোটানা অবস্থায় পড়ে থাকে। কিন্তু হক বাতিলের এই সংঘাত যখন এমন স্তরে পৌঁছে যায় যেখানে বাতিল তার নিজের সাহায্যের জন্য এবং হককে মিথ্যা প্রমান করার জন্য খোলা হাতিয়ার ব্যবহারে অবতীর্ন হয়–তখন তাদের সামনেও হক সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ে এবং তারাও সত্যের সামনে মাথা নত করে দেয়।

সাধারণ লোকদের এই দুটি দল হককে গ্রহণ করার ব্যাপারে কিছুটা অগ্রগামী এবং পশ্চাদগামী হয়ে থাকে কিন্তু উভয়েই তাকে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভংগী নিয়ে গ্রহণ করে থাকে। এ কারণে তারা পূর্বে উল্লেখিত দলের ন্যায় হীনমন্যতার শিকার হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে। এদের অন্তর থেকে হকের বিরোধিতকারীদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে মুছে যায়। তারা দেখতে পেয়েছে যে, নিজেদের দৃষ্টিভংগীকে বৈধ করার জন্য এদের কাছে হঠকারিতা ,একগুঁয়েমী এবং জেদ ছাড়া আর কোন প্রমান নেই।

এদের প্রতারনা, স্বার্থপরতা এবং কৃত্রিমতাও তাদের সামনে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এজন্য তাদের প্রাচীন নেতৃত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তাদের অন্তর থেকে বিলীন হয়ে যায়। এই পর্যবেক্ষণ তাদের মধ্যে হীনমন্যতার পরিবর্তে শ্রেষ্ঠত্ববোধ সৃষ্টি করে। তারা 'বড়দের' বিরোধিতায় সংশয়–সন্দেহ এবং ভয়–ভীতির শিকার হওয়ার পরিবর্তে সত্যের সাহায্য করতে করতে নিজেদের মধ্যে এক অসাধারণ সম্মান ও উচ্চতা অনুভব করতে থাকে।এ জিনিসগুলো তাদেরকে মানসিক এবং নৈতিক দিক থেকে এতটা উচ্চস্তরে পৌঁছে দেয় যে, তাদের সংখ্যাশক্তি যতই কম হোক না কেন, উপায় উপকরণ যত সামান্যই হোক না কেন, তাদের তরবারী যত জীর্ণশীর্ণই হোক না কেন–তাদেরকে বিরাট বিরাট বাহিনীর সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে তারা এদেরকে পরাভূত করে দিত।

সপ্তমকারণঃ সপ্তম কারণ হচ্ছে এই যে, কোন দাওয়াতের স্থায়িত্বের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন হচ্ছে, প্রতিভাবান এবং উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মধ্য থেকে এর জন্য কর্মী সংগ্রহ করা। যদি তা সম্ভব না হয় তালে এই দাওয়াত স্থায়িত্বলাভ করতে পারেনা এবং বিদআতপন্থীরা অচিরেই তার মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি করে গোটা দাওয়াতকে কলুষময় করে ফেলে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বণী ইসরাঈলের আলেম সম্প্রদায় এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের কেউ তাঁর দাওয়াত কবুল করেনি। কেবল সাধারণ স্তরের কিছু সংখ্যক অনুসারী তিনি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। এই অনুসারীদের নিষ্ঠা, খোদাভীতি এবং দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তারা এই দাওয়াতকে প্রসারিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেন্টপল অচিরেই ঈসার (আ) ধর্মকে বিকৃত করে দেয়। সে এই বিকৃতি সাধনে যে জিনিসটিকে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগিয়েছে–তা ছিল তার এই অপপ্রচার যে, ঈসার অনুসারীগণ ছিল অশিক্ষিত সাধারণ লোক। এ কারণে তারা ঈসার (আ) শিক্ষার ভেদ ও তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম ছিলনা। সে নিজে ছিল গ্রীক দর্শন ও তাসাউফের বিশেষজ্ঞ। তার দাবী ছিল এই যে, যারা মসীহ আলাইহিস সালামের সাক্ষাত অনুসারী ছিল তাদের তুলনায় সে তাঁর শিক্ষার তাৎপর্য অধিক ভাল বোঝে। এ কারণে সাধারণের ওপর তার যাদু খেলে গেল এবং তার অপপ্রচার এতটা প্রভাবশীল হল যে, তার মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি। এবং ঈসার(আ) ধর্ম অতি দ্রুত সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার রূপ ধারণ করল।

পক্ষান্তরে ইসলাম গ্রহণকারীগণের মধ্যে যেমন হযরত আবুবকর (রা) ও উমরের (রা) মত প্রতিভাবান লোক ছিল–এজন্য বিদআতপন্থীরা অত সহজে ইসলামের মধ্যে

ছিদ্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি। ইসলামের আসল দাওয়াত সম্পর্কে বলা যায়, হাজারো বিপ্লব, হাজারো বিবর্তন এবং বিদআতপন্থীদের চরম আক্রমন সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত তা অবিকল রয়ে গেছে।

উপসংহার

এসব কারণে আম্বিয়ায় কেরামদের দাওয়াতের পদ্ধতি সব সময় এই ছিল যে, তাঁরা সর্বপ্রথম প্রতিভাবান সম্প্রদায়কে আহবান জানাতেন। যেসব ক্ষেত্রে আংশিক সংশোধনের পরিবর্তে সার্বিক সংশোধনের প্রয়োজন দেখা দেয় সেখানে এই পন্থাই ফলপ্রসূ হতে পারে। যদি কোথাও ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম হয়ে যায় এবং তার মধ্যে কোন আংশিক বিকৃতি সৃষ্টি হয়, তা সংশোধন করতে হলে এক্ষেত্রে কেবল বিকৃতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের সম্বোধন করতে হবে। কিন্তু যেখানে ইসলামী ব্যবস্থা আদৌ কায়েম নেই এবং আংশিক সংশোধনের পরিবর্তে পূর্ণ সংশোধন প্রয়োজন– সেখানে অবশ্যই নবীদের দাওয়াতের কর্মপন্থা অনুযায়ী সাধারণ ভাবে দাওয়াত পেশ করতে হবে এবং এই দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দেশের বুদ্ধিজীবী এবং কর্তৃত্বশীল শ্রেণীকে আহবান করতে হবে। চাই তাদের সম্পর্ক মুসলিম জাতির সাথেই থাকুক অথবা অমুসলিম জাতির সাথে। এ ছিল প্রশ্নের প্রথম অংশের জবাব।এখন আমরা প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ নিয়ে আলাপ করব।

৫

নবীদের সম্বোধন পন্থা

একথা সুস্পষ্ট যে, নবীদের আগমন এমন এক যুগেই হয়ে থাকে যখন হক বাতিল ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় আল্লাহর অহীর সাহায্য ছাড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে এবং কার্যত সমস্ত জীবন ব্যবস্থা হকের পরিবর্তে বাতিলের হাতে চলে যায়। এরূপ সময়ে হক কেবল নবীদের সাথেই থাকে। তাদের নির্ধারিত সীমার বাইরে হকের কিছু অংশ তো পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু পূর্ণাংগ হক পাওয়া সম্ভব নয়। একারণে আম্বিয়ায়ে কেরাম যদি সূচনাতেই লোকদের এভাবে সম্বোধন করেন যে, হে কাফেরগণ! ঈমান আন, হে মুশরিকগণ! একত্ববাদ গ্রহণ কর, তাহলে বাস্তব অবস্থার দৃষ্টিতে তাঁদের এই সম্বোধন অনুপযোগী ও অসংগত হতে পারেনা। কারণ বাস্তব অবস্থা হচ্ছে এই যে, তাঁদের কর্মসীমার বাইরে যা কিছু আছে তা কেবল কুফর এবং শিরক। কিন্তু যে ব্যক্তিই নবীদের ইতিহাস পড়ছে সে জানে যে, তাঁরা এভাবে সম্বোধন করেননি। বরং তাঁরা লোকদেরকে–হে জনগণ, হে লোকসকল, হে আমার জাতির লোকেরা, হে কিতাবের অধিকারী সম্প্রদায়, হে ইহুদী সম্প্রদায়, হে নাসারা (খ্রীষ্টান) সম্প্রদায়, হে ঈমান গ্রহণকারীগণ-ইত্যাদি বাক্যে সম্বোধন করতেন।

নবী–রসূলগণ তাঁদের আহবানের এই ধরনটা ততক্ষণ অব্যাহত রাখেন–যতক্ষণ লোকেরা নিজেদের জিদ, একগুঁয়েমী এবং সত্যের বিরোধিতায় তাদেরকে এতটা নিরাশ করতে না পারে যে, তাদের জন্য নিজ সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া অথবা হিজরত করার সময় এসে যায়। যখন কোন জাতি সত্যের বিরোধিতায় এতটা সামনে অগ্রসর হয়ে যায় যে,তারা নিজেদের মাঝে হকপন্থীদের অস্তিত্বকে সাহায্য করতে মোটেই প্রস্তুত নয় এবং তাদের একগুঁয়েমীর সামনে হকের সমর্থনকারীর বড় থেকে বৃহত্তর প্রমাণও নিষ্ফল হয়ে যায়–তখন নবীগণ নিজ নিজ জাতিকে পরিত্যাগ করেন। এ সময়ই তাঁরা পরিষ্কার ভাবে তাদের জন্য কাফের, মুশরিক, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন।

হযরত ইবরাহীমের আদর্শ

এমনিতেই এই সত্য প্রত্যেক নবীর দাওয়াতের মধ্যে প্রতিভাত হয়ে আছে, কিন্তু বিশেষভাবে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যার অভিজ্ঞতা রয়েছে সে এ সত্যকে কোন ক্রমেই অস্বীকার করতে পারেনা। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নিজের পিতাকে, নিজের জাতিকে এবং সমসাময়িক বাদশাহকে যে বাক্যে সম্বোধন করেছেন, তার মধ্যে কোন একটি শব্দও এমন নেই যে, যার মাধ্যমে জানা যেতে পারে যে, তিনি সম্বোধিত ব্যক্তিকে 'কাফের' অথবা 'মুশরিক' বলে সম্বোধন করেছেন। কিন্তু যখন দাওয়াত ও তাবলীগ করতে করতে একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং দলীল –প্রমাণ ও মু'জিযা সমূহের সার্বিক শক্তি জাতির একগুঁয়েমীর সামনে কেবল প্রভাবহীনই হয়ে যায়নি বরং তাদের একগুঁয়েমী এতটা বেড়ে গেল যে, গোটা জাতি তাদের জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়–এসময় তারা নিজ নিজ জাতির সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দেন এবং এমন বাক্যে এই ঘোষণা দেন, যা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, জাতির কুফর ও শিরকের সাথে উদারতা ও সহিষ্ণুতার যে সর্বশেষ সীমা হতে পারে, তা এখন শেষ হয়ে গেছে। অতপর এখন তারা নিজ নিজ জাতির লোকদের কেবল কাফের এবং মুশরিক বলে সম্বোধন করেই ক্ষান্ত হননা, বরং তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের ঘৃনা এবং শত্রুতার কথাও ঘোষণা করে দেন। তারা তৌহীদের ওপর ঈমান না আনা পর্যন্ত এই সংঘাত চলতে থাকে।

قَدْ كَانَ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىْ اِبْرَاهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاۤءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاۤءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ – (ممتحنه– ٤) ـ

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম এবং তার সাথীদের জীবনের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা যখন জাতির লোকদের বলল, আমরা তোমাদের প্রতি এবং তোমরা আল্লাহ ছাড়া যেসব জিনিসের ইবাদত কর তার প্রতি অসন্তুষ্ট। আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করলাম। তোমরা এক আল্লাহর ওপর ঈমান না আনা পর্যন্ত সব সময়ের জন্য তোমাদের ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণা–বিদ্বেষের ঘোষণা দেয়া হল।"–(সূরা মুমতাহিনাঃ ৪)

রসূলুল্লাহর আদর্শ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। হিজরতের নিকটবর্তী সময়ের পূর্বেকার কোন সূরায়ই একথার প্রমান পাওয়া যাবেনা

যে, তিনি তার জাতিকে অথবা আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে প্রকাশ্যভাবে কাফের, মুশরিক, মোনাফিক ইত্যাদি শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের সূরাগুলোতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে শব্দের মাধ্যমে সম্বোধন করা হয়েছে তা হচ্ছে–হে মানুষ, হে মানব সমাজ, হে জাতির লোকেরা ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে আহলে কিতাবদের জন্য 'হে আহলে কিতাব' অথবা সম অর্থ প্রকাশক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি মোনাফিকদের জন্যও মক্কা বিজয়ের পর পর্যন্ত সেই সাধারণ বাক্য 'হে ঈমানদারগণ' ব্যবহার হতে থাকে। কোথাও প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে 'হে মোনাফিক গণ!' বলে সম্বোধন করা হয়নি।

কিন্তু যখন একটা বিশেষ সময় পর্যন্ত দাওয়াত ও তাবলীগ করার পর জাতির ওপর আল্লাহর দীনের চূড়ান্ত প্রমাণ পূর্ণ হয়ে গেল এবং দীন প্রত্যাখ্যানকারীগণ কেবল দীনকে প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হলনা, বরং তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিল–তখন তিনি হিজরত করলেন এবং কুরাইশ কাফেরদের পরিষ্কার ভাষায় 'হে কাফেরগণ' শব্দ দ্বারা সম্বোধন করলেন এবং তাদের ধর্মের সাথে নিজের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিলেন। এই হিজরতের প্রাককালে সেই সূরা নাযিল হয়–যা কুরাইশদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা বরং যুদ্ধের ঘোষণা সম্বলিত সূরাঃ

قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَاأَعْبُدُ، وَلاَ أَنَا عَابِدٌمَّاعَبَدْتُّمْ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَاأَعْبُدُ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ (الكَافِرُوْنَ- ٢-١) ـ

"বলে দাও, হে কাফেরগণ। তোমরা যেগুলোর ইবাদাত কর, আমি সেগুলোর ইবাদাত করিনা। আর আমি যাঁর ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও। তোমরা যেগুলোর ইবাদত কর, আমি সেগুলোর ইবাদাত করতে প্রস্তুত নই। আর আমি যাঁর ইবাদাত করি, তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন, আর আমার জন্য আমার দীন।"[১]

---

১. এই সূরার সর্বশেষ বক্তব্যকে লোকেরা উদারতার ও সহিষ্ণুতার ঘোষণা বলে সাব্যস্ত করতে চায়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। এটা মূলত সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা এবং যুদ্ধের ঘোষণা। বিস্তারিত জানার জন্য মওলানা হামীদুদ্দীন ফারাহীর "তাফসীরে সূরা কাফিরূন" দ্রষ্টব্য।

কাফের এবং কুফরী কাজে লিপ্ত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য

আম্বিয়ায়ে কেরাম এই যাবতীয় সতর্কতা ও সাবধানতা কেবল সেই সীমা পর্যন্তই অবলম্বন করতেন, যেখানে লোকদেরকে কাফের অথবা মুশরিক সাব্যস্ত করার প্রসংগ জড়িত রয়েছে। কিন্তু তাদের কাফের সুলভ ও মুশরিক সুলভ কার্যকলাপকে কুফর এবং শিরক সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তারা মোটেই উদারতা দেখাতেননা। এক্ষেত্রে তাঁরা যদি কোন কারণে সামান্য শিথিলতা প্রদর্শন করতে চাইতেন তাহলে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁদেরকে সে অনুমতি দেয়া হতনা। কঠিন বিরোধপূর্ণ অবস্থায়ও তাঁদেরকে এই হেদায়াত দান করা হত যে, কোন কুফর অথবা শিরককে কুফর অথবা শিরক সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তাঁরা কোন বিপদেরও পরোয়া করবেননা। এবং কোন সামাজিক–সামগ্রিক স্বার্থকেও বিবেচনা করবেননা। এর কারণ তো এটা হতেই পারে না যে, তাঁরা (নাউযুবিল্লাহ) লোকদের কাফের এবং মুশরিক সাব্যস্ত করতে চান। বরং তাঁরা কেবল অযথা ফ্যাসাদ সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় অথবা লোকদের হকের দাওয়াত থেকে সরে যাওয়ার ভয়েই এরূপ করা থেকে বিরত থেকেছেন। এ ধরনের পরিনামদর্শিতা যদি তাদের কাছে জায়েয হত তাহলে কাফেররা যে ধরনের সমঝোতার প্রস্তাব পেশ করত তা তাঁরা মঞ্জুর করে অতি সহজেই সব ঝগড়া মিটিয়ে ফেলতে পারতেন। কিন্তু কোন নবীই দীনের ব্যাপারে কখনো এধরনের পরিণামদর্শিতাকে বিবেচনা করেননি–চাই এজন্য তাদের যত বড় বিপদেরই মোকাবিলা করার প্রয়োজন হোক না কেন। একারণে এই প্রশ্নটি সম্পর্কে গম্ভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে যে, কুফর ও শিরককে কুফর ও শিরক সাব্যস্ত করার ব্যাপারে যাঁরা এতটা বেপরোয়া এবং এতটা নির্ভিক ছিলেন–তাঁরা কুফর ও শিরকে লিপ্ত ব্যক্তিদের কাফের এবং মুশরিক বলার ব্যাপারে এতটা সর্তকতা অবলম্বন করলেন কেন এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিতে এতটা বিলম্বই বা করলেন কেন?

এই পার্থক্যের দুটি কারণ

আমাদের মতে আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম কুফরী কাজ ও শেরেকী কাজকে কুফর এবং শিরক সাব্যস্ত করা সত্ত্বেও এসব কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের কাফের এবং মুশরিক বলতে এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিতে যে বিলম্ব করেছেন তার দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণঃ প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলার দরবারে বান্দাদের জন্য যে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা রয়েছে তা চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করার এবং পূর্ণাংগ তাবলীগ

হওয়ার পরই করা হয়। যদি চূড়ান্ত প্রমান পেশ এবং তাবলীগ ব্যতীতই লোকদেরকে পাকড়াও করা বা তাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করা জায়েয হত, তাহলে আল্লাহ তাআলা নবীদেরই পাঠাতেননা। এজন্য নবীগণ লোকদেরকে কাফের সাব্যস্ত করার এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার ঘোষণা দেয়ার পূর্বে তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার প্রমাণ পূর্ণ হওয়ার অবকাশ দেয়ার প্রয়োজন ছিল। যাতে আল্লাহর দীন প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের কাছে জিদ এবং একগুঁয়েমী ছাড়া আর কোন কারণ অবশিষ্ট না থাকে। প্রমান চূড়ান্ত করার জন্য একটি বিশেষ সময় ধরে দীনের প্রচার এবং শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন রয়েছে। নবীদের আগমন বন্ধ থাকা কালীন সময়ে গোমরাহীর যে অন্ধকার ছেয়ে যায় তা এতটা গভীর হয়ে থাকে যে, এর মধ্যে বিশিষ্ট লোকেরাও রাস্তা খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়না, সাধারণের তো প্রশ্নই ওঠেনা। এজন্য প্রত্যেক সম্প্রদায়ই প্রচার এবং প্রশিক্ষণের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। যাবতীয় গোমরাহীর যেহেতু বাপ-দাদার রসম-রেওয়াজের আকারে অন্তরে শিকড় গেড়ে বসে যায় এবং এর সাথে কিছু সংখ্যক লোকের স্বার্থও সংশ্লিষ্ট থাকে-তাই তার মূলোৎপাটন করার জন্য একটা উল্লেখযোগ্য সময় ধরে সংগ্রাম সাধনার প্রয়োজন দেখা দেয়। নবী-রসূলগণ পূর্ণ ধৈর্য ও স্থৈর্য সহাকারে একটা দীর্ঘ সময় ধরে এই সংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। শেষ পর্যন্ত সত্য এতটা স্পষ্ট হয়ে সামনে এসে যায় যে, বাতিলের সাথে যাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রয়েছে-তারা ব্যতিত আর কেউই এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারেনা। যখন তাবলীগের হক এই সীমা পর্যন্ত পূর্ণ হয়ে যায়, তখন সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের কুফর ও শিরকের প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া নবীদের জন্য বৈধ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণঃ দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, গোটা সমাজ ব্যবস্থা যখন হকের পরিবর্তে বাতিলের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে চলতে থাকে-তখন যেসব লোক হকের অনুসরণ করতে চায়-তাদের জন্যও তা অনুসরণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসময় জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে দুষ্কৃতি এমন ভাবে ঢুকে পড়ে যে, কোন সচেতন এবং হুশিয়ার ব্যক্তির পক্ষেও তার কিছু বিষ গলাধকরণ করা ছাড়া শ্বাস গ্রহণ সম্ভব হয়না। এই অবস্থায় নবী-রসূলগণ যদি পরিস্থিতির নাজুকতা বিবেচানা না করে লোকদের ওপর কুফর ও শিরকের ফতোয়া আরোপ করে তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিতেন, তাহলে এতে অনেকের ওপরই চরম অবিচার হত। এ কারণে তাঁরা কুফরীর ফতোয়া আরোপ এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়ার মাধ্যমে নিজেদের প্রচার কার্য শুরু করেননি। বরং এর পরিবর্তে তাঁরা দাওয়াত ও

প্রচারকদের মাধ্যমে এমন অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন, যাতে হকপন্থীরা নিজেদের নীতিমালার ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে পারে। এই পরিবেশ যখন সৃষ্টি হতে থাকে এবং হকপন্থীদের জীবন যাত্রার অনুকূল রাস্তা উন্মুক্ত হতে থাকে যদিও তা এখনো সংকীর্ণ এবং কঠিনই হোক না কেন–তখন যেসব লোক হকের পথ পরিত্যাগ করে কেবল নিজেদের আত্মতৃপ্তি, বিলাসিতা, বাহ্যাড়ম্বর ও প্রদর্শনীমূলক মনোবৃত্তির খাতিরে বাতিলের রাস্তায় দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে–তাদের কুফরী কাজের ঘোষণা দেয়া এবং তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সময় এসে যায়।

বর্তমান পরিবেশে

আম্বিয়ায়ে কেরামদের এই উত্তম আদর্শ থেকে আমরা যদি বর্তমান পরিবেশে পথনির্দেশনা লাভ করতে চাই, তাহলে একথা সুস্পষ্ট যে, বর্তমানে গোটা দুনিয়ায় যে পরিবেশ বিরাজ করছে তা অনেক দিক থেকে নবীদের আগমনধারা বন্ধ থাকাকালীন সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলার কিতাব আজ অবিকল অবস্থায় আমাদের মাঝে বর্তমান রয়েছে। এজন্য বর্তমান সময়ে দুনিয়া নতুন কোন নবীর মুখাপেক্ষী নয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত কোন নতুন নবীর মুখাপেক্ষী হবেও না। কিন্তু সৃষ্টকুলের পথপ্রদর্শণ এবং মুসলমানদেরকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য আমাদের শরীআত অনুমোদিত ব্যবস্থা ছিল খিলাফত ব্যবস্থা। সে ব্যবস্থা অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একারণে দুনিয়ার মানুষ বর্তমানে যে বিকৃতি ও পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়ে আছে এজন্য তাদেরকে অনেকটা অক্ষম বলা যায়। আমরা এই পুস্তকের 'তাবলীগের প্রচলিত পন্থার ত্রুটি' অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে বলে এসেছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য দুনিয়ার সামনে চূড়ান্তভাবে প্রমান পেশ করার দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের ওপর অর্পন করেছেন। আর এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার পন্থাও আল্লাহ তাআলা বলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে, মুসলমানরা খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম করবে। তা একদিকে দুনিয়ার মানুষকে কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে, অপরদিকে ন্যায়ানুগ কাজের নির্দেশ এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখার (আমর বিল–মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার) মাধ্যমে মুসলমানদের সিরাতে মুস্তাকীমের ওপর কায়েম রাখবে। খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম না থাকার কারণে এই দুটি কর্তব্যের একটিও পূরণ হচ্ছেনা। শুধু তাই নয়, কার্যত গোটা দুনিয়া একটি বাতিল ব্যাবস্থার অধীনে বন্দী হয়ে পড়েছে। আর বাতিল এতটা শক্তি ও চাকচিক্যের সাথে জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে যে, বর্তমান জীবন ব্যবস্থায় হকের জন্য কোন জায়গা একেবারেই অবশিষ্ট নেই। শিক্ষা ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সব বিভাগ হক থেকে দূরে সরে পড়েছে এবং বাতিলের সাহায্য সহযোগিতায় নিয়োজিত রয়েছে। এমনকি এর অধীনে যদি ইসলামের নামে

কোন ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কাজ আঞ্জাম দেয়া হয়ে থাকেও–তাহলে বর্তমান সময়ের প্রতিকূল পরিবেশের কারণে তাতে বাতিলেরই সাহায্য হচ্ছে। নেককার–লোক যারা মূলতই সত্য এবং ন্যায়ের পথে চলতে চায়–আজ বিনা বাধায় কয়েক কদমও হকের রাস্তায় অগ্রসর হতে পারছেনা। যদি দূরের ব্যক্তি কিছু সময়ের জন্যও তাকে অবকাশ দেয়, কিন্তু কাছের ব্যক্তি তাকে ঝঞ্জাটে ফেলে দেয় এবং কোন ক্রমেই বরদাশত করতে চায়না যে, সে তার নিজের বেছে নেয়া পথে দ'কদম অগ্রসর হোক। হযরত মসীহ আলাইহিস সালাম বলেনঃ

"পাপের রাস্তা প্রশস্ত এবং এ পথের যাত্রীর সংখ্যা অনেক। কিন্তু পূণ্যের রাস্তা সংকীর্ণ এবং এ পথের যাত্রী খুবই কম।"

এই সত্যকে আজ চোখে দেখা যাচ্ছে। বাতিলের মঞ্জিলে পৌছার জন্য প্রশস্ত ও প্রতিবন্ধকহীন পথ পড়ে আছে। তার দু'পাশে রয়েছে ছায়াঘণ বৃক্ষরাজি। আরো রয়েছে দ্রুতগামী বাহন, নিরাপত্তার জন্য রয়েছে পথপ্রদর্শক। প্রতিটি মঞ্জিলে রয়েছে বিলাসিতার প্রাচুর্য। এখন যে সময় ইচ্ছা নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেতে পারে।

অপরদিকে হকের রাস্তায় প্রথম পদক্ষেপেই বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যদি সাহসিকতার সাথে এই বাধা দূর করা যায়, তাহলে সামনের প্রতিটি পদক্ষেপেই রয়েছে বিপদের আশংকা। এমনকি যাত্রার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি পদে বিপদ ছাড়া আর কিছুর সাথে সাক্ষাত হবেনা। আজ কোন ব্যক্তি নিজের মাথা সাথে নিয়ে এ পথে পা রাখার খুব কমই দুঃসাহস দেখতে পারে। এই নাজুক এবং বিভ্রান্তির যুগে লোকেরা হেদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহীর পথে চলে গেলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যদি আশ্চর্যের ব্যাপার কিছু থেকে থাকে তাহলে গোমরাহীর অসংখ্য উপকরণ সহজলভ্য হওয়ার পরও এবং বিশ্বব্যাপি শয়তানের একচ্ছত্র প্রভাব সত্বেও আল্লাহর কিছু সংখ্যক বান্দার আল্লাহর নাম স্মরণ থাকাটাই হচ্ছে অধিক আশ্চর্যের বিষয়। এরা তিরস্কারের পরিবর্তে প্রশংসা পাবার অধিকারী এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে দূরে নিক্ষেপ করার পরিবর্তে বুকের সাথে লাগিয়ে নেয়ার উপযুক্ত।

যেসব লোক এতটা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও নিজেদের ঈমানের আলোকবর্তীকা জীবন্ত রেখেছে–তারা যদি অনুকূল পরিবেশ পেত তাহলে অতীব উত্তম মুসলমান হয়ে যেত। এ কারণে তাদের ভুল–ভ্রান্তি এবং অজান্তে বা একান্ত বাধ্য হয়ে গোমারাহীতে লিপ্ত হওয়ার ভিত্তিতে ঈমান থেকে বঞ্চিত ঘোষণা করে তাদেরকে ঘৃণা করার পরিবর্তে তাদের মধ্যে ঈমান ও ইসলামের সঠিক দাবী সম্পর্কে চেতনা ও অনুভূতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা উচিত।

৬

দীন প্রচারের ক্রমিক ধারা

আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম লোকদেরকে আহবান করার ব্যাপারে একটা বিশেষ ক্রমধারা অনুসরণ করতেন। এই ক্রমধারা প্রচারকার্যের একটি বিরাট কৌশলের ওপর ভিত্তিশীল। এই ক্রমধারাকে ওলোটপালট করে দিলে সেই কৌশল ও হিকমতের অবলুপ্তি ঘটে। একথা আমরা পূর্বেও বলে এসেছি। অনুরূপভাবে নবী-রসূলগণ যে কথাগুলো লোকদের সামনে পেশ করতেন, তা উপস্থাপন করার ক্ষেত্রেও তার একটা বিশেষ ক্রমধারার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। দীন প্রচারের ক্ষেত্রে এই ক্রমিকতার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এই ধারাবাহিকতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করলে গোটা শ্রমই পন্ড হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে, বরং তাতে দীন প্রচারের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এ কারণে লোকদের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করার ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা একান্ত জরুরী আমরা সে সম্পর্কে এখানেআলোচনাকরব।

নবীদের দাওয়াতের সূচনা

নবীদের আগমন সব সময় এমন যুগে হয়ে থাকে যখন সত্য দীনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ এলোমেলো হয়ে যায় এবং একটি জাহেলী ব্যবস্থা গোটা সমাজকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেয়। এ কারণে যেসব মৌলিক বিষয়ের ভিত্তিতে একটি নির্ভেজাল ইসলামী সমাজ গঠিত হয় নবীগণ প্রথমে সেসব বিষয়ের দাওয়াত বুলন্দ করেন। এই মৌলিক বিষয় হচ্ছে তিনটিঃ

১। আল্লাহর ওপর ঈমান–পূর্ণ একত্ববাদ সহকারে।

২। রিসালতের প্রতি ঈমান – পূর্ণ আনুগত্য সহকারে।

৩। আখেরাতের ওপর ঈমান–পূর্ণ জিম্মাদারী সহকারে।

এই তিনটি জিনিস –যার মধ্যে বিকৃতি সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে সমাজ জাহেলিয়াতের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। যখন এর মধ্যে বিকৃতি ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তখন গোটা সমাজের ওপর জাহেলিয়াতের অন্ধকার ছেয়ে যায়। আবার এই তিনটি জিনিস উদ্ভাসিত হওয়ার সাথে সাথে সমাজ ইসলামের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে এবং যখন তা পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত হয়ে সামনে এসে যায় তখন

সমাজ দিনের পূর্ণ আলোকের মধ্যে এসে যায়। এই তিনটি জিনিসের বিশ্বাস মানব প্রকৃতির মধ্যে এতটা গভীরভাবে প্রোথিত যে, দুনিয়াতে তা খুব কমই অস্বীকার করা হযেছে। কিন্তু শয়তানের যেহেতু ভালভাবে জানা আছে যে, এই তিনটি জিনিসের ওপর সত্য জীবন বিধানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত–এজন্য চিরকাল তার প্রচেষ্টা রয়েছে, যেভাবেই হোক এর মধ্যে অবশ্যই কোনো না কোনো ছিদ্র সৃষ্টি করতে হবে। সুতরাং বাস্তব ঘটনা হচ্ছে এই যে, এই তিনটি জিনিসকে যেভাবে খুব কমই অস্বীকার করা হয়েছে, ঠিক সেভাবে শয়তানের অপচেষ্টার প্রভাবে এগুলোকে নির্ভুলভাবে খুব কমই স্বীকার করা হয়েছে। আকীদা–বিশ্বাসে এই অধ্যায়ে দুনিয়া কখনো তা প্রত্যাখ্যান করেনি এবং কখনো তা সঠিক ভাবে স্বীকারও করেনি। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বীকৃতির সাথে অস্বীকৃতিও রয়েছে। লোকদেরকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্যই আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে নবী–রসূল পাঠিয়েছেন।

দাওয়াতের পথের একটি সমস্যা

হক–বাতিলের এই সংমিশ্রণ দাওয়াত ও সংশোধনের কাজকে কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ বানিয়ে দেয়। যদি কেবল বাতিলের সাথে মোকাবিলা করতে হয় তাহলে এটাকে সহজেই পরাভূত করা যায়। কিন্তু যেখানে হক এবং বাতিল সংমিশ্রিত হয়ে আছে এবং বাতিলের সাহায্যের জন্য হককে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করা হয় সেখানে হকের সাহায্যের জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার পূর্বে হকের আহবানকারীদের একটি বিরাট যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এই জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোকদের সামনে একথা প্রমান করা যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় যদি আংশিক ভাবে কিছুটা হক থেকেও থাকে তাহলে তা হকের স্বার্থে নয়–বরং বাতিলের খেদমতের জন্য। নবী–রসূলগণ এবং যেসব লোক দুনিয়াকে সত্য দীনের দিকে দাওয়াত দেন–তাদেরকে সাধারনত এই ধরনের বিকৃত আকীদার লোকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়–যারা আল্লাহর দীন এবং নিজেদের নফসের খাহেশের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন করে একটি ভিন্নতর নতুন ব্যবস্থা দাঁড় করিয়ে নেয় এবং তাকে পুরানো ব্যবস্থার নামে চালিয়ে দেয়। এই ধরনের লোকেরা নিজেদের বাতিলের হেফাজতের জন্য যেহেতু আল্লাহর দীনকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, এজন্য তাদের ওপর পূর্ণ স্বাধিনতা সহকারে সরাসরি আক্রমন করা সম্ভব হয়না। বরং ধীরে ধীরে তাদের বিশ্বাস ও কার্যকলাপ থেকে হকের অংশকে পৃথক এবং বাতিলের অংশকে পৃথক করতে হয়। আর যেহেতু তাদের প্রতিটি বাতিল হক হিসেবে পূজিত হতে থাকে, এজন্য তাকে পৃথক করাটা এতদূর কঠিন হয়ে পড়ে যে, তারা এর প্রত্যেকটির ওপর

এক একটি ব্যূহ কায়েম করে নেয়। যতক্ষণ তারা এর প্রতিরক্ষায় নিরাশ হয়ে না পড়ে ততক্ষণ তাকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়না।

এ কাজ অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। একাজে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি, চরম ধৈর্য এবং গভীর প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয় এবং সাথে সাথে এপথে দীনের একনিষ্ঠ অনুসরণও প্রয়োজন। কারণ যে লোকদের সম্পর্কে কোন ব্যক্তির এই ধারণা হয় যে, তাদের অস্বীকৃতির সাথে স্বীকৃতিও সংশ্লিষ্ট রয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই তারা বাতিলের সাথে নম্র ব্যবহার করে। এই নম্রতা থেকে হকের পরিবর্তে বাতিলই সুবিধা লাভ করে থাকে।

শিক্ষা—প্রশিক্ষণের ব্যাপারে দুটি জিনিস বিবেচ্য

এই দ্বন্দ্ব–সংঘাতের ফলশ্রুতিতে যেসব লোক নির্ভেজাল হকের সাথে সংযুক্ত হতে এবং বাতিলের সাথে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সত্যনিষ্ঠ মন নিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয, তারা একটি জামাআতে পরিনত হয়ে যায়। এই লোকদেরকে নবী–রসূলগণ প্রথমে এমন জিনিস শিক্ষা দেন–যার মাধ্যমে একদিকে সর্বোত্তম পন্থায় আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, অপরদিকে তারা নিজেরা সীসা ঢালা প্রাচীরের মত একতাবদ্ধ হয়ে যায়। আল্লাহর সাথে বান্দাকে সঠিকভাবে জুড়ে দেয়ার নীতিমালাগুলো ওপরে উল্লেখিত তিনটি নীতিমালা থেকে নির্গত। যেসব লোক উল্লেখিত তিনটি মৌলনীতিকে মেনে নিয়েছে তাদের জন্য এই নীতিগুলো মেনে নিতে কোনরূপ কষ্ট হয়না। একটি মূলনীতিকে মেনে নেয়ার পর কোন দীনদার ব্যক্তি তার অবশ্যম্ভাবী ফলকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে পারেনা। কেননা একটি জিনিসের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান সমূহকে প্রকৃত পক্ষে মূল বিষয়টি সংক্ষেপে বর্ণনা করার পর তার ব্যাপক বর্ণনা বলা যায়। লোকেরা যেহেতু মূল বিষয়কে মেনে নিয়েছে, অতএব তারা এর অত্যাবশ্যকীয় উপাদানসমূহ সহজেই গ্রহণ করবে–এরূপ ধারণার ওপর ভিত্তি করে নবীগণ কিন্তু তাদের সামনে এই উপাদানগুলো এলোপাতাড়ি ছুড়ে মারেননি। বরং এ ক্ষেত্রে তাঁরা একটা যুক্তিসংগত ক্রমিকধারা অবলম্বন করেছেন। এই ধারাবাহিক কর্মতৎপরতার মধ্যেই তাদের মিশনের সাফল্য নিহিত রয়েছে। ক্রমিক ধারার এই স্তর বিন্যাসের ক্ষেত্রে দুটি জিনিসের দিকে নজর রাখা হয়। (এক) জামাআতের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা (দুই) জামাআতের সমষ্টিগত শক্তি। এই দুটি জিনিস কিছুটা ব্যাখা সাপেক্ষ।

মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা

মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা বলতে আমরা বুঝাতে চাই যে দীনের নির্দেশাবলী এবং শিক্ষার মধ্যে একটি শৃংখল বা যোগসূত্র রয়েছে। [illegible]

বুনিয়াদী মূলনীতি রয়েছে, তা থেকে কতিপয় প্রাথমিক নীতি বেরিয়ে আসে, আবার এর ভিত্তিতে মৌলিক শিক্ষা গড়ে ওঠে, অতপর তা থেকে আনুসাংগিক শাখা-প্রশাখা অস্তিত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি এই ধারাবাহিকতা সহকারে দীন শিক্ষা করে সে একদিকে প্রতিটি স্তরে পরবর্তী স্তরের জন্য নিজের মধ্যে যোগ্যতা সৃষ্টি করে, অপরদিকে সে গোটা ব্যবস্থাকে হৃদয়ংগম করতে সক্ষম হয় যা এর মধ্যে বর্তমান রয়েছে। এর উদাহরণ সম্পূর্ণ এইরূপ যে, একটি শিশুকে প্রথমে স্বরবর্ণ-ব্যঞ্জনবর্ণ শেখানো হয়, অতপর তা দিয়ে শব্দ গঠন শেখানো হয়, অতপর তাকে শব্দ ও বাক্য পড়া শেখানো হয়, অতপর তার সামনে একটা পূর্ণ বক্তব্য রাখা হয়। সে যেহেতু অক্ষর থেকে শুরু করে বাক্য পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে একটি শৃংখলকে অনুসরণ করে আসছে, এজন্য প্রতিটি স্তরে সে সম্মুখবর্তী স্তরের জন্য যে যোগ্যতার প্রয়োজন তা আপনা আপনি হৃদয়ংগম করতে পেরেছে এবং কোন জিনিস তার স্বভাবের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়নি। প্রতিটি যোগ্যতাই যেহেতু কাজ চায়, এজন্য সে এক স্তর থেকে অপর স্তরে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য নিজের স্বভাবের মধ্যে আপনা আপনিই একটি তাগিদ অনুভব করে।

অপর দিকে এক ব্যক্তি দীনকে এভাবে পায়নি, বরং এর বিচ্ছিন্ন অংশ তার সামনে সমস্যাহীনভাবে এবং ধারাবাহিকতাহীন ভাবে রেখে দেয়া হয়েছে। তাকে এমন একটি শিশুর সাথে তুলানা করা যায়, যার সামনে প্রাথমিক স্তর সমূহ অতিক্রম না করিয়ে একটি বাক্য রচনা করে রেখে দেয়া হয়েছে। এ বাক্য হয়ত সে আওড়াতে পারবে এবং স্মরণশক্তির সাহায্যে তা মুখস্তও করতে পারবে। কিন্তু এটা সব সময়ের জন্য তার স্মৃতিশক্তির ওপর একটা বোঝা হয়ে থাকবে এবং তা কখনো তার প্রকৃতিগত যোগ্যতার অংশে পরিণত হতে পারেনা।

আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম দীনকে পেশ করার ক্ষেত্রে এই পন্থা কখনো অবলম্বন করেননি। তাঁরা বরং প্রকৃতিগত এবং যুক্তি সংগত ধারা অবলম্বন করতেন। ফলে যে ব্যক্তি দীনকে কবুল করত সে নিজের স্বভাবের তাগিদেই তা কবুল করত। গোটা দীন তার চিন্তা-চেতনা এবং হৃদয় ও প্রাণের মধ্যে গভীর ভাবে বসে যেত। এই প্রক্রিয়াই ব্যক্তির মধ্যে অবিচল ঈমান সৃষ্টি হয়, যা করাত দিয়ে চিড়ে দ্বিখন্ডিত করে ফেলার পরও অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়না। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই তাকওয়ার সেই স্বাদ লালিত হতে থাকে যা জীবনের বহুমুখী কার্যকলাপের দূরতম কোণেও দীনের ভাবধারা বিরোধী কোন জিনিস বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়।

যেসব লোক দীনের এই ব্যবস্থাকে এবং নবীদের দাওয়াতের পদ্ধতির সৌন্দর্যকে হৃদয়াংগম করতে চায়না, তারা জনগণকে আল্লাহর পরিচয় জ্ঞান দান করার পূর্বে কেবল ফরজ নামাযেরই নয় , বরং তাহাজ্জুদ, ইশরাক ইত্যাদি নামাযেরও নিয়মানুবর্তী বানাতে চায়। তারা নবীর প্রয়োজনীয়তা এবং তাঁর আনুগত্যের আকীদা সৃষ্টি করার পূর্বে লোকদের দাড়ি, গোঁফ এবং জামা পাজামার দৈর্ঘ-প্রস্থ পরিমাপ করে বেড়ায়। তারা আখেরাতের ওপর দৃঢ় ঈমান পয়দা করার পূর্বে লোকদের মধ্যে তাকওয়া, খোদাভীতি, নিষ্ঠা, সৌজন্যবোধ,বিনয় ও নম্রতার সৌন্দর্য দেখতে চায়। তাদের উল্টা প্রচষ্টায় দাড়ি একহাত লম্বা হয়ে যায়, পাজামা তার নিম্নতম সীমায় এসে যায়, চলা ফেরা, উঠা-বসা, কথাবার্তা প্রতিটি জিনিসের মধ্যে একটা কৃত্রিম দরিদ্রতা হয়ত ফুটে ওঠে, পানাহার, লেহ্য-পেয় প্রতিটি ক্ষেত্রে বাহ্যত সুন্নতের অনুসরণকারী হয়ত হয়ে যায়। কিন্তু এসব জিনিস যেহেতু অযৌক্তিক এবং অপ্রাকৃতিক পন্থায় সৃষ্টি করা হয়, এ কারণে এই প্রদর্শনীমূলক তাকওয়ার বৈশিষ্ট এর চেয়ে বেশী কিছু নয় যে, "মাছি বেছে বেছে ফেলে দেয়া হয়, কিন্তু উট গলাধকরন করা হয়।"

এই ধরণের তাকওয়ার অধিকারীগণ এটা দেখেনা যে, তাদের কণ্ঠনালীতে খাদ্যের যে গ্রাস যাচ্ছে তা পাক-পবিত্র না তাগুতের খেদমত করে অর্জণ করা হয়েছে। কিন্তু খাদ্যের এই হারাম গ্রাস গলাধকরণ করার পর পানি বা হাতের পরিবর্তনে ডান হাতে পান করার প্রতি অপরিসীম গুরুত্ব আরোপ করে। এই লোকদের ধর্মীয় দৃষ্টিভংগী হচ্ছে এই যে, কোন ব্যক্তির নিয়াত যদি ঠিক থাকে তাহলে সে কোন বাতিল ব্যবস্থার অধীনে দারোগা, জেলা প্রশাসক, সংসদ সদস্য ইত্যাদি পদের কাজ পরিচালানা করেও আল্লাহকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে এবং ইসলামের ঝান্ডা উন্নত করতে পারে। এই মোত্তাকীদের মধ্যে এমন লোকও পাওয়া যাবে যে নিজের সৌভাগ্যের জন্য গর্বিত যে, তার কণ্যার জন্য এমন দীনদার বর পাওয়া গেছে যার পাজামা কখনো পায়ের গোছার নিচে পড়েনা এবং অমুক হযরতজীর মুরীদ। কিন্তু তার দৃষ্টি কখনো এদিকে যায়না যে, তার জামাতা জীবিকা অর্জনের জন্য যে উপায় অবলম্বন করেছে, তা ঈমানের অনুভূতি সম্পন্ন কোন মুসলামান কল্পনাও করতে পারেনা।

এই দেউলিয়াত্বের মূল কারণ হচ্ছে এই যে, একটা দীর্ঘ সময় ধরে মুসলমানদের মধ্যে গোটা দীনকে তার সুশৃংখল পদ্ধতিসহ পেশ করার এবং প্রতিটি

স্তরে লোকদের সামনে দীনের যতটুকু অংশ উপস্থাপন করা প্রয়োজন তার অবশ্যম্ভাবী দাবীসহ তা তাদের সামনে পরিষ্কার করে তুলে ধরার মত কোন দাওয়াত উত্থিত হয়নি। বরং যারাই দাওয়াতের কোন কাজ শুরু করেছে মূল প্রয়োজনের অনুভূতির অভাবে এবং দীনের ব্যবস্থার সাথে পরিচিত না হওয়ার কারণে যেখান থেকে ইচ্ছা শুরু করেছে এবং যেখানে ইচ্ছা শেষ করেছে। এর ফল হয়েছে এই যে, যেসব মুসলমানের মধ্যে কিছুটা দীনী চেতনা থাকলেও তা এতটা বিপরীত এবং নিস্প্রাণ যে, তাকে কোন সঠিক দাওয়াতের জন্য ভিত্তি বানানো তো দূরের কথা, তাকে কায়েম রেখে সম্ভবত কোন সঠিক দাওয়াত শুরু করাও যেতে পারেনা।

সাংগঠনিক যোগ্যতা

আম্বিয়ায়ে কেরাম দীনকে পেশ করার ক্ষেত্রে যে সামষ্টিক শক্তির প্রতি খেয়াল রাখতেন তাও একবার চিন্তা করে দেখা যাক। দীনের নির্দেশ সমূহ সম্পর্কে চিন্তা করলে জানা যায় যে, তা দুই ধরণের (এক) ব্যক্তিগত নির্দেশ, (দুই) সমষ্টিগত নির্দেশ। ব্যক্তিগত নির্দেশ ব্যক্তিদের জন্য এবং তা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়েই পালনীয় হওয়া প্রয়োজন। যেমন নামায, রোযা, আল্লাহর রাস্তায় খরচ করা ইত্যাদি। সামষ্টিক পর্যায়ের নির্দেশের সম্পর্ক রয়েছে জামাআতের সাথে। জামাআত অস্তিত্বে এসে গেলে এই নির্দেশ পালন করা তার জন্য ফরজ হয়ে যায়। যেমন, সমাজ, রাজনীতি এবং জিহাদের সাথে সংশ্লিষ্ট আইন।

ব্যক্তিগত পর্যায়ের নির্দেশের দাওয়াত এবং তা শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তির ধারণ ক্ষমতা ও হজম শক্তির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তার ওপর আদেশ নিষেধের বৃষ্টি বর্ষণ করা ঠিক হবেনা। তাহলে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে সবকিছু ছেড়ে দেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয় ধরনের নির্দেশের ক্ষেত্রে জামাআতের যোগ্যতা ও ধারণ ক্ষমতা অনুমান করতে হবে। যে নির্দেশের বোঝা তার ওপর চাপানো হচ্ছে তা বহন করার ক্ষমতা তার আছে কি না? এই সাংগঠনিক অনুমান করাও নেহায়েত কষ্টকর। আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এব্যাপারে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে পথনির্দেশ পেতেন। কেননা সমষ্টির ধারণ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের ওপর আদেশ নিষেধ নাযিল হত। অবশ্য যারা নবীদের পন্থায় কোন জামাআতকে পরিচালিত করতে চায় তাদেরকে এব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে ইজতেহাদের মাধ্যমে কাজ করতে হবে। তারা যতক্ষণ দীনের নির্দেশাবলী নাযিলের পর্যায়সমূহ নিজেদের সময়কার বিশেষ অবস্থা এবং একজন নবীর জামায়াত ও অ-নবীর জামাআতের মধ্যেকার পার্থক্য পূর্ণরূপে

অনুমান করতে না পারবে তডক্ষন তাদের পদক্ষেপ কথনো সঠিক রাস্তায় পড়তে পারেনা। আর সব সময় এই আশংকা থাকে যে, তারা যে, সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছে, তার নৌকা তীরভাগে পৌছার পূর্বেই কোন শিলাখন্ডের সাথে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে।

যেসব লোক এ বিষয়ে অবহিত নয়, তারা সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ নিজেদের সামনে উপস্থিত দেখে মনে করে যে, এর সম্পূর্ণটা এক দিনেই নাযিল করা হয়েছিল এবং তার সব আদেশ নিষেধ একই সময়ে কার্যকর হওয়ারই কথা। অতএব তারা একদিকে তৌহীদের দাওয়াত দিতে থাকবে, অপরদিকে ইসলামের বিচার ব্যবাস্থাও প্রবর্তন করবে। এক দিকে কুফর ও তাগুতের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করবে, অপরদিকে তাগুতের কাছে চরম পত্রও প্রেরণ করবে। এসব ব্যাপার থেকে পরিষ্কার জানা যায়, কোন এলাকার জাহেলী ব্যবস্থাকে ইসলামী ব্যবাস্থার মাধ্যমে পরিবর্তন করে দেয়ার জন্য যে আন্দোলন উত্থিত হয় তাতে সংগঠনের সামগ্রিক শক্তি ও ক্ষমতার কি পরিমান সঠিক অনুমান করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এবং তাতে সামান্য ভুল হয়ে গেলে কি পরিমান ক্ষতির আশংকা আছে-তা মুসলমানদের মোটেই জানা নেই।

এখানে একথা বিস্তারিত ভাবে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই যে, কুরআন মজীদে সমাজ এবং রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলী তখনই নাযিল হয়েছে-যখন ইসলামী রাষ্ট্র কার্যত কায়েম হয়ে গিয়েছিল। আর এসব নির্দেশ নাযিল হওয়ার ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে। জামাআতের শক্তি ও যোগ্যতার সাথে এই পর্যায়ক্রমিকতার পূর্ণ ভারসাম্য রয়েছে। মুসলমানদের সংখ্যাশক্তি যখন একটি স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পর্যায়ে পৌছে যায় এবং এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য একটি স্বাধীন সার্বোভৌম ভূ-খন্ড হাতে এসে যায়-তখনই তাদেরকে কুফরী ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক ছিন্নকরার সর্বশেষ নির্দেশ দেয়া হয়।এর ওপর অনুমান করে বলা যায়, বর্তমানেও মুসলমানরা যখন একটি স্বতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থ্য, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালানা করার যোগ্য হবে, তখন তাদেরকে কুফরী ব্যাবস্থার সাথে যে কোন ধরণের সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ দেয়া যেতে পারে। তখন মদীনায় নাযিলকৃত এবং সমষ্টিগত জীবনের সাথে সম্পর্কিত নির্দেশ সমূহও কার্যকর হতে পারে। এরপর মুসলমানরা যখন অদম্য শক্তি হিসাবে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর আইন জারী ও তা কর্যকর করার পর্যায়ে পৌছে যাবে , তখন তাদের সামনে আর্ন্তজাতিক রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ইসলামী বিধান সমূহ এসে উপস্থিত হবে। একজন ছাত্রের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার মতই একটি সংগঠনের বস্তুগত শক্তি ও যোগ্যতা ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যেসব লোক এ সংগঠনের নেতৃত্বে থাকেন

তাদেরকে অত্যন্ত জাগ্রত মস্তিষ্ক নিয়ে সংগঠনের এই শক্তি ও যোগ্যতার পরিমাপ করতে হবে। সঠিক পরিমাপ ছাড়াই যদি সংগঠনের ওপর কোনো বোঝা চেলে দেয়া হয় তাহলে এর ফল দাঁড়াবে এই যে, তারা দীর্ঘ সময় ধরে সংগঠনের যে শক্তি সৃষ্টি করেছিল তা একেবারেই শেষ হয়ে যাবে। এ সত্যের দিকেই হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইংগিত করেছেন।

انما نزل اول مانزل منه سورة من المفصل فيماذكرالجنة والنار حتى اذا تاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل اول شي لا تشربوا الخمر لقالوا لاندع الخمر ابدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا ابدا (بخاري باب تاليف القرآن)

"কুরআনে সর্বপ্রথম যা নাযিল করা হয়েছিল তা হচ্ছে একটি মুফাসসাল সূরা তাতে বেহেশত এবং দোযখের উল্লেখ আছে। অতপর লোকেরা যখন ইসলামের গন্ডির মধ্যে এসে গেল, তখন হালাল হারামের বিধান নাযিল হয়। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়েই যদি নির্দেশ আসত–শরাব পান করনা। তাহলে লোকেরা বলত, আমরা কখনো শরাব পান ত্যাগ করবনা। যদি নাযিল হত, তোমরা যেনা করনা–তাহলে লোকেরা অবশ্যই বলত, আমরা কখনো যেনা পরিত্যাগ করবনা"–(বুখারী ফাযায়েলে কুরআন, অনুচ্ছেদ–কুরআন সংকলন ও বিন্যাস্তকরণ)।

৭

দাওয়াতের পদ্ধতি

কোন কোন ধর্মীয় মহলে আল্লাহ জানেন কোথা তেকে এই ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে, তাবলীগের আদর্শিক এবং নবীদের অনুসৃত পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, হাতে একটি লাঠি এবং ঝোলায় কিছু চানাবুট নিয়ে দীন প্রচারের জন্য বের হয়ে পড়তে হবে। পায়ে জুতাও থাকবেনা, মাথায় টুপিও থাকবেনা। গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে এবং কোথাও কোন লোক পাওয়া গেলে তার কছে তাবলীগ শুরু করে দেবে-চাই সে শুনুক বা না শুনুক। কোন শহরের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় যদি কোন স্থানে বা চৌরাস্তার মোড়ে দু-চার ব্যক্তিকে জমায়েত পাওয়া যায় তাহলে তাদের সামনে ওয়াজ নসীহত শুরু করে দিতে হবে। রেলের কামরায়, স্টেশনে, বাজারে, রাস্তার ওপর যেখানেই ভীড় দেখা যাবে সেখানেই তারা ওয়াজ শুরু করে দেবে। যে কোন সভায় ঢুকে পড়বে, প্রতিটি সম্মেলনে নিজের স্থান করে নেবে, যে কোন মঞ্চে উঠে ধমকানো শুরু করে দেবে। শ্রোতাগণ ক্লান্ত হয়ে পড়বে কিন্তু তারা ক্লান্ত হবেনা। তাদের পশ্চাদ্ধাবনে লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে, কিন্তু তারা খোদার বাহিনী হয়ে তাদের প্রত্যেকের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে বসবে। লোকেরা তাদের সওয়াল জওয়াবের ভয়ে আত্মগোপন করে ফিরবে, বরং কখনো কখনো বিরক্ত হয়ে বেয়াদবী ও খারাপ ব্যবহার করে বসবে,কিন্তু তারা জোশ ও ব্যস্ততার সাথে নিজেদের কাজ জারী রাখবে। যেখানে ওয়াজ করার আড্ডা হবে সেখানে ওয়াজ করে দেবে। যেখানে মীলাদ পড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করা হবে সেখানে মীলাদ পড়িয়ে দেবে। যেখানে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে বিতর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন দেখা দেবে সেখানে বিতর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

এই হচ্ছে তাবলীগের আসল পন্থা, এই হচ্ছে একজন সত্যনিষ্ঠ মুবাল্লিগের দৃষ্টিভংগী-যা আমাদের অনেক দীনদার লোকের মন মস্তিষ্কে বিদ্যমান রয়েছে। তাবলীগ এবং তালীমের বর্তমান উন্নত ও বৈজ্ঞানিক পন্থার কিছুটা উপকারিতার কথা তারা অস্বীকার করেনা বটে; কিন্তু তাদের মতে কল্যাণ ও বরকতপূর্ণ পন্থা হচ্ছে তাই-যা তাদের খোশখেয়াল অনুযায়ী নবী-রসূলগণ অবলম্বন করেছিলেন।

আমাদের মতে এই পন্থাকে নবীদের পন্থা মনে করার কিছুটা কারণ নবীদের পন্থা সম্পর্কে তাদের অনভিজ্ঞাতার ফল, আর কিছুটা তাদের খাহেশ যে, তাদের গৃহীত পন্থা (যে পন্থা ছাড়া অন্য কোন পন্থা অবলম্বন করার যোগ্যতা থেকে তারা বঞ্চিত) একটি মর্যাদাপূর্ণ এবং পবিত্র পান্থা বলে প্রমানিত হয়ে যাওয়া। নবীদের তাবলীগের পন্থা সম্পর্কে আমরা যতদূর অধ্যয়ণ করেছি তাতে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, নবী–রসূলগণ তাবলীগের যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তা তাঁদের যুগের বিচারে অত্যন্ত উন্নত এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি ছিল। আর এই পদ্ধতি পরিস্থিতির পরিবর্তন এবং সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে পরিবর্তনও হতে থাকে। তা একথাই প্রমাণ করে যে, এব্যপারে কোন একটি পদ্ধতির ওপর অবিচল থাকা ঠিক নয়। বরং হকের আহবানকারীদের কর্তব্য হচ্ছে, তারা প্রত্যেক যুগে প্রচার ও প্রশিক্ষণের জন্য সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করবে যা তাদের সময় আবিষ্কৃত হয়েছে এবং যা অবলম্বন করে তারা নিজেদের শ্রমসাধনা এবং যোগ্যতাকে অধিক ফলপ্রসূ বানাতে পারে

জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে দাওয়াতের পদ্ধতিরও উন্নতি হয়েছে

এ ক্ষেত্রে সর্বাধিক বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম দাওয়াতের কোন একটি পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেননি। বরং যে গতিতে দুনিয়ায় জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি হতে থাকে, তদানুযায়ী তাঁদের প্রচার ও প্রশিক্ষণের পদ্ধতিতেও পরিবর্তন সাধিত হতে থাকে। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে যখন লেখা–পড়ার কলাকৌশল অস্তিত্ব লাভ করেনি, তখন নবীদের প্রচার ও প্রশিক্ষণও মৌখিক ভাবে চলতে থাকে। নেকী ও সত্যবাদিতার কতিপয় মূলনীতি তাঁরা লোকদের মুখে মুখে শিক্ষা দিতেন এবং তারা তা মুখস্ত করে নিত। এগুলো বংশ পরমপরায় বর্ণনার আকারে তার অনুসারীদের কাছে পৌঁছে যেত। অবশেষে যখন তা কালের প্রবাহে বিলীন হয়ে যেত অথবা এর সাথে অন্য কিছুর সংমিশ্রণ ঘটত, তখন আল্লাহ তাআলা কোন নবী পাঠাতেন। তিনি এসে এই শিক্ষাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে জীবন্ত করে তুলতেন। যতদিন লেখা–পড়ার কলা–কৌশল উদ্ভাবিত হয়নি, তাবলীগের ব্যাপারে কেবল ব্যক্তিগত সহযোগ, মৌখিক প্রকাশ, বর্ণনা এবং শ্রোতার স্মরণ শক্তির ওপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু লোকেরা যখন লেখার কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হল এবং অন্যদের কাছে কোন জিনিস পৌঁছাতে এবং তাদের মধ্যে সংরক্ষণ করার একটি উন্নততর পান্থা আবিষ্কৃত হল–তখন নবীগণও এই পন্থা অবলম্বন করলেন। সুতরাং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মৌখিক ভাবে শিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে তাওরাতের

নির্দেশসমূহ তার জাতির লোকদের তক্তার ওপর লিখে দিতেন। অনুরূপভাবে আরবদেরকে কলমের সাহায্যে লিখিত আকারে দীনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর এই ইহসানের কথা উল্লেখপূর্বক বলেছেন যে, তাদেরকে মৌখিকভাবে শিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে লেখনির মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এটা শিক্ষা ব্যবস্থার একটি উন্নত এবং সুরক্ষিত উপায়। পবিত্র কুরআনের বাণীঃ

اِقْرَءْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ

"তুমি পড়। তোমার রব অত্যন্ত দয়ালু, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে এমন জিনিস শিক্ষা দিয়েছেন যে সম্পর্কে তারা অনবহিত ছিল।" (সূরা আলাকঃ ৩–৫)

এ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি মানুষকে কলম ব্যবহারের কায়দা শিখিয়েছেন এবং এই উন্নত পদ্ধতিকে দীনের প্রচার ও প্রশিক্ষণের উপায়ে পরিনত করেছেন। এর ফলে তারা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় নিআমত কুরআনের অধিকারী হয়েছে। মৌখিক শিক্ষা পদ্ধতির তুলনায় কলম এবং পুস্তক ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির যে শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং তার মধ্যে চূড়ান্ত প্রমান সম্পন্ন করা এবং পূর্নাংগ তাবলীগের যে দিকটি রয়েছে– কুরআনও বিভিন্ন স্থানে সেদিকে ইংগিত করেছে। এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার স্থান এটা নয়। এখানে আমরা যে বিষয়টি সামনে নিয়ে আসতে চাই তা হচ্ছে এই যে, নবীদের প্রবর্তিত তাবলীগের পদ্ধতি কোন নিশ্চল, নিষ্প্রাণ এবং গতিহীন পদ্ধতি নয়। বরং মানব জাতির মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নতির সাথে সাথে এর মধ্যেও পরিবর্তন ও উন্নতি হতে থাকে। বিজ্ঞান এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানুষের কাজের উপায় উপকরণ এবং জানার মাধ্যমেও পরিবৃদ্ধি ঘটেছে। হকের আহ্বানকারীগণই এ থেকে সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক লাভবান হওয়ার অধিকারী। নবীদের কর্মনীতি সেদিকেই ইংগিত করছে। যেমন ,আজকের যুগে রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা, মুদ্রণযন্ত্র ইত্যাদি মানুষের প্রচার প্রোপাগান্ডা ও প্রশিক্ষণের শক্তিকে কোন্ পর্যায় থেকে কোন্ পর্যয়ে পৌছে দিয়েছে। ছোট–বড় যে কোন ধরনের বক্তব্য কয়েক মিনিটের মধ্যে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে নিয়ে অপর প্রান্তে পৌছে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। যে কোন বৃহত্তর আন্দোলন সম্পর্কে গোটা বিশ্বের সচেতন লোকদের কয়েক দিনের মধ্যেই অবহিত করা যায়। কঠিন থেকে কঠিনতর বক্তব্য অতি সহজে

সাধারণ-বিশেষ নির্বিশেষে সবাইকে বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হচ্ছে। এই যুগে বাতিল পন্থীরা এসব উপায়-উপকরণকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের যে কোন বাতিলকে ইচ্ছামত বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিজ্ঞানের বর্তমান আবিষ্কার সমূহ দূরত্বের পরিধি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে। দুই জাতির মাঝখানের অলংঘনীয় পাহাড় এবং সমুদ্রের ব্যবধান আজ কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধক নয়। গতকাল পর্যন্ত একজন শিক্ষক তার সামনে উপস্থিত ছাত্রদের নিজের কথা যেভাবে শুনাত,আজ ইচ্ছা করলে নিজের কথা গোটা দুনিয়ার মানুষকে একই সময় শুনানো যেতে পারে। গতকাল পর্যন্ত যে জিনিস মাসের পর মাস শিক্ষা দিয়েও হৃদয়াংগম করানো সম্ভব হয়নি, আজ ইচ্ছা করলে আধুনিক বৈজ্ঞনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তা কোন শহরের সাধারণ-বিশেষ সব লোকদের কয়েক ঘন্টা অন্তর অন্তর সহজেই বুঝিয়ে দেয়া যেতে পারে।

এ কারণে আজ হকের প্রচারের জন্য এসব উপায় উপকরণ হস্তগত করা একান্ত প্রয়োজন। হকপন্থীরা যদি এসব মাধ্যমকে এই ধারনা করে উপেক্ষা করে যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম.আল্লাহর দ্বীনের প্রচারের জন্য এসব মাধ্যম ব্যবহার করেননি, বরং প্রতিটি ব্যক্তির কাছে সশরীরে উপস্থিত হয়ে দাওয়াত পৌছিয়েছেন অতএব আমাদের জন্যও উত্তম পন্থা হচ্ছে এই যে, আমরাও এসব জিনিসে ভুলেও হাত লাগাবনা, বরং ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দেব তা না হলে এটা নবীদের তাবলীগের পদ্ধতির অনুসরণ হতে পারেনা। বরং এটা হচ্ছে শয়তানের এক বিরাট ধোকা এবং প্রবঞ্চনা। সে দ্বীনের আহবানকারীর জন্য এই ষড়যন্ত্রজাল বিস্তার করে রেখেছে। যতক্ষণে সে তার দ্বীনদারী পন্থার অনুসরণ করে দুই ব্যক্তি পর্যন্ত নিজের কথা পৌছাতে পারবে, ততক্ষণে বাতিল পন্থীরা বৈজ্ঞানিক মাধ্যমগুলো কাজে লাগিয়ে হাজারো, লাখো, বরং কোটি কোটি মানুষের কাছে নিজেদের বাতিলের দাওয়াত অত্যন্ত প্রভাবশালী পন্থায় পৌঁছে দেবে। শয়তান এ ধরণের ধোকা দিয়ে অধিকাংশ হক পন্থীদের চেষ্টা সাধনা এবং যোগ্যতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং তাদের তুলনায় নিজের পাল্লা ভারী রেখেছে। শেষ পর্যন্ত তারা এখন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছে পড়ে গেছে এবং শয়তান সামনে অগ্রসর হয়ে জাতি সমূহের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই দুই দলের শ্রমসাধনার মধ্যে এখন আর কোন সম্পর্কই বাকি থাকলনা। হকপন্থীরা যতক্ষণ এই বিরাট শক্তিকে হকের খেদমতে ব্যবহার করার পদ্ধতি না শিখবে ততদিন এই অবস্থাই চলতে থাকবে। আজ এই শক্তি সম্পূর্ণরূপে শয়তানী শক্তির কবজায় বাতিলের খেদমতে নিয়োজিত রয়েছে।

সামাজিক উন্নতিকেও দাওয়াতের কাজে লাগাতে হবে

দাওয়াতের পদ্ধতি যেমন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি কোন থেকে অত্যন্ত উচ্চ এবং উন্নত মানের হওয়া দরকার যাতে বাতিলের সাথে পূর্ণ শক্তি নিয়ে মোকাবিলা করা যেতে পারে, অনুরূপভাবে সামাজিক এবং সামগ্রিক দিক থেকে জীবনযাত্রায় যে উন্নতি সাধিত হয়েছে তা থেকেও ফায়দা উঠাতে হবে, যাতে সময়ের মানদন্ডে দাওয়াতকেও পূর্ণরূপে প্রভাবশালী করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে সমাজে আপোশে মিলেমিশে থাকা, একত্রে উঠাবাসা করা, মতবিনিময় করা, নিজের মত অপরকে শুনানো এবং অপরের মত শুনা ইত্যাদি একান্ত প্রয়োজন। কোন কাজ সমষ্টিগতভাবে আঞ্জাম দেয়ার যে পদ্ধতি চালু আছে, যদি তার মধ্যে নৈতিক অথবা শরঈ কোন অনিষ্ট না থেকে থাকে, তাহলে হকপন্থীদেরও তাতে অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং হকের প্রচারে তাকে কাজে লাগাতে হবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যেসব পন্থা সমাজে পরিচালিত ছিল তার মধ্যে যেগুলো দাওয়াতের কাজে লাগানো উপযুক্ত ছিল তিনি দাওয়াতের কাজে এসব পন্থা থেকে ফায়দা উঠিয়েছেন। প্রথম প্রথম তিনি যখন নিজের বংশের নেতাদের, যারা মূলত জাতিরও নেতা ছিল, নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করতে চাইলেন ,তখন সেজন্য এই পন্থা অবলম্বন করলেন যে, তিনি হযরত আলীকে (রাঃ) প্রীতিভোজের আয়োজন করার এবং গোটা মোত্তালিব গোত্রকে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিলেন। হযরত আলী (রাঃ) নির্দেশমত কাজ করলেন। মোত্তলিব গোত্রের সবলোক একত্র হল। হযরত হামযা (রাঃ), আবু তালিব, আব্বাস (রাঃ) সবাই প্রীতিভোজে অংশ গ্রহণ করল। লোকেরা যখন আহার শেষ করল, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়িয়ে একটি ভাষণ দিলেন। তার সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে এই যে, "আমি আপনাদের কাছে এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি, যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি।" ভাষণের শেষ পর্যায়ে তিনি উপস্থিত লোকদের কাছে প্রশ্ন রাখলেন, "এই ভারবোঝা বহন করার জন্য আপনাদের মধ্যে কে আমার সংগী হতে প্রস্তুত আছেন?" সবাই চুপ করে বসে থাকল। কিছু সময় অপেক্ষা করার পর হযরত আলী (রাঃ) এক কোণ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আবেগময় ভাষায় বললেন "যদিও আমার চোখে ব্যাথা, যদিও আমি শক্তিহীন এবং যদিও আমি সবার চেয়ে বয়সে নবীন, তথাপি আমিই আপনার সংগী হব।"

এ পদ্ধতি ছাড়াও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবলীগের জন্য উপাকারী অন্যান্য সাধারণ পদ্ধতিও অবলম্বন করেছেন। যেমন, মক্কা এবং তায়েফের

নেতৃস্থানীয় লোকদের সামনে দাওয়াত পেশ করার জন্য তিনি নিজেই তাদের সাথে গিয়ে মিলিত হতেন। হজ্জের মওসুমে যেসব গোত্র মক্কার আশে পাশে তাবু ফেলত, তিনি তাদের গোত্র পতিদের সাথে মিলিত হতেন এবং তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। বিভিন্ন এলাকার বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে প্রতিনিধি পাঠাতেন। আরবে কিছু কিছু মওসুমী মেলা বসত। এতে বিভিন্ন স্তরের লোক উপস্থিত হত। এটা কেবল ক্রয়–বিক্রয়, ব্যবসা–বাণিজ্য এবং আমোদ–প্রমোদেরই উৎস ছিলনা। বরং তাতে জ্ঞান–বিজ্ঞান ও সাহিত্য মেলাও বসত। রসূলুল্লাহ (স) এসব মেলায় গিয়েও উপস্থিত হতেন এবং লোকদের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতেন। অনেক লোককে তিনি চিঠি পত্রের মাধ্যমেও দাওয়াত দিয়েছেন।

মোট কথা সেই যুগে লোকদেরকে কোন জিনিসের নিকটবর্তী করার জন্য অথবা লোকদের নিকটবর্তী হওয়ার জন্য যেসব পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল, তার মধ্যে কোন নৈতিক দোষ না থাকলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব পদ্ধতিকে পূর্ণরূপে দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করতেন। প্রত্যেক যুগের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে যেসব পন্থা উদ্ভাবিত হত, সেই যুগের লোকেরা তার সাথে পরিচিত থাকত। এজন্য লোকদের সাথে কাজকর্ম ও আচার ব্যাবহার করার জন্য তাদের মেজাজের সাথে সংগতিপূর্ণ পন্থাই অবলম্বন করা আবশ্যক। লোকেরা যেভাবে মিলিত হতে চায় তাদের সাথে সেভাবেই মিলিত হতে হবে। লোকেরা যেভাবে শুনতে চায় সেভাবেই শুনানোর চেষ্টা করা উচিৎ। যে কর্মপন্থাকে লোকেরা ফলপ্রসূ মনে করে তাকে গ্রহণ করা উচিৎ।

কোন ব্যক্তি যদি এসব কর্মপন্থা গ্রহণ করা থেকে কেবল একারণে বিরত থাকে যে, এগুলো তার নিজের রুচির পরিপন্থী,অথবা সে এসব পন্থা অবলম্বন করার যোগ্যতা রাখেনা, অথবা এই পদ্ধতি পূর্ববর্তীগণ অবলম্বন করেননি; তাই তার ধারনামতে এগুলো আদর্শ কর্মপন্থা নয়–তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিনতি তার প্রচার কার্যের ব্যর্থতার আকারে প্রকাশ পাবে এবং উদ্দেশ্য যতই মহৎ ও নির্ভেজাল হোক না কেন, তা তার প্রচার কার্যকে এই দুঃখজনক পরিনতি থেকে রক্ষা করতে পারবেনা। আজ যদি কোন ব্যক্তি দীনের দাওয়াত নিয়ে ইউরোপ আমেরিকার কোন দেশে যায়, তাহলে সেখানকার লোকদের সাথে নিজের যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য এবং তাদের মধ্যে নিজের চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেয়ার জন্য সেখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রচলিত উপায় ও পন্থা অবলম্বন করা তার জন্য জরুরী হয়ে পড়বে। যদি সে তা না করতে পারে বা না করতে চায়, বরং রাস্তায় রাস্তায় হেটে হেটে লোকদের কলেমা এবং নামায শিখাতে বদ্ধপরিকর হয়, তাহলে সে যতবড়

নিষ্ঠাবান ব্যক্তিই হোক না কেন, নিজের এই আযৌক্তিক মনোভাবের কারণে সে তার সমস্ত শ্রম সাধনাকে ব্যর্থ করে দেবে। এবং কলেমা ও নামাযের ইজ্জতও ভূলুণ্ঠিতহবে।

এ ক্ষেত্রে হকের আহবানকারীকে কেবল এই পরিমান সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ যে, সমসাময়িক যুগের স্বীকৃত এবং প্রচলিত পদ্ধতিসমূহের যেগুলোর মধ্যে নৈতিক দিক থেকে কোন ত্রুটি রয়েছে–সে তা অবলম্বন করবেনা। কোন বিশেষ প্রয়োজনে যদি এধরণের কোন ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহন করতেই হয়, তাহলে একে নৈতিক ত্রুটি থেকে পাক করেই তা গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রথম প্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাম নিজের সম্প্রদায়কে অমনোযোগিতা ও উদাসীনতা থেকে সজাগ করার জন্য এবং লোকদেরকে নিজের বক্তব্যের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য সাফা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ডাক দিলেন। জাহেলী আরবে আহ্বানের এই পন্থার আসলরূপ ছিল এই যে, বিপদের তীব্রতা প্রকাশ করার জন্য উচ্চস্বরে আহ্বানকারী নিজের পরিধানের সমস্ত কাপড় খুলে সম্পূর্ণ উলংগ হয়ে যেত। আরবের পরিভাষায় একে 'নাযীরুল উরিয়ান' (উলংগ সর্তকারী) বলা হত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের সজাগ করার জন্য উলংগ সতর্ককারীর পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু উলংগ হওয়াটা যেহেতু চরম পর্যায়ের একটি নির্লজ্জতা এবং চরিত্রহীনতা, তাই তিনি এই পদ্ধতিকে উল্লেখিত দোষ থেকে পাক করে নিলেন। এই দৃষ্টান্ত থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে, বর্তমান যুগে প্রচারের যে বৈঠকি এবং সামষ্টিক পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে তার মধ্যে যদি কোন খারাপ দিক থেকে থাকে,তাহলে একারণে তাকে এক ঠেলায় প্রত্যাখ্যান করার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে যা করতে হচ্ছে তা হচ্ছে এই পদ্ধতিকে দোষত্রুটি থেকে পাক করে তাকে হকের উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

আজ পৃথিবীর সভ্য দেশসমূহ কোন আন্দোলনকে জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার যে অসংখ্য পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে তা যেভাবে জাহেলিয়াতকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজে সক্রিয় রয়েছে, অনুরূপ ভাবে কল্যাণ ও মঙ্গলকে ছড়িয়ে দেয়ার কাজেও তাকে অত্যন্ত সক্রিয় করা যেতে পারে। কেবল প্রয়োজন হচ্ছে একে ক্ষতিকর দিক থেকে পাক করে তা থেকে ফায়দা উঠানো। কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে এই যে, আজ যেসব লোক এই পন্থাকে গ্রহণ করছে, তারা অতীব উত্তম উদ্দেশ্যেও এগুলোকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট রূপ দিয়ে ব্যবহার করছে। যেমন, জিহাদের মত একটি পবিত্রতম উদ্দেশ্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে চাইলে আনন্দমেলা বা মিনা বাজার লাগিয়ে দেয়া হয়। নারীদের রূপসৌন্দর্যের পসরা, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতাকে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যম বানানো হয়।

মুহাজির উদ্বাস্তুদের সাহায্যের মত একটি মহৎ কাজের জন্য যদি ফাণ্ড তৈরীর প্রয়োজন হয়, রক সংগীত ও নৃত্য সংগীতের আসর বসিয়ে দেয়া হয়। সুপ্ত যৌনবৃত্তিকে সুরসুরি দিয়ে জনগণের পকেট থেকে পয়সা আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়।

আবেগকে উত্তেজিত করার আর কোন সহজ পন্থা না পাওয়া গেলে অন্তত কিছু সংখ্যক কবি সাহিত্যিককে একত্র করে দর্শনীর বিনিময়ে কবিতা পাঠের আসর বসানো যায়। কবিতার সুরমূর্ছনায় লোকদের ঈমানকে জাগ্রত করার চেষ্টা করা যায়। যেসব জিনিসের মধ্যে অন্তত কিছু কল্যাণকর উপাদান মওজুদ রয়েছে–জাতির বিকৃত রুচির কারনে তাও নিকৃষ্টতার ছাঁচে ঢালাই হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এটা কিভাবে আশা করা যেতে পারে যে, কোন গর্হিত জিনিসের মূলোৎপাটান করে তদস্থলে কোন কল্যাণ নিয়ে আসা হবে? তথাপি ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে এই যে, কোন জিনিসের মধ্যে খারাপ কিছু থাকলে তার সংশোধন করে এটাকে হকের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজে লাগাতে হবে। এটাকে এক বাক্যে উপেক্ষা করা ঠিক নয়।

হকের আহ্বানকারী হকের প্রচারের জন্য যেসব উপায় ও পান্থা অবলম্বন করবে– এই দুটি মৌলিক হেদায়াত সেইসব পন্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাকে এদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এখন একজন হকের প্রচারককে যেসব পন্থা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে, তার সাথে সংশ্লিষ্ট কতিপয় হেদায়াত আমরা এখানে উল্লেখ করব। এ প্রসংগে মৌলিক কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর দীনের আহ্বানকারী কখনো এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবেনা যা দীনের প্রচার, অথবা প্রচারকের মর্যদা, অথবা প্রাচরকার্যের পরিপন্থী। এধরনের পদ্ধতির সংখ্যা অনেক হতে পারে। তা গুনে গুনে বলা কঠিন। আমরা উদাহরণ স্বরূপ মাত্র কয়েকটি কথা উল্লেখ করব। তা থেকে মোটামুটি জানা যাবে যে, হকের আহ্বানকারীদের কোন কোন প্রকারের পন্থা পরিত্যাগ করা উচিত।

মর্যাদার পরিপন্থী পদ্ধতি সমূহ পরিত্যাজ্য

আল্লাহর দীনের দিকে লোকদের আকৃষ্ট করার জন্য প্রচারকের অবশ্যই এমন সব পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকে দুরে থাকতে হবে যার কারণে দাওয়াতের মর্যাদা অথবা প্রচারকের নিজের মর্যদা ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা রয়েছে। নিজের কাজের মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবে ব্যস্ত থাকা এবং লোকদেরকে হকের দিকে আকৃষ্ট করার অত্যাধিক আগ্রহ নিসন্দেহে একজন প্রচারকের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট। কিন্তু এই ব্যস্ততা এবং এই আগ্রহ এতটা বর্ধিত হওয়া উচিৎ নয়, যার ফলে প্রচারক নিজের নফসের অধিকার সম্পর্কে হুশহারা হযে পড়বে, নিজের সাথী ও বন্ধুদের সম্পর্কে খেয়াল

হারিয়ে ফেলবে এবং নিজের দাওয়াতের মর্যাদা ও অবস্থার কোন পরোয়া থাকবেনা। যে ব্যক্তি শুনতে প্রস্তুত নয় তাকে শুনাতে চেষ্টা করা, পলায়নকারীদের পিছে ছুটে বেড়ানো, ঘৃণা-বিদ্বেষকারীদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা এবং অহংকারীদের খাতির তোয়াজ করা। কেবল এই পর্যন্তই জায়েয, তাতে প্রচারকের ব্যক্তিত্ব ও দাওয়াতের মর্যাদার কোন ক্ষতি হতে না পারে এবং দাওয়াতের কাজে কোনরূপ হীনমন্যতাবোধ অথবা খেলোভাব সৃষ্টি হতে না পারে। ব্যাপার যদি এই সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে বলে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে যে সত্যের ভালবাসা প্রচারককে এসব লোকদের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে-সেই সত্যের মর্যাদার দাবী হচ্ছে এই যে, সে নিজের ব্যক্তিত্বকে অক্ষুন্ন রেখে তাদের থেকে আলগ হয়ে যাবে এবং কেবল সেই লোকদের নিজের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানাবে, যাদের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান এবং জানার আগ্রহ বর্তমান রয়েছে। সূরা আবাসার নিম্নোক্ত আয়াতগুলোতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরাইশ নেতাদের সাথে এ ধরণের খাতির তোয়াজ করা থেকে নিবৃত রাখা হয়েছে এবং সেই সত্যের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তুমি যেমন মহান মর্যাদাপূর্ণ দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত হয়েছ, তা এমন নয় যে, তাকে এতটা অবনত হয়ে পেশ করতে হবে। এই আয়াতগুলোতে কুরান মজীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নত মর্যাদার উল্লেখ এ উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে যে, এই উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন কালাম যার সামনেই পেশ করা হবে-তা পেশ করার সময় অবশ্যই এর মর্যাদার দিকে খেয়াল রাখতে হবে যে, এটা মহান আল্লাহর নির্দেশনামা, কোন যাঞ্চাকারীর আবেদনপত্র নয়।

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى وَمَا عَلَيْكَ اَلاَّ يَزَّكّٰى وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى وَهُوَ يَخْشٰى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى كَلاَّ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهٗ فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ (عبس- ٥ - ٦) ـ

"যে লোক উন্নাসিকতা দেখায় তুমি তার পেছনে লেগে গেছ। অথচ সে যদি পবিত্রতা অর্জন না করে, তাহলে তোমার ওপর কোন অভিযোগ নেই। আর যে ব্যক্তি তোমার কাছে আগ্রহ সহকারে আসে এবং সে খোদাকেও ভয় করে তার প্রতি তুমি অনীহা প্রদর্শণ করছ। কক্ষণও নয়, (এই অহংকারীদের এতটা

পরোয়া করার প্রয়োজন নেই) এতো এক উপদেশ মাত্র। যার ইচ্ছা তা গ্রহণ করবে। তা এমন এক সহীফায় লিপিবদ্ধ-যা সম্মানিত, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন এবং পবিত্র। তা মর্যাদাবান এবং পূণ্যবান লেখকদের হাতে থাকে।"

–(সূরাআবাসা–৫–১৬)

এটা কখনো জায়েয হতে পারেনা যে, তাবলীগের জোশে এসে আহ্বানকারী যেকোন সভায়ইচ্ছা গিয়ে ধমকাবে এবং শ্রোতাদের কোন মনোযোগ থাক বা না থাক নিজের বক্তব্য না শুনিয়ে ক্ষান্ত হবেনা।

যে পথিকই পাওয়া যাবে তার পেছনে লেগে যাবে এবং যতক্ষণ তাকে কিছু শুনাতে না পারবে অথবা তার কাছ থেকে কিছু শুনে না নেবে ততক্ষণ তার পিছু ছাড়বেনা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে,

ولا اظنك تاتى القوم وهم فى حديث من حديثهم تنقص

عليهم ولكن انصت واذا امروك فحد ثهم وهو يشتهو نه–

"আমি তোমাকে এমন অবস্থায় যেন না দেখি যে, তুমি কোন দলের কাছ গিয়ে যাচ্ছ, তখন তারা নিজেদের কোন কাজে ব্যস্ত রয়েছে, আর এই অবস্থায় তুমি তাদেরকে নিজের ওয়াজ শুনানো আরম্ভ করে দিলে। বরং তোমার তখন চুপ থাকা উচিৎ। যখন তারা তোমাকে বলার সুযোগ দেবে তখন তুমি তাদের কাছে নিজের বক্তব্য পেশ করবে। তাহলে তারা আগ্রহ সহকারে তোমার কথা শুনবে।"–(বুখারী)।

এমন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করা থেকেও একান্তই বিরত থাকা উচিৎ যার ফলে দাওয়তের ব্যাপারটি লোকদের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং তারা এতে ঘাবড়ে যেতে পারে।

عن شقيق قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس فى

كل خمسين فقال له رجل ياابا عبد الرحمن لوددت انك

ذكرتنا فى كل يوم قال اما انه يمنعنى من ذلك انى اكره

ان املكم وانى تخولكم بالموعظة كما كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم يتخو لنا بها مخافة السامة علينا–

শাকীক (তাবেঈ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের সামনে ওয়াজ-নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আবু আবদুর রহমান। আমি চাচ্ছিলাম আপনি যদি প্রতিদিন আমাদের জন্য ওয়াজ-নসীহত করতেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন, এরূপ করতে আমাকে একথাই বাধা দেয় যে, আমি তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করাকে অপছন্দ করি। এ কারণে আমি তোমাদের জন্য মাঝে মধ্যেই ওয়াজ করে থাকি, যেভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বিরক্তির ভয়ে মাঝে মধ্যেই আমাদের জন্য ওয়াজ-নসীহাত করতেন।"-(বুখারী, মুসলিম)

উদ্দেশ্যের পরিপন্থী পদ্ধতি পরিত্যাজ্য

হকের আহ্বানকারীর কখনো এমন কোন পন্থা অবলম্বন করা উচিৎ নয়, যা তার বৈশিষ্টের দিক থেকে দাওয়াতের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেমন, বিতর্কযুদ্ধ। এই পন্থাকে যদিও একটা উল্লেখযোগ্য সময় ধরে দাওয়াত ও তাবলীগের সর্বাধিক কার্যকর পন্থা বলে ধারনা করা হচ্ছে এবং তার এই গুরুত্বের কারণে আমাদের লেখকগণ এই বিষয়ের ওপর বই পুস্তকও লিখে ফেলেছেন। যা আমাদের আরবী মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যতালিকাভুক্তও করা হয়েছে-কিন্তু হকের আন্দোলনের প্রাণসত্তার সাথে এই পন্থার যে দূরতম সম্পর্ক রয়েছে অনুরূপ দূরতম সম্পর্ক অন্য কোন পন্থার সাথে নেই। এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে বিতর্ক-বাহাসের অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে যে বিতর্ক বাহাসের শিক্ষা দেয়া হয় এবং আমাদের প্রচারক ও তার্কিকগণ দিনভর বিতর্কের যে আখড়া জমিয়ে বসে -কুরআনে উল্লেখিত মুজাদালা এবং মুহাজ্জা শব্দের অর্থ এই ধরনের 'বিতর্ক' করাটা সম্পূর্ণ ভুল। আমাদের তর্কবিশারদগণ যেহেতু কুরআনের এই দুটি শব্দকেই তাদের বিতর্ক যুদ্ধের সপক্ষ্যে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন, এজন্য আমরা সংক্ষেপে এ দুটি শব্দের তাৎপর্য কুরআন মজীদের সাহায্যেই তুলে ধরার চেষ্টা করব। এর ফলে নবী-রসূলদের মুজাদালা ও মুহাজ্জা এবং বর্তমানে প্রচলিত বিতর্কযুদ্ধের মধ্যেকার পার্থক্য পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে।

কুরআন যে ধরনের বিতর্কের অনুমতি দিয়েছে

কুরআন মজীদে দুই ধরনের মুজাদালার (বিতর্ক) উল্লেখ আছে। বাতিল পন্থায় মুজাদালা এবং উত্তম পন্থায় মুজাদালা। বাতিল বিতর্কে কুরআন মজীদ কাফের এবং

ইসলামের শত্রুদের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছে। বর্তমান যুগে সাধারণভাবে প্রচলিত বিতর্ক বাহাসের মধ্যে যে বৈশিষ্টগুলো লক্ষ্য করা যায়, উল্লেখিত বিতর্কের বৈশিষ্টও প্রায় তাই বর্ণনা করেছে। কোন যুক্তিসংগত দলীল ছাড়াই নিজের মতের ওপর অটল থাকা এবং অন্যকে তা মানতে পীড়াপীড়ি করা, অপ্রাসংগিক কথার সাথে আসল ব্যাপারকে জড়িত করার প্রবণতা, নিষ্ফল বক্র বিতর্কে সময় নষ্ট করা, প্রতিপক্ষের বক্তব্য না নিজে শুনবে, না অপরকে শুনতে দেবে, সেই অর্থহীন বাচালতা ও নিষ্ফল গলাবাজি যা সাধারণ ভাবে বর্তমান কালের তার্কিকদের বৈশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদ এগুলোকে বাতিল বিতর্কের বৈশিষ্ট বলে উল্লেখ করেছে এবং হকের অনুসারীদের কঠোরভাবে তা থেকে বিরত থাকতে বলেছে। তাদেরকে কেবলী উত্তম পন্থায় বিতর্ক করার অনুমতি দিয়েছে। জ্ঞানগত এবং কর্মগত উভয় দিক থেকে কুরআন এই উত্তম পন্থার ব্যাখ্যা করে দিয়েছে, যাতে প্রতিটি লোক তা ভালভাবে হৃদয়াংগম করতে পারে।

এই বিতর্কের বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থা কুরআন মজীদে এই বলেছে যে, সম্বোধিত ব্যক্তির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে এই চেষ্টা করা উচিৎ যে, যেসব মৌলিক ব্যাপারে তার সাথে ঐক্য ও মিল রয়েছে এবং যেগুলো মেনে নিতে সে অস্বীকার করেনা–তা তার সামনে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরতে হবে। এর ফলে সে প্রচারকের বক্তব্য শুনতে আগ্রহী হবে। অতপর তার স্বীকৃত মূলনীতি থেকে অবশ্যম্ভাবীরূপে যে ফলাফল বেরিয়ে আসে তা তার সামনে তুলে ধরতে হবে। তাহলে সে এটাকে নিজের কথা মনে করে তা গ্রহণ করে নিতে প্রস্তুত হবে। একে নিজের প্রতিপক্ষের দাবী মনে করে তা প্রত্যাখ্যান করার জ্বাব তার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারেনা। কুরআন মজীদ নিজেই এর অতি উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করেছে।

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ٥ (٤٦– عنكبوت) ـ

"আর উত্তম রীতি ও পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করনা। তাদের মধ্যে যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছে তাদের সাথে মূলত কোন বিতর্কই নেই। তোমরা আরো বলো, আমরা ঈমান এনেছি যা আমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে। আমাদের খোদা এবং তোমাদের খোদা একই এবং আমরা তাঁরই অনুগত।"

এ আয়াতে প্রথমত একথা বলে দেয়া হয়েছে যে, যেসব লোক নিকৃষ্ট প্রকৃতির এবং বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, যারা কেবল ঝগড়া-ঝাটি করতেই অভ্যস্ত এবং সত্যকে বুঝার ও মেনে নেয়ার কোন আগ্রহই যাদের মধ্যে নেই-তাদের সাথে মূলত কথা বলারই কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য যারা অনুসন্ধানকারী তাদের সাথে কথা বার্তা বলতে হবে, আলাপ-আলোচনা করতে হবে। তার পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, তাদের ও আমাদের মধ্যে স্বীকৃত মূলনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে।

এই মূলনীতি অনুযায়ী আহলে কিতাবদের সামনে তৌহীদের দাওয়াত এমন শব্দে পেশ করতে হয়েছে যার মাধ্যমে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আহলে ঈমান (মুসলমান) ও আহলে কিতাবদের মাঝে তৌহীদ যখন একটি মৌলিক নীতি হিসাবে স্বীকৃত, তখন এর ফলাফল ও দাবীর ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ কেন হবে? আহলে কিতাবগণ যখন এই মূলনীতিকে স্বীকার করে নিচ্ছে, তখন এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফলকেও তাদের মেনে নেয়া উচিৎ। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে।

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ اِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (آل عمران- ٦٤) ـ

"বলে দাও, হে আহলে কিতাব। এসো এরূপ একটি কথার দিকে যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ সমান। তা এই যে, আমরা (উভয়েই) আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবনা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবনা এবং আমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে নিজেদের রব হিসাবে গ্রহণ করবনা। এই দাওয়াত কবুল করতে তারা যদি প্রস্তুত না হয় তাহলে তোমরা পরিষ্কার বলে দাও- তোমরা সাক্ষী থাক আমরা মুসলমান-কেবলমাত্র আল্লাহর বন্দেগী ও আনুগত্যে নিজেদের সোপর্দ করে দিয়েছি।" -(সূরা আলে-ইমরানঃ৬৪)

কুরআন মজীদ বিতর্কের যে বাস্তব উদাহরণ পেশ করেছে এবং যার প্রশংসা করেছে, তার ওপর চিন্তা করলে জানা যায়, নিজের বক্তব্য মানিয়ে নেয়ার জন্য প্রেম ভালবাসা, আত্মবিশ্বাস, সচ্চরিত্র ও উত্তম যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে অভিভূত করার নামই হচ্ছে মূলত মুজাদালা বা বিতর্ক। প্রতিপক্ষ শেষ পর্যন্ত হকের

আহ্বানকারীর আন্তরিকতা, তার নিরপেক্ষতা এবং তার নিষ্ঠার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তার বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে চিন্তা করতে এবং তা মেনে নিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে।

কুরআন মজীদ এই ধরনের বিতর্কের বিভিন্ন উদাহরন পেশ করেছে। তার সবগুলো বর্ণনা করতে গেলে আলোচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে একটি মাত্র বিতর্কের ঘটনা উল্লেখ করব। এ থেকে পরিষ্কার জানা যাবে, কি ধরনের মহব্বতপূর্ণ প্রকাশভংগী এবং একাগ্রতাকে মুজাদালা (বিতর্ক) শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তার প্রশংসা করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম, লূত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার সাথে যে মুজাদালা করেছেন, কুরআন মজীদ তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেছে যে, এই মুজাদালা ইবরাহীমের (আঃ) আন্তরিক সহানুভূতি, মমতা ও ব্যাথা-বেদানারই ফল। এখন দেখা যাক কুরআন মজীদ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যে বিতর্কের প্রশংসা করেছে তার বিস্তারিত রূপ কি ছিল। কুরআন মজীদে কেবল এর প্রশংসা করা হয়েছে, তার কোন বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়নি। এজন্য আমরা এর বিস্তারিত বর্ণনা তাওরাত কিতাব থেকে সংগ্রহ করেছি। তাওরাতের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আঃ) লূত সম্প্রদায়ের ওপর শাস্তির দণ্ড নিয়ে আগত ফেরেশতাদের সাথে নিম্নোক্ত কথাবার্তা বলেছেনঃ

"তখন আব্রাহাম নিকটে গিয়ে বলল, তুমি কি নেককার লোকদের পাপিষ্ঠদের সাথে ধ্বংস করে দেবে? খুব সম্ভব এই শহরে পঞ্চাশজন ন্যায়পরায়ন ও সত্যবাদী লোক রয়েছে। তুমি কি তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে এবং এদের মধ্যে এই পঞ্চাশজন ন্যায়পরায়ণ লোক থাকা সত্বেও এই স্থানকে রেহাই দেবেনা? তোমার দ্বারা এটা হতেই পারেনা যে, তুমি নেককার লোকদের দুষ্কৃতিকারীদের সাথে একত্রে মেরে ফেলবে এবং উভয়ে এক সমান হয়ে যাবে। সারা জাহানের ন্যায় বিচারক কি ন্যায় বিচার করবেনা? আল্লাহ তাআলা বললেন, সদুম শহরে যদি পঞ্চাশজন ন্যায়পরায়ন লোক পাওয়া যায়, তাহলে আমি তাদের কারণেই এ স্থানকে ধ্বংস করা থেকে নিবৃত্ত থাকব। তখন ইবরাহীম বলল, দেখুন, আমি আল্লাহর সাথে কথা বলার দুসাহস করেছি। যদিও আমি তাঁর নগণ্য বান্দা। সম্ভবত ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদীদের সংখ্যা পঞ্চাশ থেকে পাঁচ কম হবে। তুমি কি এই পাঁচজন কম হওয়ার কারণে গোটা জনবসতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে? সে বলল, সেখানে আমি যদি পঁয়তাল্লিশজন সত্যবাদী লোক পাই তাহলে আমি তা ধ্বংস করবনা। ইবরাহীম পূর্ণবার বলল,

যদি সেখানে চল্লিশজন ন্যায়পরায়ণ লোক থেকে থাকে? ফেরেশতা বলল, চল্লিশজন পাওয়া গেলেও ধ্বংস করবনা। এমনকি সেখানে ত্রিশজন সত্যপন্থী লোক পাওয়া গেলেও জনবসতিকে ধ্বংস করবনা। ইবরাহীম আবার বলল, আমি আল্লাহর সাথে কথা বলার দুঃসাহস করেছি। সম্ভবত সেখানে বিশজন সত্যপন্থী লোক পাওয়া যাবে। ফেরেশতা বলল,বিশজনের কারণেও আমি এই জনবসতিকে ধ্বংস করবনা। ইবরাহীম বলল, আল্লাহ যদি অসন্তুষ্ট না হন তাহলে আমি আরো একবার তাঁর কাছে আবেদন করে দেখব। সম্ভবত সেখানে দশজন সত্যবাদী লোক পাওয়া যাবে। ফেরেশতা বলল, এই দশজনের কারণেই আমি তা নিশ্চিহ্ন করবনা। আল্লাহ তাআলা যখন ইবরাহীমের সাথে কথা বলা শেষ করলেন, তখন ফেরেশতারা চলে গেল এবং ইবরাহীম ঘরে ফিরলেন।"–(আদিপুস্তকঃ অনুচ্ছেদ ১৮,আয়াত ২৩–৩৩)

কথোপকথনের এই ধরণ, সম্বোধনের এই পন্থা, যুক্তি পেশ করার এই পদ্ধতি এবং মহব্বতপূর্ণ এই প্রকাশ–ভংগী–একেই কুরআন মজীদে মুজাদালা (বিতর্ক) শব্দের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কুরআন মজীদ এই ধরনের মুজাদালারই প্রশংসা করেছে। লোকেরা যদি এই মুজাদালাকে নিজেদের বিতর্ক–যুদ্ধের বৈধতা প্রমানের জন্য দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে চায় তাহলে এই মুজাদালার মধ্যে যে প্রানশক্তি রয়েছে তা তাদের বিতর্কের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। এবং সেই সৌন্দর্য মহব্বত, মমতা ও সহানুভূতির সাথে নিজের বক্তব্য প্রতিপক্ষের সামনে পেশ করতে হবে। মুজাদালার নামে দ্বন্দ্ব–সংঘাত ও যুদ্ধ–সংগ্রাম চালানো হবে আর এর নাম দেয়া হবে বিতর্ক এবং এর বৈধতা প্রমাণের জন্য নবীদের জীবন থেকে দলীল গ্রহণ করা হবে–এটা কখনো হতে পারেনা।

অনুরূপভাবে কুরআন মজীদ হযরত ইবরাহীমের (আঃ) আরো একটি বিতর্কের কথা উল্লেখ করেছে এবং তাকে 'মুহাজ্জা' শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে। এই বিতর্ক হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর সমসাময়িক যুগের এক স্বৈরাচারী বাদশার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তার বিস্তারিত বর্ণনা এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) বাদশাকে বললেন, "যিনি মারেন এবং জীবন্ত করেন তিনিই আমার রব।" এর উত্তরে বাদশা বলল, "আমিই তো মারি এবং বাঁচাই।" একথার ওপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন," আমার প্রতিপালক পূর্বদিক থেকে সূর্য উদিত করেন। তুমি তা পশ্চিম দিকে থেকে উঠাও তো দেখি।"

এই বিতর্ককে যদি বর্তমান বিতর্ক শাস্ত্রের সেই মূলনীতির ওপর রাখা হয় যার শিক্ষা আমাদের বিতর্কমূলক বইপুস্তকে দেয়া হচ্ছে—তাহলে হযরত ইবরাহীম (আঃ) খুব একটা যোগ্য তার্কিক বলে সাব্যস্ত হতে পারবেননা। কেননা তিনি বাদশার দাবী 'আমিই তো মারি এবং বাঁচাই' প্রমাণের জন্য অনেক কিছু দাবী করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। অথচ একজন তার্কিক হিসাবে নিজের প্রতিরক্ষা ব্যূহ গড়ে তোলার এটাই ছিল মোক্ষম সুযোগ। কিন্তু তিনি একজন তর্কবাগিশের তর্কযুদ্ধের মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজ করেছেন। তিনি নিজেই পেছনে সরে আসাটা উপযুক্ত মনে করেছেন। তিনি যখনই অনুভব করতে পারলেন, এই ব্যক্তি বিতর্ক এবং নিজের কথার মারপ্যাচ খাটানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছে, তখন তিনি একটি মুখবন্ধ করা কথা বলে দ্রুত কেটে পড়লেন। এ ঘটনা থেকে প্রমান হয় যে, হকের আহ্বানকারীর যদি সম্বোধিত ব্যক্তি সম্পর্কে এই অনুমান হয়ে যায় যে, সে কথা শুনতে এবং বুঝতে পারছেনা, বরং বিরোধ এবং বিতর্ক সৃষ্টি করতে চাচ্ছে, তাহলে তার পেছনে লেগে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। বরং আলোচনা সংক্ষেপ করে সরে পড়া উচিৎ।

দাওয়াতের ভাষা এবং হকের আহ্বানকারীদের প্রকাশভংগী

এখন আমরা দাওয়াতের ভাষা এবং নবীদের বাকরীতির সম্পর্কে আলোচনা করব। কোন আহ্বানকারীর উদ্দেশ্য কেবল একটা সত্যকে প্রকাশ করে দেয়াই নয়। বরং সত্যকে পূর্ণরূপে প্রতিভাত করে তোলাও তার উদ্দেশ্য–যাতে বিশিষ্ট লোকেরাও তা উত্তমরূপে বুঝে নিতে পারে এবং সাধারণ লোকদের জন্যও তা হৃদয়াংগম করার ব্যাপারে কোন অসুবিধা বাকি না থেকে যায়। অনন্তর সত্যকে অতীব সুন্দর পদ্ধতিতে তুলে ধরতে হবে–যাতে শ্রোতাদের মধ্যে যাদের অন্তরে সত্যকে গ্রহণ করার মত কিছুটা যোগ্যতা এখনো অবশিষ্ট আছে–তারা তা গ্রহণ করে নিতে পারে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের কাছে তা অমান্য করার জন্য তাদের কুরুচি এবং হঠকারিতা ছাড়া আরো কারণ বাকি না থাকতে পারে। এই উদ্দেশ্যের অত্যাবশ্যকীয় দাবী হচ্ছে এই যে, দাওয়াদের ভাষা অত্যন্ত প্রভাবশালী হতে হবে এবং আহ্বানকারীর বাকরীতি স্বভাব সুলভ ও হৃদয়গ্রাহী হতে হবে। কিন্তু আকর্ষণ এবং প্রভাব সৃষ্টি করার অনেক কৃত্রিম এবং স্বভাব বিরুদ্ধ পন্থাও আছে। এর সাহায্যে বক্তব্যের মধ্যে প্রকাশ্যত আকর্ষণ এবং হৃদয় গ্রাহীতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। যেমন জাহেলী আরবের গণক ঠাকুররা ছন্দবদ্ধ কবিতার মাধ্যমে নিজেদের বক্তব্যের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করত। বক্তাগণ নিজেদের বাক্যবিন্যাস এবং অনলবর্ষী বক্তৃতার মাধ্যমে তাদের বক্তব্যের জোর ও প্রভাব বৃদ্ধি করে থাকত।

অনুরূপভাবে বর্তমান যুগেও বক্তাগণ কবিতা ও কিচ্ছা–কাহিনীর সাহায্যে নিজেদের বক্তব্যের মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা করে থাকেন। সাংবাদিক এবং ধোকাবাজ রাজনীতিবিদগণ মিথ্যা ও অতিশয়োক্তির মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসা চালিয়ে থাকে। সাইনবোর্ড সর্বস্ব ডাক্তারগণ মিথ্যা শপথের মাধ্যমে নিজেদের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে থাকে। এসব জিনিসের মাধ্যমে বক্তব্যের মধ্যে এক ধরণের প্রভাব অবশ্যই সৃষ্টি হয়, কিন্তু তা কৃত্রিম প্রলেপের অধিক কিছু নয়। একারনে যেসব লোক দুনিয়াতে হকের প্রচারের জন্য উত্থিত হয়– সত্যের ছাঁচে ঢালাই মিথ্যার সাহায্যে নিজেদের দাওয়াতের জাকজমক বৃদ্ধি করা কখনো তাদের কর্মপন্থা হতে পারেনা। তারা নিজেদের জবান এবং নিজেদের কথাকেও এধরনের মিথ্যা দিয়ে কলুষিত করতে

পারেনা। এই মিথ্যা এবং কৃত্রিম জিনিসের পরিবর্তে তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভিন্ন জিনিস অবলম্বন করে। তা কেবল বৈধ এবং নির্ভুলই নয় বরং মানব প্রকৃতির সাথে তার গভীর মিলও রয়েছে। একারণে এই জিনিসের মাধ্যমে যে প্রভাব প্রতিফলিত হয়, তা মিথ্যা এবং কৃত্রিমতার মত এক ঘর্ষণেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়না। বরং পরীক্ষার গরম পাত্রে উত্তপ্ত হওয়ার পর তার চাকচিক্য আরো অধিক উজ্জ্বল হয়েসামনেআসে।

আহবানকারীর কাজের ধরন

দাওয়াতের কাজ কেবল এলমী এবং বৈঠকী আলোচনার জন্য উপযুক্ত প্রকাশ ভংগী ও বক্তব্যের মাধ্যমেই চলতে পারেনা। ব্যাপারটা এত সুস্পষ্ট যে, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা। হকের আহ্বাণকারীর কাজ ঘটনাবলী বর্ণনাকারী ঐতিহাসিক, আইনের ধারাসমূহ বর্ণনাকারী আইনবিদ এবং দর্শণ ও গণিত শাস্ত্রের সূত্র বর্ণনাকারী দার্শণিক ও গণিতজ্ঞের কাজ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তার বিষয়বস্তু এত ব্যাপক যে, গোটা মানবীয় জীবন এর আওতায় এসে যায়, অপরদিকে সে যাদের কাছে দাওয়াত পেশ করে তারা মেজাজ প্রকৃতির দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। এবং মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও তাদের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। উপরন্তু সেমিনারের প্রবন্ধের সাথে প্রবন্ধ রচয়িতার যেরূপ সম্বন্ধ থাকে, অথবা কোন মামলার সাথে উকিলের যেরূপ সম্পর্ক থাকে দাওয়াতের মিশনের সাথে দীনে হকের আহ্বানকারীর সম্পর্কটা তদ্রুপ নয় বরং সে এই মিশনের জন্য জীবন-মৃত্যুর সওদা হয়ে থাকে। মিশনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য তার জীবনকে বাজি রাখতে হয়। এরূপ অবস্থায় তার যে বক্তব্য রয়েছে তা কোন রকমে বলে দিতে পারলেই হল- এরূপ কথায় সে কখনো সন্তুষ্ট হতে পারেনা, আর এতে তার উদ্দেশ্যও সফল হতে পারেনা। বরং তার একান্ত চেষ্টা হচ্ছে, সে যে কথা বলতে চাচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে এবং সুন্দরভাবে তাকে বলতে হবে- যাতে এর কোন দিক অস্পষ্ট থেকে যেতে না পারে। তার নিজের বক্তব্য এতটা প্রবাবশালী এবং হৃদয়গ্রাহী ভংগীতে পেশ করতে হবে, যাতে হকের আহ্বান শুনার মত সামান্য যোগ্যতাও যার মধ্যে রয়েছে-তার অন্তরে তা অনুপ্রবেশ করতে পারে। অতএব, এই আবেগ সহকারে হযরতমূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার কাছে এই দোয়া করেনঃ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ـ

"হে প্রভু! আমার বক্ষ উন্মুক্ত করে দাও, আমার কাজকে (হকের দাওয়াতের কাজ) সহজ করে দাও এবং আমার মুখের জড়তা দূর করে দাও যাতে লোকেরা আমার কথা ভালভাবে বুঝতে পারে।" –(সূরা তা–হাঃ২৫–২৮)

অনন্তর তিনি হযরত হারুন আলাইহিস সালামের জন্য দোয়া করলেন তাঁকেও যেন আমার কাজে শরীক করা হয় যাতে তিনি নিজের বাকপটুতার মাধ্যমে আমার বক্তব্যের ত্রুটিকে দূর করে দিতে পারেন এবং আমার ওপর আরোপিত দাওয়াতের এই কাজ অপূর্ণ না থেকে যায়।

হকের আহ্বানকারীদের কথার বৈশিষ্ট

এখানে আমরা সংক্ষিপ্ত ভাবে নবী–রসূল এবং ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কথার বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করব। এই বৈশিষ্ট সমূহই তাদের বক্তব্যকে প্রভাবশালি করে তুলে। কোন যুগেই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বক্তব্যে এসব বৈশিষ্ট অনুপস্থিত থাকতে পারেনা। নবীদের উন্নত জীবনচরিত এবং নিষ্কলুষ শিক্ষার পর অন্য যে কোন জিনিসের তুলনায় এই বৈশিষ্ট সমূহ হকের আহ্বাণকারীদের বক্তব্যকে অধিকতর প্রভাবশালী করে তোলে।

প্রথম বৈশিষ্টঃ সর্বকালে এবং সর্বযুগে নবী–রসূল এবং হকের আহ্বাণকারীদের বক্তব্যের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট এই ছিল যে, তারা যে জাতির সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করেছেন–তাদের ভাষায়ই পেশ করেছেন– যাতে প্রতিটি সম্প্রদায় এবং প্রতিটি স্তরের লোকদের ওপর আল্লাহর চূড়ান্ত প্রমাণ পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ـ

" আমরা যখনই কোন রসূল পাঠিয়েছি–সে নিজ জাতির জনগনের ভাষায়ই পয়গাম পৌঁছিয়েছে–যেন সে তাদের পরিষ্কার ভাবে বুঝাতে পারে।"

–(সূরা ইবরাহীমঃ৪)

হকের আহ্বাণকারীর দাওয়াতের আসল ক্ষেত্র তার নিজের জাতির মধ্যেই হওয়া উচিৎ। এটাই স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংগত কথা। নিজের জাতিকে গোমরাহীর মধ্যে রেখে অন্য জাতিকে হেদায়াত করার জন্য জল–স্থলে সফর করে বেড়ানো তার জন্য শোভনীয় নয়। অনন্তর হকের আহ্বানকারীকে নিজ জাতির মধ্যে, দাওয়াত পেশ করার জন্য তাদের ভাষাকেই মাধ্যম বানানো উচিৎ। এটাই স্বভাব সুলভ এবং যুক্তিগ্রাহ্য পন্থা। যে ব্যক্তি এই পন্থার বিরোধিতা করে, সে আসল হকদারদের হক

নষ্ট করছে এবং নিজের কর্মক্ষমতাকে ধ্বংস করছে। এজন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। কোন ব্যক্তি যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করে, সে সেই জাতির মধ্যে যতটা সুন্দরভাবে কাজ করতে পারে, অন্য কোন জাতির মধ্যে ততটা সৌন্দর্যের সাথে কাজ করতে পারেনা। নিজের ভাষায় তার দাওয়াত যতটা শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী হতে পারে, অন্য ভাষায় তা হতে পারেনা। এজন্য ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি কর্মীর জন্য সঠিক কর্মপন্থা হচ্ছে এই যে, সে তার নিজ জাতির ভাষাকেই নিজের দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যম বানাবে। অন্য কোন জাতির ভাষা তার নিজের ভাষার তুলনায় যত অধিক উন্নত এবং ব্যাপকই হোকনা কেন, এই ভাষায় বক্তৃতা দিলে বা প্রবন্ধ রচনা করলে অধিক সংখ্যক লোকের কাছে তার মতামত পৌঁছার উপায়ই হোক না কেন এবং তা অধিক সম্মান ও সুখ্যাতি লাভ করার মাধ্যমই হোক না কেন –তার সেদিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করা উচিৎ নয়। হকের আহ্বাণকারীর সর্বপ্রথম বিবেচ্য বিষয় এটা নয় যে, সে যে দাওয়াত নিয়ে উঠেছে তা অপেক্ষাকৃত অধিক কান পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়ার উপায় কি হতে পারে। বরং তাকে সর্বপ্রথম দেখতে হবে, যে লোকের পথ প্রদর্শণ ও খেদমতের জন্য সে আল্লাহ এবং প্রকৃতির পক্ষ থেকে নিযুক্ত হয়েছে, তাদের অন্তরে প্রবেশ করার সবচেয়ে কার্যকর এবং নিকটতর উপায় কি হতে পারে। মাধ্যম যদি সংকীর্ন এবং সীমিত হয়ে থাকে এবং তা অবলম্বন করাতে তার ব্যক্তিত্ব, সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবুও সে এ দিকে ভ্রুক্ষেপ করবেনা। বরং এটাই সে গ্রহণ করবে। কেননা তার সামনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা অর্জণ করার এটাই হচ্ছে উপায়। যে কৃষকের ঝোলায় মাত্র কয়েকটি বীজ রয়েছে এবং সে তা নিজের ক্ষুদ্র জমি খন্ডেই বপন করতে চায়– বিরাট ভূস্বামীদের সাথে তার হিংসায় লিপ্ত হওয়া উচিৎ নয়। বরং তার ভাগে যে ক্ষুদ্র জমি খন্ড পড়েছে এর ওপরই তার দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিৎ। হযরত ঈসা মাসীহ (আ) বলেছেনঃ

> "আমার কাছে যে পরিমানন রুটি রয়েছে তা বাচ্চাদের জন্যই যথেষ্ট। আমি এগুলোকে কুকুরদের সামনে ঢেলে দিয়ে শিশুদের ক্ষুধার্ত রাখতে পারিনা।"

হযরত ঈসার (আঃ) এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে একদল লোক নির্বুদ্ধিতার শিকার হয়ে আপত্তি তুলেছে এবং এর ওপর (নাউযুবিল্লা) সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগীর অপবাদ আরোপ করেছে। অথচ তিনি যে কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ বাস্তব। প্রত্যেক ব্যক্তির কাজ করার একটি প্রাকৃতিক গন্ডী রয়েছে। সে যতক্ষণ নিজের যাবতীয় চেষ্টাসাধনা এই গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে, ততক্ষণই সঠিক এবং ফলপ্রসূ কাজ করতে সক্ষম হবে। যদি সে এই গন্ডী অতিক্রম করে নিজের হাত–পা ছুড়তে চেষ্টা করে তাহলে সে হয়ত

তাহলে সে হয়ত এই ভুলের শিকার হচ্ছে যে, তার অনুশীলনের ক্ষেত্র পূর্বের চেয়ে অনেক প্রশস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে সে নিজের শক্তি ও শ্রমকে বিনষ্ট করছে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্টঃ নবী–রসূল এবং হকের আহ্বাণকারীদের কথার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে এইযে, তাদের বক্তব্য হয়ে থাকে সুস্পষ্ট। সুস্পষ্ট বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে এই যে, আহ্বাণকারী নিজের সময়ে প্রচলিত কথ্য ভাষায় তার বক্তব্য পেশ করেন, যাতে তার সম্প্রদায়ের প্রতিটি লোকের কাছে তার বক্তব্য পৌঁছাতে সক্ষম হয়। তার ভাষা হয়ে থাকে অত্যন্ত মার্জিত পরিচ্ছন্ন এবং সৌন্দর্য মন্ডিত। তা অস্পষ্টও নয় এবং একেবারেই সংক্ষিপ্তও নয়। বিনা প্রয়োজনে তা দীর্ঘায়িত হয়না, রূপক ভাষায়ও ভারাক্রান্ত থাকেনা এবং তাতে উপমার আধিক্যও থাকেনা। জ্ঞানবুদ্ধিকে জটিলাতায় নিক্ষেপ করার মত রূপকের আধিক্য নেই, কঠিন এবং অপরিচিত শব্দে ভরপুর থাকেনা, বিশ্রি এবং ঘৃণ্য উক্তি থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে।

এর পরিবর্তে প্রাঞ্জল ভাষা, সরল সহজ উপমা, বাস্তব সত্যকে পরোক্ষভাবে উপস্থাপনকারী উপমা ও দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা হয়। উপরন্তু তাদের বক্তব্যে থাকে ক্রোধের পরিবর্তে আন্তরিকতা, কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা এবং কৃত্রিম অলংকরণের পরিবর্তে সরলতা এবং পরিচ্ছন্নতা। আহ্বাণকারী তার সমসাময়িক যুগে প্রচলিত বিভিন্ন পদ্ধতির (style) মধ্যে কেবল সেই পদ্ধতি গ্রহণ করে, যা গাম্ভীর্য, প্রভাবশালীতা এবং উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যার জন্য সবাধিক উপযোগী এবং উন্নত। নিজের উন্নত ব্যক্তিত্ব, দাওয়াতের কাজে উদ্যমশীলতা ও একাগ্রতা, ঈমান ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টিকারী জ্ঞান, উপরন্তু নিজের বক্তব্যকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার ঐকান্তিক আগ্রহ এই পদ্ধতিকে এতটা উন্নত করে তোলে যে, তার নিজেরই একটা নতুন স্টাইল সৃষ্টি হয়ে যায়। এবং তা অনুসরণ করার মত একটা নমুনা এবং দৃষ্টান্তের কাজ দিতে থাকে। এই পদ্ধতির আসল বৈশিষ্ট তার একাগ্রতা এবং হৃদয়ংগম করার যোগ্যতা। বরং এর সাথে সাথে তার গতিশীলতা ও একনিষ্ঠতার কারণে তার মধ্যে এমন সাহিত্যিক সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তার সামনে নামী দামী সাহিত্যেকদের কথাও সম্পূর্ণ নিষ্প্রান মনে হতে থাকে। তার প্রতিটি শব্দ থেকে ফোটায় ফোটায় রস ঝরতে থাকে তার প্রতিটি বাক্যের মধ্যে আত্মার খোরাক পাওয়া যায়। এর প্রভাবে শুধু কিছু সংখ্যক লোকেই নয়, বরং গোটা জাতির জীবন ধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। হকের আহ্বাণকারীর হাতে এটা এমন এক শক্তি, সজ্জিত সেনাবাহিনীও যার মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়।

একারণেই নবী–রসূলগণ বক্তব্য পেশ করার উপযুক্ত পন্থার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশের দীনের দাওয়াতের এই নির্বাচিত অবস্থার জন্য ভীত–সন্ত্রস্ত হতে হয় যে, এখানে যেসব লোক, অর্থাৎ আলেম সমাজ এই ফরজকে আঞ্জাম দিতে পারত, তারা হামেশা নিজেদের বক্র বিবৃতির জন্য বদনাম কুড়িয়ে আসছেন। প্রথমত এখানে যে ভাষা "জাতীয় ভাষা" হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছিল, আলেম সমাজ সেই ভাষায় লিখতে ও বলতে অক্ষম মনে হতে থাকে। দ্বিতীয়ত; যদিও তারা এই ভাষায় লেখা এবং কথা বলা শুরু করেছিল, তখন তা তাদের একটি বিশেষ ভাষায় পরিনত হল। এই ভাষা কঠিন, রসকষহীন এবং সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে সহজবোধ্য নয়। এমনকি কোন বই সম্পর্কে লোকদের মধ্যে বিরূপ ধারণা সৃষ্টির জন্য একটি কথাই যথেষ্ট যে, এভাষার বর্ণণাভংগী সম্পূর্ণ 'মৌলভীয়ানা।' এই অবস্থাটা ছিল একান্তই বিরক্তিকর। আরো দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই যে, আলেমগণ এই কঠিন ভাষার জন্য শুধু বদনামই কুড়ালো এবং যেসব লোক ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন, অথবা ধর্মবিরোধী ছিল–তারা 'জাতির ভাষা' দখল করে নিল। আর আজ পর্যন্ত এর ওপর প্রকাশ্যত তাদেরই দখল চলে আসছে।

তৃতীয় বৈশিষ্টঃ নবীদের এবং হকের আহ্বাণকারীদের বক্তব্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তাঁরা নিজেদের একই উদ্দেশ্যের দিকে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে এসে থাকেন। কুরআন মজীদের পরিভাষায় এটাকে 'তাসীরুল আয়াত' (আয়াতের অবস্থান্তর) বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ, যার কাছে দীনে দাওয়াত পেশ করা হয় তাকে বিভিন্ন পন্থায় এবং বিভিন্ন কায়দায় বুঝানোর চেষ্টা করা।

মীর আনীস মরহুমের ভাষায়ঃ

اک پھول کا مضموں ہو تو سو رنگ سے باندھوں

"একটি ফুলের বর্ণনা
ব্যক্ত করি শত শব্দে"

আহ্বানকারীর বক্তব্যের মধ্যে এই বিচিত্র বৈশিষ্ট বর্তমান থাকা তার আসল উদ্দেশ্য, অর্থাৎ বক্তব্যকে হৃদয়ংগম করানো এবং প্রমান চূড়ান্ত করার জন্য একান্ত প্রয়োজন। যে কথা এক পন্থায় বুঝে আসেনা, তা অন্য পন্থায় পেশ করা হলে এমন ভাবে মনের গভীরে বদ্ধমূল হয়ে যায়–যেন তা দাওয়াত কৃত ব্যক্তিরই মনের কথা। মানুষের বিচিত্র রুচি এবং স্বভাব–প্রকৃতির বিভিন্নমুখী ঝোঁক–প্রবণতার মত তার মন মস্তিষ্কের পরিমাপ ক্ষমতাও বিভিন্ন হয়ে থাকে। পরিবেশ পরিস্থিতির বিভিন্নতার

কারণে তার দৃষ্টিভংগীও পরিবর্তিত হতে থাকে। যে ব্যক্তি দাওয়াতকৃত ব্যক্তির অন্তরে কোন কথা জীবন যাপনের দিকদর্শনা হিসাবে বদ্ধমূল করার আগ্রহ পোষণ করে, সে তার মেধাশক্তির বিভিন্নতা এবং দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তনের দিকে খেয়াল রেখে বিভিন্ন দিক থেকে তার কাছে দাওয়াত পেশ করবে। সে যদি একই পথে এবং একই রংএ টার্গেটকৃত ব্যক্তির কাছে আসে তাহলে একজন আহ্বাণকারী হিসাবে সে তার উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। কেননা তার একদেশদর্শী নীতি নিরন্তর পরিবর্তনশীল এবং বিচিত্রমূখী স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে ব্যক্তি আহ্বাণকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যের ধরন এবং মানব প্রকৃতির এই অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয়, তার সামনে যখন দাওবাতী বক্তব্য আসে তখন সে ভ্রুকুঞ্চিত করে মন্তব্য করতে থাকে, বক্তব্য নিষ্প্রয়োজনে দীর্ঘ করা হয়েছে। একই কথা তার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, এটা অত্যন্ত বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর ইত্যাদি সে একথা চিন্তা করেন যে, একজন আহ্বাণকারীর কাজ একজন পন্ডিত সুলভ প্রবন্ধ রচনাকারীর তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নতর। প্রবন্ধকারের দৃষ্টি কেবল কয়েক ব্যক্তির সামনে নিজের মতামত প্রকাশ করার দিকেই নিবদ্ধ থাকে। অপরদিকে হকের আহ্বাণকারীকে বিচিত্র মেজাজ, বিচিত্র প্রকৃতি এবং বিভিন্নমূখী যোগ্যতার অধিকারী লোকদের মধ্যে নিজের বক্তব্য পেশ করার জন্য যত্নবান হতে হয়। প্রবন্ধকারের সাফল্যের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার বক্তব্যকে অতীব সুন্দর পন্থায় উপস্থাপন করতে পেরেছে। অপরদিকে হকের আহ্বাণকারীর সাফল্যের জন্য শর্ত হচ্ছে এই যে, শত্রুমিত্র সবাই সমস্বরে আওয়াজ তুলবে, তুমি দাওয়াত পৌঁছানোর হক আদায় করেছ।

وَكَذٰلِكَ نُصَرِّفُ الْاٰيَاتِ وَلِيَقُوْلُوْا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهٗ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

"এমনিভাবে আমরা দলীলসমূহ বিভিন্ন ঢংএ বর্ণনা করে থাকি যাতে তারা ভালভাবে বুঝে নিতে পারে এবং বলে উঠে, তুমি শুনিয়ে দেয়ার হক আদায় করেছ। আর যেসব লোক জ্ঞান অর্জন করার ইচ্ছা রাখে তাদের জন্যও আমরা দলীল সমূহ পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করে দেই।" (সূরা আনআম:১০৫)

চতুর্থ বৈশিষ্টঃ হকের আহ্বাণকারীদের বক্তব্যের চতুর্থ বৈশিষ্ট এই যে, তাদের বক্তব্য যেভাবে অকাট্য দলীল প্রমাণে সমৃদ্ধ থাকে, অনুরূপভাবে তা আবেগ ও উদ্দীপনায়ও ভরপুর থাকে। তারা নিরস দার্শনিকদের মত কেবল বুদ্ধিকেই সম্বোধন করেনা, বরং মানুষের উন্নত আবেগের কাছেও আবেদন জানায়। আবেগের কাছে আবেদন করা কোন খারাপ কাজ নয়। ক্ষতিকর যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা

হচ্ছে মানুষের পাশবিক আবেগের কাছে আবেদন করা। হক পন্থীগণ চিরকালই এ থেকে বিরত রয়েছেন। মানুষের মধ্যে আন্দোলন সৃষ্টিকারী আসল শক্তি তার জ্ঞান নয়,বরং আবেগ। একারণে হকের যে কোন আহ্বাণকারী যে জীবন ব্যবস্থা পরিবর্তন সাধনের দাওয়াত নিয়ে উঠেছে, অথবা জীবন–ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ঢালাই করে নতুন ভিত্তির ওপর কায়েম করতে চায়। মানুষের আবেগকে উত্তেজিত করা ছাড়া নিজের লক্ষ্য–পথে এক কদমও অগ্রসর হতে পারেনা। যেসব লোক নিজেদের এলমী গবেষনার অসাধারণত্ব এবং সৌন্দর্য বর্ণনা করে অন্যদের উৎফুল্ল করে দিতে এবং নিজেদের আত্মতৃপ্তি লাভকে জীবনের উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়েছে–সে এই আহ্বায়ক সুলভ রংকে দাবীদার সুলভ রং মনে করে থাকে। অথচ একজন আহ্বানকারীর বক্তব্যের মধ্যে যে জোশ ও জযবা পাওয়া যায় তা তার দাবীর ফলশ্রুতি নয়, বরং তা হয় তার অবিচল ঈমানের ফলশ্রুতি –যা তার হৃদয়ের মধ্যে উদ্বেলিত হতে থাকে, অথবা সেই সহানুভূতি ও একাগ্রতার প্রভাব যার প্রজ্বলিত শিখা তার বুকের মধ্যে দীপ্তিমান হয়ে আছে।

যে ব্যক্তি একজন আহ্বানকারীর বিশেষ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত নয় এবং শুধু কাগজ কলম নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে এটাকেও নিজের একটি ভিত্তির পেশা মনে করে বসে–সে যখন দেখতে পায় যে, তার বক্তব্য প্রবন্ধকারের বক্তব্যের মত নিষ্প্রাণ নয় বরং জীবিত এবং জীবনদায়ীনী–তখন তার আবেগকে তার অহংকার এবং দাবীর সাথে সংযুক্ত করে। অথচ এই ধারণা ঠীক নয়। আকার–আকৃতির মিল থাকা সত্বেও স্বভাব– প্রকৃতি ভিন্নতর হয়ে থাকে। প্রতিটি সাদা জিনিসকে চর্বিই হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাদকতা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে রেওয়ায়েতএসেছে।

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ (مسلم كتاب الجمعة) ـ

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ভাষন দিতেন, তাঁর চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করত, কণ্ঠস্বর গম্ভীর হয়ে যেত, আবেগ –উত্তেজনা বৃদ্ধি পেত। এমনকি মনে হত তিনি যেন কোন শত্রুবাহিনীর আসন্ন আক্রমন সম্পর্কে সাবধান করছেন। তিনি যেন বলছেন, তারা ভোরবেলা অথবা সন্ধ্যাবেলা তোমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়বে।"– (মুসলিম, কিতাব জুমআ)

একথা সুস্পষ্ট যে, তাঁর আত্মবিশ্বাস এবং জাতির প্রতি তাঁর সহানুভূতি সুলভ আবেগ থেকেই তাঁর বক্তব্যের মধ্যে এই উষ্ণতা সৃষ্টি হত। সত্যিকার অর্থে প্রতিটি আহ্বানকারীর মধ্যে এ ধরণের অবস্থা প্রভাবশীল হতে পারে। এতে সন্দেহ নেই যে, কতিপয় লোক সম্পূর্ন কৃত্রিম উপায়ে আবেগ–উত্তেজনার প্রদর্শনি করতে পারে। বরং কোন কোন সময় সে বাজে কথা ও অর্থহীন প্রলাপও বকতে পারে। কিন্তু সেজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিই যে এরূপ তা নয়। যারা মিথ্যাবাদী তারা খুব বেশী দিন নিজেদের মিথ্যাকে ধামাচাপা দিয়ে রাখতে পারেনা। কালের প্রবাহ খাঁটি এবং অখাঁটির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেই ছাড়ে। কাক আর কতদিন কৃত্রিম পালকে ময়ূর সেজে নিজের আসল পরিচয় গোপন রাখতে পারে?

পঞ্চম বৈশিষ্টঃ হকের আহ্বানকারীদের বক্তব্যের পঞ্চম বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তাদের বক্তব্যের রং এক এবং এর মধ্যে রয়েছে উদ্দেশের ঐক্য। তারা নিজেদের তুণীরের প্রতিটি তীর একই লক্ষ্যের ওপর নিক্ষেপ করে। পেশাদার লেখক এবং বক্তাদের মত তাদের অবস্থা এই নয় যে, ইচ্ছা করলে যে কোন মঞ্চে তাদের দিয়ে বক্তৃতা করিয়ে নেয়া যাবে, যে বিষয়বস্তুর ওপর ইচ্ছা প্রবন্ধ রচনা করিয়ে নেয়া যাবে এবং যে কোন সভারই সভাপতির কাজ করিয়ে নেয়া যাবে। তারা নিজেদের প্রতিটি শব্দ এবং বাক্যকে আল্লাহর দেয়া আমানত মনে করে। তা তার নির্দিষ্ট খাত ছাড়া অন্য কোথাও ব্যয় করেনা। তাদের পতিটি লেখা এবং বক্তব্যেব মধ্যে একই প্রতিধ্বণি শুনা যাবে। অন্য বিষয়বস্তু যতই চিত্তাকর্ষক হোক না কেন, তার ওপর বক্তৃতা ও প্রবন্ধ রচনা করে যত বড় সম্মান এবং সুখ্যাতি লাভের সুযোগ থাকনা কেন, বাহ্যত তার মধ্যে ধর্মীয় এবং জাতীয় স্বার্থের কোন দিক দৃষ্টি গোচরই হোক না কেন –কিন্তু তারা কোন অপ্রাসংগিক অথবা আনুষংগিক বিষয়ের ওপর নিজেদের মুখ এবং কলমের শক্তি অপচয় করেনা। এ জিনিসটিকে কুরআন মজীদে فى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ("প্রতিটি প্রান্তরে বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে মরে"–সূরা শুআরাঃ ২২৫) বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং নবী–রসূল ও নেককার লোকদের এ থেকে মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। দুনিয়ার গোটা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এই দুনিয়ায় যদি ভাল অথবা মন্দ যে কোন ধরনের বিপ্লব সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে সেই লোকদের কলম ও মুখের দ্বারাই তা সাধিত হয়েছে–যারা নিজেদের সমস্ত শক্তি কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যের জন্য ব্যয় করেছে। তারা কখনো উদ্দেশ্যহীন ভাবে শূণ্যগর্ভে তীর নিক্ষেপ করেনি।

ষষ্ঠ বৈশিষ্টঃ নবী–রসূল ও হকের আহ্বানকারীদের বক্তব্যের ষষ্ঠ বৈশিষ্ট এই ছিল যে, তারা নিজেদের বক্তব্যকে এমন প্রতিটি জিনিস থেকে পাক রাখতেন যা

শ্রোতার মধ্যে হঠকারীতা এবং বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে। কেননা এটা তাদের উদ্দেশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যেমন, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে আলাপ-আলোচনা করার সময় নিজের শ্রেষ্ঠত্বও প্রকাশ করবেনা এবং প্রতিপক্ষের ভ্রান্ত জীবন ব্যবস্থাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য বল্গাহীন সমালোচনাও করবেনা। বরং যা কিছু বলবে নম্রতা ও সহানুভূতির সাথে বলবে।

اذْهَبَا الِى فِرْعَوْنَ انَّهُ طَغٰى فَقُوْلاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى- (طه ٤٤- ٤٣)

"তোমরা দুজনে ফিরাউনের নিকট যাও। কেননা সে অহংকারী –বিদ্রোহী হয়ে গেছে। তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। সম্ভবত সে নসীহত কবুল করতে কিংবা ভয় পেতে পারে।" (সূরা তাহাঃ ৪৩-৪৪)

অনুরূপভাবে তাঁরা নিজেদের মুখ দিয়ে এমন কথা বের করেননা যার দ্বারা আহ্বানকৃত ব্যক্তির ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে যুক্তি প্রমানের মাধ্যমে তার ভ্রান্ত ধারণার জোরালো প্রতিবাদ করেন ঠিকই, কিন্তু অযথা অসৌজন্যমূলক শব্দ ব্যবহার করে নিজের হাতেই নিজের উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন না।

وَلاَ تَسُبُّو الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ - (انعام ١٠٨)

"(হে ঈমানদার লোকেরা) এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করে তোমরা তাদের গালি দিওনা। কারণ তারা মূর্খতা বশত শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহকে গালি দিয়ে বসতে পারে।"-(সূরা আনআমঃ১০৮)

আহ্বানকৃত ব্যক্তির অভদ্র ব্যবহার ও কর্কশ ভাষার জবাব তাঁরা সুমধুর বাক্যে দিয়ে থাকেন। কেননা এটাই হচ্ছে হকের আহ্বানকারীর জন্য টার্গেটকৃত ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ করার পথ।

وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِى هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ وَمَا يُلَقّٰهَا الاَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا الاَّ ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

"ভাল এবং মন্দ সামান হতে পারেনা। তোমরা উত্তম জিনিসের মাধ্যমে মন্দকে দূরীভূত কর। তোমরা দেখতে পাবে যে, তোমাদের সাথে যাদের শত্রুতা ছিল তারা প্রাণের বন্ধু হয়ে গেছে। এই গুণ কেবল তাদের ভাগ্যেই জুটে থাকে যারা ধৈর্য ধারণ করে। এই মর্যাদা কেবল তারাই লাভ করতে পারে যারা বড়ই ভাগ্যবান। তোমরা যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন রূপ প্ররোচনা অনুভব করতে পারো, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তিনি সবকিছু শুনেন এবং জানেন।"–(সূরাহা–মীম সিজদাঃ৩৪–৩৬)

তাঁরা বিতর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে সবসময়ই দূরে থাকতেন। এমনকি আহ্বানকৃত ব্যক্তি সম্পর্কে যদি অনুমান হয়ে যায় যে, সে বিতর্কে জড়াতে চায়, তাহলে হকের আহ্বানকারী আসসালামু আলাইকুম বলে সেখান থেকে সরে পড়তেন। কেননা বিতর্কযুদ্ধ এবং হকের দাওয়াতের মধ্যে বৈপরিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।

فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْاَمْرِ وَادْعُ اِلَى رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ – وَاِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ – اَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (٦٧–حج) ـ

"অতএব তারা যেন এ ব্যাপারে তোমার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত না হয়। তুমি তোমার প্রভুর দিকে দাওয়াত দাও। নিসন্দেহে তুমিই সঠিক পথে রয়েছ। তারা যদি তোমার সাথে ঝগড়া করে তবে তুমি বলে দাও, তোমরা যা কিছু করছ তা আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন। তোমরা যেসব বিষয় নিয়ে পরস্পরের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হচ্ছ–আল্লাহ কিয়ামতের দিন সেসব বিষয়ে তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন"–(সূরা হজ্জঃ৬৭–৬৯)

যদি কখনো তারা বিতর্কে লিপ্ত হন, তাহলে উত্তম এবং মার্জিত পন্থায়। অর্থাৎ নিজের এবং দাওয়াতকৃত ব্যক্তির মধ্যে যেসব বিষয়ে ঐক্যমত রয়েছে–তা অনুসন্ধান করে বের করে তার অবশ্যম্ভাবী পরিনতির দিকে দাওয়াত দেন।

وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا اٰمَنَّا بِالَّذِي اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ *(عنكبوت –٤٦) ـ

"আর উত্তম রীতি ও পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করনা–সেই লোকদের ছাড়া যারা তাদের মধ্যে যালেম। তাদেরকে বল, আমরা ঈমান এনেছি সেই জিনিসের ওপর যা আমাদের কাছে নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমাদের ওপর নাযিল করা হয়েছে। আমাদের ইলাহ এবং তোমাদের ইলাহ একই এবং আমরা তাঁরই অনুগত।"–(সূরা আনকাবুতঃ ৪৬)

সপ্তম বৈশিষ্টঃ হকের আহ্বানকারীর বক্তব্যের সপ্তম বৈশিষ্ট হচ্ছে–তিনি শব্দ এবং অর্থ দীর্ঘতা, সংক্ষিপ্ততা, প্রকাশভংগী ইত্যাদির ক্ষেত্রে শ্রোতার মনমানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলে। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সুসংবাদ দাও, লোকদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করনা।" অনুরূপভাবে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, "যখন উপদেশ দেবে, বক্তব্য সংক্ষেপ করবে।" তিনি সংক্ষেপে বক্তব্য উপস্থাপন করার যোগ্যতাকে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলে অভিহিত করেছেন।

يَقُولُ اِنَّ طَولُ صَلَوةِ الرَّجُلِ وَقَصرَ خُطبَتِه فَانَّهُ مِن فِقهِه فَاَطِيلُوا الصَّلوةَ وَاقصَرُو الخُطبَةَ وَاِنَّ مِنَ البيَانِ لَسِحرًا

"তিনি বলতেন, কোন ব্যক্তির নামায দীর্ঘ হওয়া এবং ভাষণ সংক্ষিপ্ত হওয়াটা তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে। অতএব নামায দীর্ঘ কর এবং বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত কর। কোন কোন বক্তৃতায় যাদুকরী প্রভাব রয়েছে।"
–(মুসলিম কিতাবুল জুমআ)

শ্রোতা যদি স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী হয় অথবা কথা যদি সূক্ষ্ম হয় তাহলে কথার পুনরাবৃত্তি করতে হবে যাতে শ্রোতা ভালভাবে তা শুনতে পারে এবং বুঝতে পারে।

كان النبى صلى الله عَليه وسلم اذا تكلم بكلمة اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه ـ

"নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন কথা বলতেন–তিনবার তার পুনরাবৃত্তি করতেন–যাতে লোকেরা ভালভাবে বুঝতে পারে।"

৯

আম্বিয়ায়ে কেরামের যুক্তি–পদ্ধতি

নবী–রসূল এবং হকের আহ্বানকারীগণ যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আসেন তা হচ্ছে ঈমানের দাওয়াত। ঈমান কোন নীতিবাচক জিনিস নয়, বরং একটি ইতিবাচক সত্য। এর আসল উপকারিতা কেবল তখনই অর্জন করা যায় যখন তা পূর্ণরূপে এবং দৃঢ়ভাবে হৃদয়ের মধ্যে বসে যায়। ঈমানের এই দৃঢ়তা সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হচ্ছে–তার ভিত্তি অবশ্যই মজবুত দলীলের ওপর হতে হবে। ঈমানের মধ্যে মজবুতী না থাকলে তা জীবনের জন্য কোন অনুপ্রেরণাদায়ক বস্তুও হতে পারে না, এর দারা দীনের বিশ্বাসগত এবং কর্মগত যাবতীয় দিকগুলোও বাস্তবায়িত হতে পারেনা এবং তা জীবনের প্রশস্ত কর্মক্ষেত্রে মানুষের তত্ত্বাবধানও করতে পারেনা। এ কারণে হকের আহ্বানকারীদের কাজ কেবল শক্তি প্রয়োগেও চলতে পারেনা, প্রতারণার মাধ্যমেও তারা নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনা, দলিলেও তাদের কোন কাজে আসতে পারেনা, কবিসুলভ এবং বক্তাসুলভ যে যুক্তি স্বভাব–প্রকৃতি এবং বোধশক্তির মধ্যে নিজের কোন ভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম নয়–তাও তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ কারতে পারে না।

শ্রোতাকে নিরুত্তর করে দিয়ে অথবা তাকে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করে যারা নিজেদের লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, উল্লেখিত ধরনের যুক্তির মাধ্যমে কেবল তারাই নিজেদের কাজ চালাতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রোতাকে নিরুত্তর করে দিতে চায়না বরং তার সার্বিক শক্তি এবং যোগ্যতাকে সঠিক রাস্তায় চলার জন্য সজাগ করে দিতে চায়, সে লোকদেরকে যাদু করে অথবা প্রভাবিত করে কোন রাস্তায় হাঁকিয়ে দিতে চায়না, বরং তাদের স্বভাব–প্রকৃতি এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাকে এমনভাবে জাগ্রত করে তুলতে চায় যে, কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থায়ও প্রতিটি ব্যক্তি নিজেকে সিরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত করতে সক্ষম হয়–সে প্রথমত এই ধরনের দলীল–প্রমাণের ওপর হাতই লাগায়না, যদিও বা লাগায় তাহলে সে সবসময় দৃষ্টি রাখে যে, একটি পবিত্র এবং উন্নত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তার উপায়–উপকরণও অতীব পাক এবং উন্নত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই জিনিসটিই আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং হকের আহ্বানকারীদের যুক্তির পদ্ধতিকে অন্যান্যদের যুক্তির পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। এর কতিপয় সুস্পষ্ট বৈশিষ্টের দিকে আমরা এখানে ইংগিত করব।

যুক্তির সাধারণত্ব

যুক্তি এবং দলীল-প্রমান বাতাস এবং পানির মত একটি সাধারণ প্রয়োজনীয় জিনিস। প্রতিটি মানুষ সঠিক পন্থায় জীবন যাপন করার জন্য ঈমানের মুখাপেক্ষী। মজবুত ঈমান শক্তিশালী দলীল ছাড়া অর্জিত হতে পারেনা। এজন্য দলীল-প্রমাণের জন্য দুটি জিনিসের প্রয়োজন।

এক, দলীল-প্রমাণের পদ্ধতি এতটা স্বভাব-সুলভ এবং সহজ-সরল হতে হবে যে, প্রতিটি ব্যক্তি যেভাবে নিজের প্রয়োজন মাফিক যমীন এবং শূণ্যলোকের সম্পদ আবহাওয়া থেকে বাতাস এবং পানি সংগ্রহ করতে পারে এবং এতে তার কোন বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়না, অনুরূপভাবে প্রতিটি ব্যক্তি যমীন ও আসমানের নিদর্শন সমূহ থেকে নিজের হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য যত পরিমাণ ইচ্ছা দলীল-প্রমাণ খুজে নেবে এবং এ প্রসংগে তাকে চিন্তা-গবেষণা ছাড়া অন্য কোন জিনিসের মুখাপেক্ষী হতে হবে না।

দুই, মানুষের শারীরিক সুস্থতার জন্য যেভাবে তার পানের পানি নির্মল হওয়া এবং যে বাতাসে সে নিঃশ্বাস নিচ্ছে তা বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, অনুরূপভাবে তার বুদ্ধিবৃত্তিক সুস্থতার জন্য সে যে দলীল থেকে জীবন যাপনের মুলনীতি লাভ করছে তা সম্পূর্ণ নির্ভেজাল এবং পাক হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

এই দুটি জিনিস অর্জন করার জন্য আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং হকের আহ্বানকারীগণের পন্থা এই ছিল যে, তাঁরা এক দিকে যুক্তিপ্রমানের কৃত্রিম পন্থা থেকে দূরে থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র পন্থা বের করে নিয়েছেন। কোন জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে উন্নত হয়ে গেলে তাদের মধ্যে দলীল-প্রমাণের যে কৃত্রিম পন্থা সৃষ্টি হয় এবং একটি বিশেষ পেশাদার গোষ্ঠী ছাড়া অন্যরা তা থেকে কোন ফায়দা উঠাতে পারেনা, নবীগণ এবং হকের আহ্বানকারীগণ এধরনের কৃত্রিম পন্থা থেকে দূরে থেকেছেন। অপরদিকে যেসব জিনিস দলীল-প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাঁরা এগুলোর মূল্যায়ন করেছেন। এর মধ্যে যেগুলো অবাস্তব জিনিসের সংমিশ্রন থেকে মুক্ত প্রমাণিত হয়েছে, কেবল সে-গুলোকে তাঁরা দলীল-প্রমাণের কাজে ব্যবহার করার জন্য বেছে নিয়েছেন।

এই ধরনের প্রমাণ পদ্ধতির প্রথম উপকারিতা হচ্ছে এই যে, ইতিপূর্বে মানব জাতির এক বিরাট সংখ্যক লোককে সম্পূর্ণ অন্ধ-বধিরের মত হাতে গোনা কয়েকটি লোকের পেছনে ছুটে বেড়াতে হত, তারা অচিরেই নিজেদের চোখে দেখতে এবং নিজেদের কানে শুনতে সক্ষম হয়ে গেল। এর দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে এই যে,

এ পর্যন্ত দলীল–প্রমাণের ভেজাল মিশ্রিত যে স্তুপ গলাধকরণ করার ফলে হৃদয় এবং আত্মার ওপর মৃত্যুর যে লক্ষণ বিরাজ করছিল, দলীল–প্রমাণের এই নির্ভেজাল ভান্ডারের কয়েক গ্রাস কণ্ঠনালী অতিক্রম করার সাথে সাথে মৃত্যুর সেই লক্ষণ দূর হয়ে যায় এবং ভোজনকারী নিজেকে সম্পর্ণ সুস্থ, সতেজ এবং সক্রিয় অনুভব করতে থাকে।

হকের আহ্বানকারী এবং আম্বিয়ায়ে কেরামদের প্রমাণ–পদ্ধতির এই বৈশিষ্টের কারণেই মানব জ্ঞান তাদের যুগে পার্শ পরিবর্তন করে এবং প্রতিটি স্তরে একটি সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি জাগরণ দেখা দেয়। এমনকি এই সাধারণ স্তরে একটা গতির সৃষ্টি হয়ে যায়, যেখান থেকে কোন ভাল সংবাদ কখনো আশা করা যেতনা। প্রতিটি স্তরে সমালোচনা ও যাচাই বাছাইয়ের দৃষ্টি খুলে যায়। প্রতিটি চোখ দেখতে এবং প্রতিটি মুখ বলতে শরু করে দেয়। চিন্তা–গবেষণা ও দলীল প্রমাণের যে সব পদ্ধতি তখন পর্যন্ত অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল তা ক্ষয়প্রাপ্ত এবং অতি সেকেলে মনে হতে থাকে। অনেক মতবাদ যা অহী এবং ইলহামের মর্যাদাকে দখল করে নিয়েছিল তা সম্পূর্ণ মূল্যহীন এবং গুরুত্বহীন হয়ে যায়। যেসব লোক নিজেদের পুরাতন মতবাদকে হকের চেয়েও অধিক প্রিয় মনে করত তাদের কাছে এই মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক বিপ্লব অসহনীয় ঠেকল। তাই তারা এটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে যেতে থাকল। কিন্তু তাদের আন্দোলনকে কখনো প্রতিরোধ করাও যায় না এবং একে প্রতিরোধ করাও ঠিক নয়। অবশ্য যে জিনিসটির প্রতি নজর রাখা জরুরী তা হচ্ছে, যে মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা সৃষ্টি হয়েছে তা যেন সঠিক খাতে প্রবাহিত হতে পারে। তার মধ্যে যেন ভারসাম্যহীনতা এবং বল্গাহীনতা সৃষ্টি হতে না পারে। এ দায়িত্ব সম্পর্কে হকের আহ্বানকরী যেন ভালভাবেই সর্তক থাকে। তারা সব সময় খেয়াল রাখে যে, জনগণকে তার চিন্তার যে স্বাধীনাতা দান করছে তা যেন তাদের জন্য মুক্তির উপায় হয়, ধ্বংসের কারণ না হয়।

শ্রোতার মধ্যে সঠিক চিন্তার বীজ বপন

আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং হকের আহ্বানকরীদের যুক্তি–পদ্ধতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তারা কেবল দলীল–প্রমান পেশ করেই ক্ষান্ত হননা, বরং শ্রোতার মধ্যেও দলীল–প্রমান উপস্থাপনা করার যোগ্যতা সৃষ্টি করেন। তারা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে যে সর্বাত্মক বিপ্লবের আহ্বান নিয়ে আগমন করেন, তা যতক্ষণ মানুষের চিন্তাগত এবং মতাদর্শগত যোগ্যতাকে পূর্ণরূপে জাগ্রত করতে না পারবে, ততক্ষণ এই বিপ্লব স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা। জীবনটা কোন

বিচ্ছিন্ন বা অবিমিশ্র জিনিস নয় যে, তাকে সঠিক ভাবে পরিচালিত করার জন্য হাতে গোনা কয়েকটি মূলনীতি শিখিয়ে দিলেই যথেষ্ট হতে পারে। জীবনটা হচ্ছে অসংখ্য প্রকাশ্য ও গোপন দাবীর সমষ্টি, অসংখ্য ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সংযোগ–সম্পর্কের বন্ধন, বেশুমার ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সমষ্টিগত অধিকার ও কর্তব্যের একটি ভান্ডার। জীবনের প্রতিটি দিক আমাদের দৃষ্টির সামনে পূর্ণরূপে বর্তমান থাকেনা। এজন্য প্রতিটি লোককে তার প্রতিটি কাজের জন্য পাকড়াও করাও সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের আলোকে তার প্রতিটি অবস্থার জন্য পূর্ব থেকে একটি করে হুকুমও নির্দিষ্ট নেই। বরং তার অতীত এবং ভবিষ্যৎ উভয়ই অদৃশ্যের অন্তরালে লুকিয়ে আছে। কেবল সামান্যই তার সামনে আছে, যার ইংগিতের ওপর নির্ভর করে তার অতীতকেও বুঝতে হয় এবং এর আলোকেই তার ভবিষ্যৎকেও নির্ধারণ করতে হয়। এই অবস্থায় জীবনের পথ প্রদর্শনের জন্য আইন–বিধানের কেবল নির্ধারিত এবং সীমিত ব্যবস্থাই যথেষ্ঠ হতে পারেনা। বরং এই আইন ব্যবস্থার সাথে সাথে মানুষের মধ্যে সুষ্ঠু চিন্তার এমন একটি অনির্বান শিখাও থাকা অত্যাবশ্যক যা জীবনের এই গোপন অংশও তার পথ প্রদর্শন করতে পারে–যেখানে পথনির্দেশনা লাভ করার মত অন্য কোন ব্যবস্থা তার কাছে নেই। নবী–রসূল এবং হকের আহ্বানকারীদের যুক্তি–প্রমাণ উপস্থাপন করার পদ্ধতি থেকেই শ্রোতার মধ্যে এই সুষ্ঠু চিন্তার যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। নবীগণ যখন তাদের মৌলিক বিষয়ের শিক্ষাদান শুরু করেন, তখন তা শিক্ষার্থীর মধ্যে এমনভাবে প্রবিষ্ট করেন যে, সুষ্ঠু চিন্তার বীজ বপনের জন্য অন্তর এবং আত্মার মধ্যে যমীন সমতল হয়ে যায় এবং তার বীজও অংকুরিত হয়ে যায়। এমনকি তারা যখন নিজেদের কাজ থেকে অবসর হন, তখন একদিকে শরীআতের একটি সবুজ–শ্যামল বাগান দৃষ্টিগোচর হয়, অপর দিকে প্রতিটি সুস্থ আত্মার মধ্যে হিকমত ও প্রজ্ঞার একটি উদ্যান রচিত হয়ে যায়। তা যদিও দৃষ্টির সামনে উপস্থিত থাকেনা কিন্তু তার বসন্তকাল সব সময় বিরাজিত থাকে এবং তার শাখা–প্রশাখা সব ঋতুতেই ফলে পরিপূর্ণ থাকে।

নবীদের মূল শিক্ষার মোকাবিলায় এটাকে আনুসংগিক চাষাবাদ ও উপজাত (By-Product) বলা যেতে পারে। কিন্তু নিজের মর্যাদা ও মূল্য এবং অপরিসীম উপকারিতার দিক থেকে তা আসলের সমান স্থান লাভ করে। এদিকে ইংগিত করেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

"জেনে রাখ আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং কুরআনের সাথে এর অনুরূপ আরো একটি জিনিস।" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারেমী)

এটা হচ্ছে সেই কল্যাণময় বৃক্ষের ফুল এবং ফল যা আমরা হাদীসের আকারে পেয়েছি। এই সেই জিনিস, যেদিকে কুরআন মজীদ ইংগিত করেছে-"যে ব্যক্তি এই জিনিস লাভ করতে পেরেছে সে কল্যাণের অফুরন্ত ভান্ডার লাভ করেছে।" এটাকে কোন কোন হাদীসে এমন ভান্ডারের সাথে তুলনা করা হয়েছে যা কখনো শেষ হবার নয়।

তর্ক—শাস্ত্রের কায়দায় দলীল পেশ

এই সৃজনশীল বৈশিষ্ট কেবল আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং হকপন্থীদের প্রমাণ-পদ্ধতির সাথেই নির্দিষ্ট। কোন তার্কিক অথবা কালাম শাস্ত্রবিদের যুক্তি-প্রমাণের মধ্যে এই বৈশিষ্ট খুজে পাওয়া যাবেনা। আমাদের আলেম সমাজ মানতেকী পন্থায় যুক্তি-প্রমাণকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু মানতেকী পন্থায় যুক্তি-প্রমাণ এদিক থেকে সর্বাধিক ত্রুটিপূর্ণ। মানতেককে সর্বাধিক যতটুকু সম্মান দেয়া যেতে পারে তা হচ্ছে এই যে, কোন যুক্তিকে নিজের কষ্টিপাথরে যাচাই করে সে বলতে পারে যে, তা সঠিক কি না। যুক্তি উপস্থাপনের যোগ্যতা সৃষ্টি করা তর্কশাস্ত্রের ক্ষমতার বাইরে। একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই তর্কশাস্ত্রের দ্বারা এ কাজ নেয়া যেতে পারে। কুরআন মজীদ এবং নবীদের বক্তব্যের মধ্যে হালকা প্রকৃতির যুক্তি-প্রমাণও পাওয়া যায়-যাকে তর্কশাস্ত্রের তুলাদন্ডে হিরার মধ্যেমে ওজন করা যায়না। কিন্তু আমাদের কালাম শাস্ত্রবিদদের মধ্যে যারা তর্কশাস্ত্রকে তার প্রাপ্যের অধিক মর্যাদা দিয়েছেন, তারা কয়লা মাপার এই তুলাদন্ডে কুরআনের স্বর্ণমুদ্রাকেও ওজন করতে চাইল। ফলে তার এই স্বর্ণমুদ্রাকে কয়লার চেয়েও কম মূল্যবান সাব্যস্ত করে বসল।

এখন থাকল দার্শনিকদের প্রসংগ। এতে সন্দেহ নেই যে, তারা অবশ্যই মানবীয় চিন্তাকে এমন ভাবে প্রশিক্ষণ দেন যাতে তা যুক্তি প্রমাণ উদ্ভাবন ও উপস্থাপন করার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তেজস্বিতা প্রদর্শন করতে পারে। কিন্তু তারা নিজেদের যুক্তি-প্রমাণের বিষয়বস্তু, যুক্তি পেশের পদ্ধতি এবং যুক্তির উপায়-উপকরণ-তিনটি জিনিসকেই আদ্র-শুষ্কের সমষ্টিতে পরিণত করে রেখেছে। একারণে তাদের পন্থায় চিন্তা করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। তাদের পথনির্দেশনায় লোকেরা যদি সঠিক রাস্তায় কয়েক কদম অগ্রসর হতেও পারে, তাহলে সাথে সাথে ভ্রান্ত পথেও কয়েক কদম অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, মানুষের গোটা জীবন বিভিন্ন প্রান্তরে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরপাক খেতে এবং আন্দাজ-

আনুমানের তীর নিক্ষেপ করতে করতে শেষ হয়ে যায়। কতিপয় পরস্পর বিরোধী জটিল চিন্তা ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছুই জোটেনা। এ ব্যাপারে প্রাচীন দর্শন এবং আধুনিক দর্শন উভয়ের অবস্থাই এক। সবাইর চিন্তার মূলনীতিতে রয়েছে জটিলতা এবং প্রত্যেকের চিন্তার ফলাফলের মধ্যে বিরাজ করছে অস্থিরতা। আর এখন বিজ্ঞানের উন্নতি সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু পরীক্ষা-নিরিক্ষা ও পর্যবেক্ষনের ওপর স্থাপন করেছে এবং মানুষ এই বোকামীর শিকার হয়ে পড়েছে যে, সে তার চর্মচোখে কোন জিনিস না দেখে তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, মানুষের একটি কদমও সহজ সরল পথে পতিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই আর বাকি থাকলনা। বর্তমানকাল পর্যন্ত যেসব মূলনীতির ওপর দর্শনের ভিত্তি স্থাপিত ছিল তার কতিপয় মূলনীতি ভ্রান্ত হলেও কতিপয় সঠিক ছিল। একারণে তার অস্থির স্বপ্নগুলোর মধ্যে কতগুলো সত্য স্বপ্নও বেরিয়ে আসত। এক্ষেত্রে মানুষের জন্য কেবল সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার সমস্যাই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এখনতো গোটা অবলম্বনই ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পর্যবেক্ষণের ওপর রয়ে গেল। আর ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পর্যবেক্ষণের ব্যাপকতা যে কতটুকু তা জানাই আছে। এই জড়বাদী দর্শন ছাড়া আজ যদি দর্শনের নামে কোন জিনিস বর্তমান থাকে তাহলে তা সংশয়বাদীদের দর্শণই রয়েছে। এর গোটা ভিত্তি ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রজ্ঞার অনির্ভরযোগ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। পরিষ্কার কথা হচ্ছে এটা কোন দর্শনই নয়, বরং সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং দর্শনকে তা সম্পূর্ণরূপে নীতিবাচক করে দিচ্ছে। দুনিয়া তার কাছ থেকে অস্থিরতা ছাড়া আর কিছুই পায়নি।

নবীদের যুক্তিপ্রমান পদ্ধতি তর্কশাস্ত্রবিদদের পদ্ধতির মত বন্ধ্যাও ছিলনা এবং দর্শন শাস্ত্রবিদদের পদ্ধতির মত অস্থির প্রকৃতিরও ছিলনা। বরং তারা মানবীয় চিন্তাকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেন যে, তা নিজে নিজেই সঠিক পথে অগ্রসর হতে থাকে এবং মঞ্জিলে-মকছুদের নির্ধারণ তার মধ্যে এমন আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি করে যে, সে যে পথ অনুসরন করছে তা সঠিক এবং নির্ভুল। তাঁরা প্রথমে স্বীকৃত দলীল-প্রমাণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অর্থাৎ উম্মুক্ত ও বিস্তৃত মহাশূণ্য এবং মানুষের নিজের মধ্যে নিহিত প্রমাণ সমূহের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করনে। মহাশূণ্য বলতে বিশ্ব-ব্যবস্থাপনার নিদর্শনসমূহ এবং আইন-বিধানকে বুঝানো হয়েছে যা প্রতিটি মানুষ সাধারণভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই উপলব্ধি করতে পারে। মানুষের নিজের মধ্যেকার প্রমান বলতে সে যে শক্তি, যোগ্যতা, ও ক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের অধিকারী তার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এগুলো প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজের মধ্যে দেখতে পায় এবং অনুভব করতে পারে। নবীগণ এসব নিদর্শণের প্রতি অংগুলি নির্দেশ করেন এবং এর অবশ্যম্ভাবী

পরিণতিকে সামনে তুলে ধরেণ। এই প্রমানের মাধ্যমে কখনো পুরা বক্তব্য দিবালোকের মত উদ্ভাসিত হয়ে সামনে এসে যায়। আবার কখনো প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে শুধু ইশারা করেই ছেড়ে দেয়া হয়, যাতে দাওয়াতকৃত ব্যক্তি নিজেই পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে পারে।

এর একটি উপকারিতা হচ্ছে এই যে, দাওয়াতকৃত ব্যক্তির মধ্যে সঠিক ফলাফল নির্ণয়ের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়ে যায়, যা তার জীবনের পরিভ্রমন পথের প্রতিটি মঞ্জিলে তার উপকারে আসে। এর দ্বিতীয় উপকারিতা হচ্ছে এই যে, সে দাওয়াতকে অন্যের বক্তব্য মনে করে সাথে সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেনা। বরং এটাকে নিজের চিন্তার ফল মনে করে তা গ্রহণ করার দিকে অগ্রসর হয়। তৃতীয় উপকারিতা হচ্ছে এই যে, এই পন্থায় সম্বোধনকারী এবং সম্বোধিত ব্যক্তির মাঝে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক সৃষ্টি না হয়ে বরং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ফলে সম্বোধিত ব্যক্তির মাঝে এইরূপ হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি হতে পারেনা যে, সে অন্যের হাত ধরে ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছেছে। বরং সে চিন্তা করে, আমাদের উভয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই সঠিক ফলাফল পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব হয়েছে।

একথা খুলে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানুষের মধ্যে বিরাজিত নিদর্শণসমূহ থেকে যুক্তিপ্রমান পেশ করার পদ্ধতিই মানুষের স্বভাবে-প্রকৃতির সাথে সবচেয়ে বেশী সামঞ্জস্যশীল। এজন্য নবী-রসূল এবং হকের আহ্বানকারীগণ এই পদ্ধতিই বেশী অনুসরণ করতেন। মানুষ যখন উম্মুক্ত বিশ্বচরাচরে কোন জিনিস পর্যবেক্ষণ করে অথবা তার নিজের স্বভাবের মাঝে এ সম্পর্কে আত্মপ্রত্যয় অনুভব করে, তখন তার অবশ্যম্ভাবী ফলাফলকে সে অস্বীকার করতে পারেনা। তবে শর্ত হচ্ছে এসব প্রমান সঠিক ক্রমানুসারে তার সামনে উপাস্থাপন করতে হবে। এরপর সে যদি তা অস্বীকার করে তাহলে কেবল মুখেই অস্বীকার করতে পারবে, কিন্তু তার অন্তর এই অস্বীকৃতির সমর্থন করবে। যদি সে হঠকারী এবং একগুয়ে হয়ে থাকে তাহলেই কেবল এই অস্বীকৃতির ওপর অটল থাকতে পরে। কোন জিনিসের অবশ্যম্ভাবী ফলাফলের অর্থ হচ্ছে। বিষয়টি পূর্বে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, এখন তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হচ্ছে। কোন ব্যক্তির মধ্যে সত্যের অনুসরণ এবং সমর্থনের সামান্যতম যোগ্যতা বাকি থাকলেও তার সম্পর্কে আশা করা যায় যে, সে মৌলিক ভাবে যে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে, তার বিস্তারিত রূপ এবং ফলাফলকে মেনে নিতেও সে পশ্চাদপদ হবেনা। যেসব লোক কুরআন মজীদের যুক্তি-প্রমাণের ওপর গভীর ভাবে চিন্তা করেছে তারা আমাদের এ কথার সত্যতা স্বীকার করবে যে, কুরআনের অধিকাংশ যুক্তি-প্রমানের

ধরণ এরূপই। একারণ যে ব্যক্তি অনাবিল মন নিয়ে কুরআন মজীদ অধ্যয়ণ করবে, সে অনুভব করতে পারবে যে, সে নিজের কিতাবই পাঠ করছে। এর প্রতিটি আহবান তার নিজেরই আহ্বান মনে হতে থাকবে।

ভুল সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি রাখা নিষেধ

আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং হকপন্থীদের যুক্তি–প্রমাণ পদ্ধতির তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তারা সাধারণ তর্কবিশারদদের মত দাওয়াতের ব্যাপারে ব্যক্তির কোন ভুল সিদ্ধান্তকে যুক্তির ভিত্তি বানাতেন না। যদি কোন ব্যক্তি কোন ভ্রান্ত আকীদা পোষন করে থাকে তাহলে এর সংশোধন করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু তার একটি ভ্রান্তির কারণে তাকে আরো কতগুলো ভ্রান্তি স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা যেতে পারেনা। যে ব্যক্তি নিজের সম্বোধিত ব্যক্তিকে নিরুত্তর করিয়ে দিতে চায়, অথবা তাকে নিজের কথার সামনে নতি স্বীকারে বাধ্য করতে চায়, অথবা তাকে কোন ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করতে চায়–তার যুক্তির পন্থার মধ্যে অনেকাংশে এই উপাদান পাওয়া যায়। কিন্তু হকপন্থীরা কখনো এই ভ্রান্ত পদ্ধতি অনুসরণ করেনা। সম্বোধনকৃত ব্যক্তির কোন ভুল সিদ্ধান্তের ওপর তারা নিজেদের কোন হককে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেলেও তারা তা গ্রহণ করেননা। যে হকের ভিত্তি বাতিলের ওপর স্থাপিত তাদের দৃষ্টিতে এই হকের কোন গুরুত্ব নেই। এধরনের অন্তসারশূণ্য এবং ভিত্তিহীন হক পেশাদার তার্কিকদের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তা কিছুক্ষণের জন্য নিজের জৌলুসও দেখাতে পারে; কিন্তু জীবন–সংগ্রামে তা কোন কাজেই আসতে পারেনা। জীবন–যুদ্ধে কেবল সেই হকই কাজে আসতে পারে, যার শিকড় মানব–প্রকৃতির মধ্যে দূরদূরান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বিস্তৃতি গোটা পরিবেশকে নিজের ছায়াতলে নিয়ে নেয়।

আমাদের কালাম শাস্ত্রবিদগণ সাধারণত যে ভুল করেছেন তা হচ্ছে–ইসলামের কোন মূলনীতির সত্যতা প্রমানের জন্য তারা যখন নিজেদের কোন ভিত্তি কায়েম করতে পারেননি, তখন অন্যদের কোন মতবাদ ও ধারণাকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে তার ওপর নিজেদের কল্পনার প্রাসাদ নির্মান করেছেন। এধরনের ভ্রান্ত ওকালতির ফলে ইসলামের যে ক্ষতি হয়েছে, ইসলাম বিরোধীদের বিরোধিতার ফলে তার এতটা ক্ষতি হয়নি। ইসলামের কোন মূলনীতি সঠিক বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রাকৃতিক যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করা যাচ্ছেনা এর কারণ এই নয় যে, খোদা–নাখাস্তা ইসলামের মূলনীতি সমূহের সত্যতার স্বপক্ষে কোন বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রাকৃতিক যুক্তিই বর্তমান নেই। বরং এর কারন শুধু এই যে, পেশাদার তার্কিকগণ অপ্রকৃতিক

বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা নিজেদের রুচিকে এতটা বিকৃত করে ফেলেছে যে, তারা ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তির মূল্য ও মর্যদা অনুধাবন করতেই ব্যর্থ হয়েছে। এই অবস্থায় তাদের জন্য সঠিক পথ এই ছিল যে, ইসলামের পক্ষে ওকালতি করার দায়িত্ব নেয়ার পরিবর্তে নিজেদের পূর্বেকার ধান্দায় মশগুল থাকা। কিন্তু পৈত্রিক ধর্ম হিসাবে ইসলামের জন্য তাদের অন্তরে যে টান ছিল–তা তাদেরকে উষ্কানি দিতে থাকল যে, তারা যে ধর্মের নাম নিচ্ছে তার সত্যতাকে বুদ্ধিবৃত্তিক মূলনীতির ওপর দাঁড় করাতেই হবে। তাদের বিকৃত রুচি এবং কুরআনের আলো থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তি তাদের অন্তরে আবেদন সৃষ্টি করেনা। এজন্য তাদের যুগে যে বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণ–বিশেষ নির্বিশেষে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল তার মানদণ্ডে তারা ইসলামের সত্যতাকে প্রমাণ করে দেখাতে চাচ্ছিল। তাদের এই ভ্রান্ত প্রচেষ্টার ফল এই দাঁড়ায় যে, তারা ইসলামের সুদৃঢ় এবং সঠিক শিক্ষার গোটা ইমারতকে তার শক্তিশালী ভিত্তি থেকে সরিয়ে নিয়ে একেবারে দুর্বল এবং ভংগুর ভিত্তির ওপর স্থাপন করে। তারা যতটা সৎ উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়েই একাজ করুক না কেন, কিন্তু তার পরিনাম হয়েছে অত্যন্ত ভয়াবহ। যুগের পরিক্রমা এবং বিজ্ঞানের আবিষ্কার যখন গতকাল পর্যন্তও সাধারণভাবে সমাদৃত মতবাদকে ভিত্তি হীন প্রমাণ করে দিল, তখন তার আঘাত ইসলামের সেইসব মূলনীতির ওপরও এসে পড়ল যেগুলোকে ভ্রান্ত মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ট করা হয়েছিল। এ কারণে ইসলামের সাথে সম্পর্কিত অনেক লোকের মনে এই ধারনার সৃষ্টি হল যে, এই মতবাদ যেভাবে পুরাতন হয়ে গেছে, অনুরূপভাবে ইসলামও পুরাতন হয়ে গেছে। এই খারাপ ধারণা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রাচীনপন্থী কালাম শাস্ত্রবিদগণও যেরূপ অংশ গ্রহণ করেছেন, অনুরূপ ভাবে আমাদের বর্তমান কালের কালাম শাস্ত্রবিদগণও অংশ গ্রহণ করছেন। এই দুই দলের সম্মিলিত ভ্রান্তি হচ্ছে এই যে, হকের সাহায্যের জন্য তারা হককে যথেষ্ট মনে করেনি, বরং তার জন্য বাতিলের সাহায্যও জরুরী মনে করে। অথচ হকের অর্থ হচ্ছে এই যে, তা সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বপ্রমাণিত এবং দৃঢ়। জ্ঞান ও স্বভাবের মধ্যে তার শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

কিন্তু আমাদের কালাম শাস্ত্রবিদগণ গ্রীক দার্শণিকদের দেখানো চিন্তার ও যুক্তির পদ্ধতি অনুসরণে এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা কুরআনের যুক্তি–প্রমাণ পদ্ধতির সূক্ষতা এবং সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। অথচ তারা যদি যুক্তি–প্রমাণের স্বভাববিরুদ্ধ পন্থাকে পরিহার করে কুরআন এবং নবীদের প্রজ্ঞাপূর্ণ যুক্তির পদ্ধতি অনুধাবন করার চেষ্টা করত, তাহলে তারা জানতে পারত যে, কুরআনের

প্রতিটি দাবীর ভিত্তি এতটা মজবুত দলীলের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা সময় এবং স্থানের যাবতীয় সীমাবদ্ধতা থেকে এবং চিন্তার বিপ্লবের যাবতীয় প্রভাব থেকে সম্পর্ন মুক্ত।

ঐক্যসূত্র অন্বেষণ

হকের আহ্বানকারীদের যুক্তি-পদ্ধতির চতুর্থ বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তারা নিজেদের এবং আহ্বানকৃত ব্যক্তির মধ্যে ঐক্যসূত্র অন্বেষণ করে তাকে আলোচনা ও যুক্তির ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে অযথা নিজেদের একাকিত্ব ও স্বাতন্ত্র প্রকাশ করার চেষ্টা করেননা। মানব জাতি নিজেদের বাহ্যিক স্বাতন্ত্রের দিক থেকে যতই অমিল এবং বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিগোচর হোক না কেন, কিন্তু তাদের এই অমিল এবং বিক্ষিপ্ততার গভীরে এমন অসংখ্য মূলনীতি ও আকীদা-বিশ্বাস পাওয়া যাবে যেখানে সকলের ঐক্যমত রয়েছে। বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়ম-বিধান, ইতিহাসের সিদ্ধান্ত-সমূহ, স্বভাব-প্রকৃতির বিশ্বাস এবং নৈতিকতার মৌলিক বিধানের মধ্যে এমন অনেক জিনিস রয়েছ যে সম্পর্কে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য এবং আরব-অনারব সবাই একই দৃষ্টিভংগী পোষন করে। যদি এগুলোকে যুক্তির ভিত্তি বানিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়া যায়, তাহলে ধীরস্থির প্রকৃতির লোকেরা এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল স্বীকার করে নিতে ইতস্তত করবেনা। জীবনের যেসব নীতিমালায় উভয়ের অংশীদারিত্ব রয়েছে তার আনুসংগিক বিষয়ে যেসব মতবিরোধ দেখা দেয় তার অধিকাংশই কুবুদ্ধি এবং গোড়ামীর কারণে সৃষ্টি হয়। আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি এসব বিরোধ দূর করা যায় তাহলে প্রতিটি ব্যক্তি এসব মূলনীতিকে সম-অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখতে থাকবে।

নবী-রসূলগণ সব সময় এই পদ্ধতিকেই যুক্তি-প্রমান পেশের জন্য অবলম্বন করে আসছেন। আরব মুশরিক এবং আহলে কিতাবদের সামনে নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাবে যুক্তি-প্রমান উপস্থাপন করেছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআন মজীদে বর্তমান রয়েছে। এগুলো অধ্যয়ণ করলে কোথাও এমন ধারণা পাওয়া যাবেনা যে, তাদের কাছে এমন কিছু দাবী করা হয়েছে যা তাদের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং অভিনব। তাদের ইতিহাস, তাদের রীতি-নীতি, তাদের ন্যায়-অন্যায়বোধ এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিকতায় এর মূল নিহিত ছিল। যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হত তা কেবল এই মূলের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং এর শাখা-প্রশাখাই পরিলক্ষিত হত। এজন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লামের দাবী ছিল, মূল এবং তার আনুসংগিক বিষয়ের মধ্যে যে বিরোধ সৃষ্টি হয়ে গেছে লোকেরা দূর করে নেবে। কুরআন যা বলছে তা যদি সঠিক হয় তাহলে তারা এটা মেনে নেবে,

আর তারা যার দাবীদার তা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে তাকে সঠিক বলে প্রমাণ করে দেখাক। এই পন্থায় যুক্তি পেশ করার উপকারিতা হচ্ছে এই যে, আহ্বানকারী সাম্পর্কে এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারেনা যে, সে এমন কে ব্যক্তি, যে নিজের একাকিত্বের ধারনায় গোটা অতীতকে অস্বীকার করতে চায় এবং নিজের ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিস্তার করার চিন্তায় মশগুল আছে। বরং তার সম্পর্কে এই ধারণা পোষণ করা হয় যে, সে আমাদের পূর্ববর্তী পৈত্রিক সম্পদকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যই এসেছে। যদি কিছু লোক নিজেদের দুষ্ট প্রকৃতির বশবর্তী হয়ে তাদের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা প্রচার করতে চায় তাহলে তারা এটা বেশীদিন ছড়াতে পারবেনা। প্রকৃত সত্যের সূর্য উদিত হয়ে অতি দ্রুত অন্ধকার দূর করে দেবে।

যেসব লোক হকপন্থীদের এই পন্থায় যুক্তি পেশের উপকারিতা এবং সৌন্দর্য সম্পর্কে অবহিত নয় তাদের কর্মপন্থা সাধারণত হকপন্থীদের সম্পূর্ন উল্টা হয়ে থাকে। তারা তো কোন ঐক্যসূত্র খুঁজেইনা বরং যদিও কোন ঐক্যসূত্র পেয়ে যায় তাহলে তাকেও মতবিরোধের সূত্র বানিয়ে রাখে। তাদের মতে তাদের যুক্তি এবং দাওয়াতের আসল সৌন্দর্য হচ্ছে যে, তারা প্রমাণ করে দেখাতে চায় যে, তারা যা বলছে তা ইতিপূর্বে মাটির ওপর এবং আসমানের নীচে কেউ বলেনি। আমাদের যেসব তার্কিক ইসলামের দাওয়াতের সঠিক মেজাজের সাথে পরিচিত নয় তারা সাধারণত এ ধরনের বিকৃতিতে নিমজ্জিত রয়েছে।। তারা যখনই ইসলামের কোন সত্যকে উপস্থাপন করে তখন তাকে একটি বিরল সত্য হিসাবে প্রমাণ করে দেখানোর মধ্যেই নিজের কৃতিত্ব নিহিত আছে বলে মনে করে। এই ব্যাপারটি স্বভাবের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির পরিবর্তে ঘৃণার সৃষ্টি করে এবং লোকেরা এটাকে নিজের জিনিস মনে করে গ্রহণ করার পরিবর্তে আজগুবী জিনিস মনে করে তা পরিহার করতে থাকে।

প্রতিবাদমূলক যুক্তি—পদ্ধতি পরিহার

হকের আহ্বানকারীদের যুক্তি-পদ্ধতির পঞ্চম বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তারা যুক্তি এবং জবাবদানের প্রতিবাদ-মূলক পন্থা কখনো গ্রহণ করেনা। এর উদাহরণ হচ্ছে এই যে, যেখানে কোন ধর্মের লোক ইসলামের কোন বিষয়ের ওপর আপত্তি উত্থাপন করে, সাথে তার ধর্মের শিক্ষার মধ্য থেকেও অনুরূপ ধরনের আপত্তি তুলে ধরা। আমাদের তার্কিক এবং দার্শনিকগণ এ ধরনের পন্থা অবলম্বন করে মনে করেন তারা ইসলামকে অভিযোগের হাত থেকে বাচিয়ে দিয়েছেন। মূলত এধরনের জবাব নীতিগতভাবে ভুল। অন্যের কোন ভ্রান্তির কারণে আমাদের কোন ভ্রান্তি সত্যে পরিনত হওয়া তো দূরের কথা আমাদের কোন সত্যের সত্য হওয়াটাও সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়।

এই পন্থায় যুক্তি পেশ করে যদি কোন ফায়দা পাওয়া যায় তাহলে শুধু এতটুকু যে, অভিযোগ বা প্রতিবাদকারীর মুখ বন্ধ করে দেয়া যায় এবং এর দ্বারা আমাদের অহংকারী আত্মা শান্তনা লাভ করে। কিন্তু এর দ্বারা প্রতিপক্ষও ইসলামের সত্যতার প্রমান পেতে পারেনা এবং নিজেদের হৃদয়ও উন্মক্ত হতে পারেনা। বরং এটা আমাদের নিজেদের দূর্বলতারই প্রমাণ বহন করে যা আমরা নিজেরাই অপরের কাছে তুলে ধরছি।

প্রতিটি সত্যই তার নিজের মধ্যে নিজের সত্যতার প্রমাণ বহন করে। অন্যের কোন বাতিলের মধ্যে তার প্রমাণ নিহিত থাকতে পারেনা। এ কারণে সঠিক পন্থা হচ্ছে কেবল এই যে, সত্যের স্বপক্ষের প্রমাণও তার মধ্য থেকেই পেশ করতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদের কালাম শাস্ত্রবিদদের পদ্ধতি দুটি কারণে ভুল। প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, বিরুদ্ধবাদীদের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে পড়ার ফলে অনেক সময় ইসলামের কোন কোন সঠিক মূলনীতির সত্যতা তাদের নিজেদের চোখেই সংশয়পূর্ণ হয়ে দেখা দিল। এজন্য বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিবাদমূলক জবাব দান করে তাদেরকে নিরুত্তর করে দেয়া ছাড়া তাদের জন্য অন্য কোন উপায় ছিলনা। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, এই লোকেরা নিজেদের ওকালতী এবং সাহায্য-সহায়তা করার দায়িত্ব ইসলামের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি। বরং জাতীয় অন্ধপ্রীতির শিকার হয়ে তারা মুসলিম উম্মাহর গোটা ইতিহাসের সাহায্য করাটাকেও নিজেদের ঘাড়ে নিয়ে নেয়। একারণে তাদের যুদ্ধক্ষেত্র অনেক প্রশস্ত হয়ে যায়। তাদেরকে এমন অনেক জিনিসের সত্য হওয়াও প্রমান করতে হয় যাকে সত্য প্রমাণ করা ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব ছিলনা যতক্ষণ তারা অন্যের অসংখ্য বাতিলকেও সত্য প্রমাণ করতে না পারে।

আমাদের কালাম শাস্ত্রবিদদের গত অর্ধ শাতাব্দীর রচনাবলী-যার মধ্যে জিহাদ, দাসপ্রথা, বহুবিবাহ, তালাক এবং মুসলিম রাজা-বাদশাদের কার্যকালাপের বৈধতা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে-এর সবকিছুই উপরোল্লিখিত বক্তব্যের সাক্ষ্য বহন করছে। এগুলো পাঠ করে কখনো তাদের অসহায় এবং প্রভাবিত অবস্থার জন্য করুনার উদ্রেক হয়, আবার কখনো তাদের ভ্রান্ত পদক্ষেপের জন্য মাথা কুটে মরতে ইচ্ছা হয়। অথচ তারা যদি অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হত এবং অপরের ঝগড়া নিজেদের মাথায় তুলে না নিত, বরং নিজেদের সাহযোগিতা শুধু ইসলামের গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখত তাহলে অনেক অর্থহীন জিনিস থেকে নিরাপদ থাকা যেত।

১০

সম্বোধিত ব্যক্তির মন-মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রাখা

একটি চারাগাছের ক্রমবিকাশ এবং ক্রমোন্নতির জন্য শুধু চারাগাছটির যোগ্যতার দিকে নজর রাখলেই চলেনা, বরং যমীনের উর্বরা শক্তি এবং ঋতুর আনুকুল্যের দিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়। অনুরূপভাবে দীনে হকের কলেমার দাওয়াত পেশ করার ক্ষেত্রে শুধু হকের প্রকৃত যোগ্যতার ওপরই নির্ভর করা উচিৎ নয়, বরং যেসব লোকের সামনে এই হক পেশ করা হচ্ছে দাওয়াতের সময় মনোস্তাত্বিক দৃষ্টিকোন থেকে তাদের অবস্থা কিরূপ তাও দেখা উচিৎ। যমীনের মত হৃদয় ও মনেরও ঋতু আছে। একজন কৃষক যেভাবে ঋতুর সাথে পরিচিত থাকে এবং অনুকূল ঋতুতেই যমীনে বীজ বপন করে, অনুরূপভাবে একজন হকের আহবানকারীকেও হৃদয়ের মওসুমের সাথে পরিচিত থাকতে হবে। যেসব লোক এই নীতির পরিপন্থী কাজ করে, চাই তা তার সরলতা বা ভুলের কারণেই হোক অথবা এই ধারনার বশবর্তী হয়ে যে, হক নিজের সৌন্দর্য ও আকর্ষণের মাধ্যমেই হৃদয়ের মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে পারবে-এর জন্য অন্য কিছুর বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই-এই ব্যক্তি তার নিজের ভ্রান্তির শাস্তি তার দাওয়াতের ব্যর্থতার মাধ্যমেই পেয়ে যাবে। তার সৎ উদ্দেশ্য তার এই অসতর্কতার পরিণতি থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে না। এজন্য যার কাছে দাওয়াত পেশ করা হচ্ছে তার মানসিক অবস্থার দিকে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন।

সম্বোধিত ব্যক্তির মনোস্তাত্ত্বিক দিক বিবেচনা করার দশটি নীতি

হকের আহবানকারীকে বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের সাথে মেলামেশা করতে হয়। তাদের মানসিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আহবানকারীকে বিভিন্নমুখী পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এসবের পূর্ণ ব্যাখ্যা দেয়া এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু নবী-রসূলগণের কর্মপন্থা থেকে যেসব মৌলনীতি আমরা পেতে পারি উদাহরণ স্বরূপ তার কিছু আমরা এখানে উল্লেখ করব। লোকেরা এসব মূলনীতি সামনে রেখে আরো প্রয়োজনীয় মূলনীতি এখান থেকে গ্রহণ করতে পারবে। সাধারণ মানবীয় বুদ্ধির সাথেই এর সম্পর্ক রয়েছে। একজন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন এবং সৎ উদ্দেশ্য প্রনোদিত

এবং নিজের উদ্দেশ্যের সাথে সম্যকভাবে পরিচিত আহবানকারী যদি এই দৃষ্টান্তগুলো সামনে রাখে তাহলে আশা করা যায়, সে খুব দ্রুত নিজের দাওয়াতের কর্মপন্থাকে নবীদের কর্মপন্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে সক্ষম হবে। এখানে আমরা যে কয়টি মূলনীতি উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি তার সংখ্যা দশ।

প্রথম মূলনীতিঃ একই জিনিসের বিভিন্ন দিক থাকতে পারে। কোন কোন দিক থেকে তা সহজবোধ্য এবং কোন কোন দিক থেকে তা দুর্বোধ্য হতে পারে। সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তির সামনে যদি তা সহজবোধ্যভাবে পেশ করা হয় তাহলে সেটা তার কাছে মোটেই অপরিচিত মনে হবে না। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই যদি তা দুর্বোধ্য দিক থেকে পেশ করা হয় তাহলে দাওয়াতকৃত ব্যক্তি তাতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পলায়ন করবে। হয়তো সে আর কখনো দাওয়াতকারীর সামনে পড়তে প্রস্তুত হবে না। দীনে হকের অবস্থাও কমবেশী এরূপ। একান্ত অপরিচিতি ব্যক্তির কাছেও তা কোন কোন দিক থেকে হৃদয়গ্রাহী এবং চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে। যদি এই দিক থেকে তার কাছে দীনের দাওয়াত পেশ করা যায় তাহলে সে ক্রমান্বয়ে দীনের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে তার নরম–কঠিন সব কিছুই গ্রহণ করে নেবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিও দীনের কোন কোন দিককে কঠিন এবং ভারবহ মনে করে। যদি এই কঠিন দিক থেকেই তার সামনে দীনকে পেশ করা হয় তাহলে সে এর সাথে আরো অধিক পরিচিত হওয়া তো দূরের কথা, তার পূর্বেকার পরিচিতিই ভয় ও আশংকায় পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

যে ব্যক্তি একটি জিনিসের বিভিন্ন দিক এবং তার মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত নয় অথবা সে জানেনা সর্বপ্রথম দাওয়াত পেশ করার সময় একটি জিনিসকে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির সামনে কোন্ দিক থেকে পেশ করা উচিৎ, অথবা প্রকৃতিগত ভাবেই তার রুচি হচ্ছে প্রস্তরময় যমীনে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালানো এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে সে কঠোরতাকেই পূর্ণ দীনদারী মনে করে–এই ধরনের লোকেরা যখন দীনের দাওয়াতের কাজ হাতে নেয় তখন তাদের দাওয়াতের ফল এই দাঁড়ায় যে, লোকেরা তাদের কাছে আসার পরিবর্তে দূরে পলায়ন করে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, তারা দাওয়াত পেশ করার জন্য যে পথ অবলম্বন করেছে তা লোকদের মন–মানসিকতার দিক থেকে সম্পূর্ণ উল্টা। এর দ্বারা সুসংবাদের স্থলে ঘৃণা এবং আকর্ষণের পরিবর্তে অসন্তুষ্টি ছড়ায়। এই জিনিস থেকে বিরত রাখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ (সুসংবাদ দান কর, ঘৃণা ছড়িও না) এবং হকের আহবানকারীদের জন্য সঠিক কর্মপন্থা এই বলেছেন,

انما بعثتم ميسرين (তোমাদেরকে সহজতা সৃষ্টির জন্য পাঠানো হয়েছে, কাঠিন্য আরোপ করার জন্য পাঠানো হয়নি)।

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ মনস্তাত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন আহবানকারীকে দ্বিতীয় যে জিনিসটির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে তা হচ্ছে– কোন অবস্থায়ই নিজের দাওয়াতকৃত ব্যক্তির মধ্যে জাহেলিয়াতের দুশমণি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ সৃষ্টি করে দেবেনা। প্রতিটি হকের আহবানকারীকে একথা মনে রাখতে হবে যে, নিজের আকীদা–বিশ্বাসের সাথে আহবানকারীর যেরূপ সম্পর্ক রয়েছে, প্রতিটি জাতির লোকেরও নিজ নিজ আকীদা–বিশ্বাসের সাথে কমবেশী অনুরূপ সম্পর্ক রয়েছে। এটা যদি ভ্রান্ত সম্পর্ক হয়ে থাকে তাহলে এর সংশোধনের পথ হচ্ছে এই যে, যেসব ভুল ধারণার কারণে এই ভ্রান্ত সম্পর্ক অটুট রয়েছে তা দূর করার অনুসরণে আবেগাপ্লুত হয়ে অথবা বাতিলের বিরোধিতার উত্তেজনায় পরাজিত হয়ে এই বাতিল সম্পর্কের আদর্শিক কারণ সমূহের সংশোধন করার পরিবর্তে সরাসরি বাতিল সম্পর্কের ওপর হামলা করা কোন ক্রমেই ঠিক নয়। এই ধরনের সরাসরি আক্রমণের পরিণতি কেবল এই হয়ে থাকে যে, দাওয়াতকৃত ব্যক্তি জাহেলী দুশমনীর জোশে আত্মহারা হয়ে দাওয়াতের বিরোধিতা করার জন্য উঠেপড়ে লেগে যায়। এই জোশে সে এতটা অন্ধ–বধির হয়ে যায় যে, হাতের কাছে যে ইট–পাথরই পায় তা তুলে আহবানকারীর দিকে নিক্ষেপ করতে থাকে। সূরা আনআমে এরূপ কর্মনীতি থেকে দূরে থাকার জন্য হকের আহবানকারীদের তাকিদ করা হয়েছে,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ (١٠٨) ـ

"এই লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের ইবাদত করে তাদের তোমরা গালি দিওনা। অন্যথায় তারা সীমা লংঘন করে মূর্খতাবশতঃ আল্লাহকেই গালি দিয়ে বসবে। আমরা এভাবেই প্রতিটি মানব মন্ডলীর জন্য তাদের কার্যকলাপকে চাকচিক্যময় করে দিয়েছি।"–(আয়াত ১০৮)

এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো একটি হেদায়াত কুরআন এই দিয়েছে যে, হকের প্রচারকার্যের ক্ষেত্রে গোটা আলোচনা আসল উদ্দেশ্য পর্যন্ত সীমিত রাখা উচিৎ। যদি দাওয়াতকৃত ব্যক্তির তরফ থেকে উস্কানীমূলক কিছু করা হয়– যার ফলে উভয় দলের অনুসারী এবং নেতাদের মধ্যে আশরাফ–আতরাফের দ্বন্দ্ব বেধে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন হকের আহবানকারীদের কর্তব্য হচ্ছে– বিতর্কের ভ্রান্ত

বেড়াজালে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে তাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা এবং দাওয়াতকৃত পক্ষের নেতা ও অনুসারীদের হেয় প্রতিপন্ন করার পরিবর্তে বরং তারা মূলত যতটুকু সম্মান পাবার অধিকারী তা তাদের প্রদর্শন করা।

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُوْلُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا، رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَّشَاْ يَرْحَمْكُمْ وَاِنْ يَّشَاْ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ وَكِيْلاً * وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّيْنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا

"আমার বান্দাদের বলে দাও, তারা যেন সেসব কথাই বলে যা অতি উত্তম। শয়তান তাদের মধ্যে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। নিশ্চিতই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত আছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন, আবার ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন। আমরা তোমাকে তাদের ঈমানের যিম্মাদার করে পাঠাইনি। তোমার প্রতিপালক জমীন ও আসমানের যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে ভাল করেই জানেন। আমরা কোন কোন নবীকে কোন কোন নবীর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আর আমরাই দাউদকে যাবূর দিয়েছি।"– (সূরা ইসরাঃ ৫৩–৫৫)

এই হেদায়াতের উদ্দেশ্যও এই যে, যেসব কথা জাহেলিয়াতের শত্রুতাকে উস্কিয়ে দিতে পারে এবং দাওয়াতকৃত ব্যক্তিকে হিংসা–বিদ্বেষ ও বিরোধিতার পথে ঠেলে দিতে পারে–হকের আহবানকারীকে সেসব কথা পরিহার করে চলতে হবে।

তৃতীয় মূলনীতিঃ যেসব লোক মান–মর্যাদা ও নেতৃত্বের আসনে উপবিষ্ট থাকার কারণে অন্যদের পক্ষ থেকে নিজেদের জন্য সম্বোধন এবং কথাবার্তায় তাযীম ও সম্মান পেয়ে আসছে এবং আশংকা রয়েছে যে, তার বিরোধিতা করলে তার অহংকারী মনের শয়তান জেগে উঠবে এবং তাকে হক কথা শুনতে বাধা দেবে– এক্ষেত্রে হকের আহবানকারী একটা বিশেষ সীমা পর্যন্ত তার এই রোগের প্রতি খেয়াল রাখবে যাতে তার নিজের মনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়া আহবানকারীর পক্ষ থেকে কোন নতুন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে না পারে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে এই দিকটি সামনে রেখে হেদায়াত দান করা হয়েছেঃ

اذهَبَا اِلَى فِرعَونَ اِنَّهُ طَغٰى فَقُولَا لَهُ قَولاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَو يَخشٰى (طه - ٤٤) ـ

"ফিরাউনের কাছে যাও। সে অবাধ্য হয়ে গেছে। তোমরা উভয়ে তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, তাহলে আশা করা যায় সে নসীহত গ্রহণ করবে অথবা ভয় পাবে।"– (সূরা তাহাঃ ৪৪)

কিন্তু দাওয়াতকৃত ব্যক্তির পদমর্যাদার প্রতি খেয়াল রাখারও একটা সীমা আছে। এক্ষেত্রে আহবানকারী যে সত্যকে তার সামনে পেশ করছে সেই সত্যের মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। এরূপ খেয়াল রাখতে গিয়ে যদি কোন দিক থেকে সত্যের মাহাত্ম্য ও মর্যাদায় আঘাত লাগে তাহলে এটা জায়েয হবে না। কুরআনে পরিষ্কারভাবে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

চতুর্থ মূলনীতিঃ একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার যেভাবে রোগীর বয়স, তার মেজাজ–প্রকৃতি এবং তার রোগের তীব্রতা ও লঘুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে তার জন্য পথ্য নির্ধারণ করে, অনুরূপভাবে সত্যের আহবানকারীরও কর্তব্য হচ্ছে– সে দাওয়াতকৃত ব্যক্তির যোগ্যতা, তার চাহিদা এবং তার ধারণ ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে তার সামনে দাওয়াত পেশ করবে। এই জিনিসের সঠিক অনুমাণ করার জন্য শুধু দাওয়াতকৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও ব্যক্তিগত ধারণ ক্ষমতাকেই সামনে রাখলে চলবে না, বরং তার জাতিগত বৈশিষ্ট্য এবং তার ব্যক্তিগত অবস্থার প্রতিও লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এসব জিনিস বিবেচনায় না রাখলে কোন দাওয়াতের সাফল্য আশা করা যেতে পারে না। একারণেই কুরআন মজীদ ক্রমাগতভাবে অল্প অল্প করে নাযিল হয়েছে।

وَقُراٰنًا فَرَقنٰهُ لِتَقرَاَهُ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكثٍ وَّنَزَّلنٰهُ تَنزِيلاً

"আমরা এই কুরআনকে বিভিন্ন সময়ে অল্প অল্প করে নাযিল করেছি–যেন তুমি বিরতি দিয়ে তা লোকদের শুনাও। আর একে আমরা [অবস্থামত] ক্রমশ নাযিল করেছি।"–(সূরা ইসরাঃ ১৬)

অনুরূপভাবে কুরআন থেকে এ কথাও জানা যায় যে, কুরআনী দাওয়াতে অনেক কথা আরবদের নিমজ্জিত মেজাজের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন, তারা যেহেতু অনমনীয় এবং ঝগড়াটে (কাওমান লুদ্দান) স্বভাবের ছিল, এ কারণে তাদের সাথে কথাবার্তা ও বিতর্কের এমন পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে যা একটি

ঝগড়াটে এবং অনমনীয় মনোভাবাপন্ন জাতির জন্য উপযুক্ত ছিল। অনন্তর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রাম অঞ্চল থেকে আগত লোকদের সামনে যে ভংগীতে দীনে হকের দাওয়াত পেশ করতেন–তা মক্কা–মদীনার লোকদের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করার ভংগী থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধিদল তাঁর কাছে অভিযোগ করল, আমাদের এবং আপনার মাঝখানে কোরাইশ বংশ প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। তাদের শত্রুতার কারণে হারাম মাসগুলো (মুহাররম, রজব, যিলকাদ ও যিলহজ্জ) ছাড়া অন্য কোন মাসে আপনার কাছে আসতে পারি না। এ কারণে আমাদের এমন কয়েকটি মৌলিক কথা বলে দিন যা আমরা নিজেরাও অনুসরণ করব এবং অন্যদেরও তার দাওয়াত দেব। রসূলুল্লাহ (স) তাদের প্রয়োজন এবং অবস্থাকে সামনে রেখে মাত্র চারটি জিনিস করার নির্দেশ দেন এবং চারটি জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি আরো বললেন, নিজের কওমের লোকদেরও এগুলো করতে বলবে এবং এগুলো থেকে বিরত রাখবে। এর অধিক কিছু তিনি তাদের সামনে বলেননি।

একথা সুস্পষ্ট যে, দাওয়াতের পদ্ধতির এই পার্থক্য কেবল এই সব দলের মনোস্তাত্ত্বিক পার্থক্যের ভিত্তিতে ছিল। যাদের মধ্যেকার পার্থক্যটা স্বাভাবিক পর্যায়ের এবং যারা সহজ–সরল প্রকৃতির ছিল তাদের সামনে দীনের সহজ–সরল শিক্ষা পেশ করা হত যাতে তারা এর ওপর আমল করতে পারে। পক্ষান্তরে যারা জটিল প্রকৃতির লোক তাদের মন–মগজকে পরিষ্কার করার জন্য একটি উপযুক্ত ক্রমধারা অনুযায়ী অবিরতভাবে দাওয়াত দিয়ে যাওয়া হত।

পঞ্চম মূলনীতিঃ একজন কৃষকের জন্য যেভাবে যমীনকে তৈরী না করে এবং অনুকূল ঋতু ছাড়া বীজ বপন করা ঠিক নয় এবং যেভাবে একজন ডাক্তারের জন্য মুমূর্ষু অবস্থায় রোগীকে ঔষধ দেয়া ঠিক নয়–অনুরূপভাবে দাওয়াতকৃত ব্যক্তি যখন প্রতিবাদ, প্রতি উত্তর ও সমালোচনার দিকে ঝুঁকে পড়ে তখন হকের আহবানকারীর কর্তব্য হচ্ছে এ সময় তার সামনে দাওয়াত পেশ না করা। শুধু এ অবস্থায়ই দাওয়াত পেশ করা থেকে বিরত থাকা জরুরী নয় বরং যদি দাওয়াত পেশ করার পরও দাওয়াতকৃত ব্যক্তি প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠে–তখন দাওয়াত দানকারীর কর্তব্য হচ্ছে– বাদ–প্রতিবাদকে দীর্ঘস্থায়ী করার পরিবর্তে তাকে এখানেই শেষ করে সেখান থেকে সরে পড়া এবং উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা। দাওয়াতকৃত ব্যক্তি যখন উন্মুক্ত মনের অধিকারী হয়ে যাবে অথবা অন্তত পক্ষে বাদ–প্রতিবাদ করার প্রবণতা দূরীভূত হবে তখন তার কাছে পুনরায় দাওয়াত পেশ করতে হবে।

اذَا رَاَيتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِى ايَاتِنَا فَاَعرِض عَنهُم حَتّى يَخُوضُوا فِى حَدِيثٍ غَيرِه وَاِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيطَنُ فَلَا تَقعُد بَعدَ الذِّكرى مَعَ القَومِ الظّلِمِينَ (انعام - ٦٨) ـ

"যখন দেখ যে, এই লোকেরা আমার আয়াত সমূহের দোষ সন্ধান করছে তখন তাদের নিকট থেকে সরে যাও, যতক্ষণ না তারা এই প্রসংগের কথাবার্তা বন্ধ করে অপর কোন প্রসংগে মগ্ন হয়। আর যদি কখনো শয়তান তোমাকে এ কথা ভুলিয়ে দেয় তাহলে তা স্মরণ হওয়ার পর এই যালেমদের সাথে বসনা।"

-(সূরা আনআমঃ ৬৮)

এরূপ পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা বর্তমান থাকার পরও আশ্চর্য লাগে আমাদের আলেম সমাজ দীনের প্রচারের জন্য বিতর্ক-বাহাসের পন্থাকে কি করে জায়েয মনে করতে পারল। অথচ উভয় দল কেবল এই উদ্দেশ্যেই পরস্পরের মুখামুখী হয় যে, নিজের প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান এবং মিথ্যা সাব্যস্ত করতে হবে-তা আসলে সত্যই হোক না কেন। যাদের বিতর্ক-বাহাসের অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে তারা জানে যে, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কেবল প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন করার বিকৃত রুচিই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। এ সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে এই যে, এ ধরনের গন্ধ অনুভব করার সাথে সাথে হকের আহবানকারী সসম্মানে সরে পড়বে। কিন্তু আমাদের পেশাদার তার্কিকদেরকে এই গন্ধ এতটা প্রভাবিত করে রেখেছে যে, এই গন্ধ যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে-তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ ততই বৃদ্ধি পেতেথাকে।

ষষ্ঠ মূলনীতিঃ যে ব্যক্তির কাছে দীনের দাওয়াত পেশ করা হবে, সে যদি নিজের কোন আকর্ষণীয় ব্যাপারে এতটা নিমগ্ন থাকে যে, তা থেকে পৃথক হয়ে হকের দাওয়াতের দিকে মনোযোগ দেয়া তার কাছে বিরক্তিকর ঠেকবে-এরূপ ক্ষেত্রে হকের আহবানকারী তার কাছে দাওয়াত পেশ করা থেকে বিরত থাকবে। যদিও এই অবস্থাটি হিংসা-বিদ্বেষ এবং বিরোধিতার অবস্থা থেকে ভিন্নতর, কিন্তু দাওয়াতকৃত ব্যক্তির মানসিক অপ্রস্তুতির দিক থেকে বিচার করলে এই দু'টি অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছেঃ

عن عكرمة ان ابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة فان ابيت فمرتين فان اكثرت فثلاث ولا تمل الناس هذا القران ولا اليفنيك تاتى القوم وهم فى حديث من حديثهم فتقص عليهم فتملهم ولكن انصت فاذا امروك فحدثهم وهم يشتهونه

"ইকরামা থেকে বর্ণিত। ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বললেন, সপ্তাহে মাত্র একদিন লোকদের জন্য ওয়াজ–নসীহত কর। এতে যদি রাজী না হও তাহলে (সপ্তাহে) দুই দিন, এতেও যদি সন্তুষ্ট না হও তাহলে (সপ্তাহে) তিন বার। মোট কথা কুরআনকে মানুষের কাছে বিরক্তিকর করে তুল না। আর এরূপ যেন না হয় যে, তুমি লোকদের কাছে পৌছবে, তখন তারা নিজেদের কোন আলোচনায় মশগুল থাকবে, আর তুমি তাদের নিকট ওয়াজ শুরু করে দেবে এবং তাদের আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করে তাদের বিরক্তি উৎপাদন করবে। বরং এ সময় তুমি চুপ করে থাকবে। যখন তারা তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে তখন তাদেরকে উপদেশ দাও। তাহলে তারা আগ্রহ সহকারে তোমার কথা শুনবে।"

সপ্তম মূলনীতিঃ হকের আহবানকারীকে এ দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, দাওয়াতের নিরস আবেদন, তার অপ্রয়োজনীয় আলোচনা এবং তার মূল্যহীন দীর্ঘ বক্তব্যে যেন শ্রোতার মধ্যে বিরক্তি উৎপাদন না করতে পারে।

عن شقيق قال كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس فى كل خميس فقال له رجلا ياابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا فى كل يوم قال اما انه يمنعنى من ذلك انى اكره ان املكم وانى اتخو لكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا

"শাকীক [তাবেঈ] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ [রা] প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের ওয়াজ–নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবু আবদুর রহমান। আমার আকাংখা ছিল আপনি যদি প্রতিদিন আমাদের

জন্য ওয়াজ-নসীহত করতেন; তিনি উত্তরে বললেন, এরূপ করা থেকে আমাকে এ কথাই বাধা দিয়ে থাকে যে, আমি তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করাকে পছন্দ করিনা, এজন্য আমি বিরতি দিয়েই তোমাদের সামনে ওয়াজ করে থাকি। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বিরক্তির ভয়ে মাঝে মধ্যেই আমাদের ওয়াজ-নসীহত করতেন।"- (বুখারী, মুসলিম)

এই কথাগুলো লেখার সময় আমাদের সামনে এক ধরনের বক্তা ও তাদের দূর্ভাগ্য এবং মজলুম শ্রোতাদের একটি চিত্র ভেসে উঠেছে। তাদের ওয়াজের সবচেয়ে বড় নৈপূণ্য হচ্ছে তাদের অর্থহীন বক্তব্যের দীর্ঘ সূত্রিতা। তারা এই মোটা কথাটুকু সম্পর্কেও অবহিত নয় যে, সর্বোত্তম কথাও নিষ্প্রয়োজনে বারবার পুনরাবৃত্তি করলে বিস্বাদ হয়ে যায় এবং ওয়াজ শুনানোর জন্য লোকদের পেছনে লেগে যাওয়াতে কেবল দীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যই ব্যবহৃত হয়না বরং উল্টো এর দ্বারা দাওয়াতের উদ্দেশ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রসূলুল্লাহ [স] এবং তাঁর সাহাবীগণ লোকদেরকে বিরতি দিয়ে ওয়াজ-নসীহত করতেন যাতে লোকেরা বিরক্তি বোধ করতে না পারে। তাঁর ভাষণ হত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অনন্তর হাদীসের বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেছেন, "তোমরা যখন ওয়াজ-নসীহত কর তখন তা সংক্ষিপ্ত কর।" আবার কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণকে বক্তার প্রজ্ঞা ও বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন সাব্যস্ত করে বলেছেন, "কোন কোন বক্তৃতায় যাদুকরী আকর্ষণ রয়েছে।" একথা বলে ইংগিত করা হয়েছে যে, বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত এবং তাৎপর্যপূর্ণ হতে হবে, যাতে তা অন্তরের ওপর যাদুর মত প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বক্তৃতা এমন হওয়া উচিৎ নয় যা শ্রোতার মেজাজ ও স্বভাব-প্রকৃতিকে ভোঁতা করে দিতে পারে। ফলে তার মধ্যে কোন কথা শুনা এবং তা গ্রহণ করার কোন যোগ্যতাই অবশিষ্ট থাকবে না।

অষ্টম মূলনীতিঃ হকের আহবানকারীকে অত্যন্ত সতর্কতার ও যোগ্যতার সাথে নিজের আশপাশের পরিবেশ মূল্যায়ন করতে হবে। কখন দাওয়াতের বীজ বপণ করার উপযুক্ত সময় হাতে এসে যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। যখনই সে অনুভব করতে পারবে যে, তার উদ্দেশ্য সাধনের কোন সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গেছে-তখনই আর বিলম্ব না করে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে। এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জীবন-চরিত্রে পাওয়া যায়ঃ

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ، قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّى اَرَانِى اَعْصِرُ
خَمْرًا وَقَالَ الاٰخَرُ اِنِّى اَرَانِى اَحْمِلُ فَوْقَ رَاْسِى خُبْزًا تَاْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَاوِيْلِه اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ قَالَ
لاَ يَاْتِيْكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِه اِلاَّ نَبَّاْتُكُمَا بِتَاوِيْلِه قَبْلَ اَنْ
يَاْتِيَكُمَا ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّى اِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ
يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ اٰبَاءِىْ
اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ مَاكَانَ لَنَا اَنْ نُّشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ
شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ
النَّاسِ لاَ يَشْكُرُوْنَ- يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ ءَاَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ
خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِه اِلاَّ اَسْمَاءً
سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاٰبَاءُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ط
اِنِ الْحُكْمُ اِلاَّ لِلّٰهِ اَمَرَ اَلاَّ تَعْبُدُوْا اِلاَّ اِيَّاهُ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ
وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ * يٰصَاحِبَىِ السِّجْنِ اَمَّا
اَحَدُكُمَا فَيَسْقِىْ رَبَّهُ خَمْرًا وَاَمَّا الاٰخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَاْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْ رَّاْسِه قُضِىَ الاَمْرُ الَّذِىْ فِيْهِ تَسْتَفْتِيٰنِ *

(يوسف ٣٦- ٤١)

"তার সাথে আরো দুজন যুবক জেলখানায় প্রবেশ করে। তাদের একজন বলল, আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি মদ প্রস্তুত করছি। অপরজন বলল, আমি দেখি যে, আমার মাথার ওপর রুটি রাখা আছে, আর পাখি তা খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলে দিন। আমরা দেখছি আপনি একজন সদাচারী লোক। ইউসুফ বলল, এখানে তোমরা যে খাবার পাও তা আসার পূর্বেই আমি তোমাদেরকে এই

স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দেব। আমার প্রতিপালক আমাকে যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন এটা তারই অংশ। আসল কথা এই যে, যারা আল্লাহর ওপর ঈমান আনেনা এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে– আমি তাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি। আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করছি। আল্লাহর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করা আমাদের জন্য শোভণীয় নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা আল্লাহর অনুগ্রহ আমাদের ওপর এবং সমগ্র মানব জাতির ওপর (যে, তিনি আমাদেরকে অন্য কারো দাসানুদাস বানাননি)। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তার প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। হে কয়েদখানার সংগীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ, বহু সংখ্যক খোদা বানানো ভাল না সেই এক আল্লাহকে গ্রহণ করা ভাল যিনি সব কিছুর ওপর বিজয়ী? তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তারা কয়েকটি নাম ছাড়া আর কিছুই নয়–যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখে নিয়েছে। আল্লাহ তাদের জন্য কোনই সনদ নাযিল করেননি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না। এটাই হচ্ছে প্রকৃতিগত ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানেনা। হে জেলখানার দুই বন্ধু! তোমাদের মধ্যে একজন তো নিজের মনিবকে শরাব পান করাবে, আর অপরজনকে তো শূলে [ফাঁসি] দেয়া হবে এবং পাখিরা তার মস্তক ঠুকরে ঠুকরে খাবে। তোমরা যে বিষয়ে জিজ্ঞেস করছিলে তার ফয়সলা হয়ে গেছে।"–(সূরা ইউসুফঃ ৩৬–৪১)

এর ওপর এক নজর তাকিয়ে ঘটনার পুরা চিত্র কল্পনার চোখের সামনে নিয়ে আসা যাক। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে দুই ব্যক্তি জেলখানায় বন্দী হয়। উভয়ই স্বপ্ন দেখে। তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানার কৌতূহল জাগে। গোটা জেলখানার লোকদের মধ্যে যে কোন দিক থেকে কেবল ইউসুফ আলাইহিস সালামই তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, যাঁর কাছে তারা এ উদ্দেশ্য নিয়ে হাযির হতে পারে। অতএব সুধারণা ও সম্মানের আবেগ সহকারে তারা নিজেদের স্বপ্ন তাঁর কাছে খুলে বলে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিয়েই বিদায় দেননি বা সুধারণার আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাদের ওপর নিজের ব্যক্তিগত কামালিয়াতের প্রভাব জমানোরও চেষ্টা করে ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার করেননি। বরং তাদের এই আকর্ষণকে গণীমাত মনে করে তিনি তাদের সামনে দীনের দাওয়াত পেশ করেন যা তাদের অন্তরে স্থান করে নিতে সক্ষম।

আবার অপর দিকে দীনকে এমন ভংগীতে পেশ করেছেন যেন প্রসংগক্রমে কথাবার্তার মধ্যে দীনের কথাও এসে গেছে। ইচ্ছাপূর্বক কথা বলার জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা হয়নি। এই ঘটনা থেকে আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য এসে যায়। তা হচ্ছে একজন কৃষক বীজ বপন করার জন্য বৃষ্টির অপেক্ষায় যেভাবে ওৎ পেতে অপেক্ষা করতে থাকে অনুরূপভাবে হকের আহবানকারীকেও তার চারপাশের পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কখন কার অন্তরে তার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়ে যায়–যা তার দাওয়াতের বীজ বপন করার জন্য অনুকূল ঋতুর কাজ দিতে পারে।

দ্বিতীয়ত আরো জানা যায়, আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে কেউ যদি কখনো এরূপ সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে এই সুযোগ নষ্ট করাও ঠিক নয় এবং দাওয়াতের মহৎ উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে তাকে ব্যবহার করাও জায়েয নয়। এই ধরনের সুযোগ যখন কোন স্বার্থপর লোকের হাতে এসে যায় তখন সে তাকে দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করার পরিবর্তে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের উপায়ে পরিণত করার চেষ্টা করে। বর্তমান যুগে আমাদের আলেম সমাজ এবং পীর মাশায়েখগণ সাধারণভাবে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে আছেন। তারা যখন কাউকে নিজের দিকে আকৃষ্ট দেখতে পান তখন তারা খুব আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু তাদের আনন্দের প্রকৃতিটা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আনন্দের প্রকৃতি থেকে ভিন্নতর। বরং তাদের আনন্দকে একটি মাকড়শার আনন্দের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। মাকড়শা নিজের চারপাশে জাল বিস্তার করে মাছির আগমনের আশায় অপেক্ষা করতে থাকে। যখন সে কোন মাছিকে নিকটে আসতে দেখে তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে নাচতে শুরু করে–একটি মোটা তাজা শিকার হাতে এসে গেছে।

নবম মূলনীতিঃ হকের প্রতিটি আহবানকারীকে আলোচনা ও যুক্তি–প্রমাণ পেশ করার সময় দাওয়াতকৃত ব্যক্তির যোগ্যতা ও স্তরের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন বুদ্ধিজীবী সমাজকে যে ভংগীতে এবং যে ভাষায় আহবান করা হবে, সাধারণ পর্যায়ের লোকদের আহবান করার ক্ষেত্রে তার ভাষা ও ভংগী ভিন্নতর হবে। হকের আহবানকারীর জন্য নিছক এই ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, তার সাথেই পূর্ণ হক রয়েছে, অতএব আর যেসব দলের সাথে পূর্ণ হক নেই–তাদের সবাইকে এক কাতারে শামিল করে হাঁকিয়ে বেড়ানো মোটেই সংগত নয়। বরং তার কর্তব্য হচ্ছে–প্রতিটি দলের সঠিক মূল্যায়ন করে যার যে মর্যাদা নিরূপিত হয় তাকে সেই স্থানে রেখে দেয়া এবং তদনুযায়ী তাদের সামনে দাওয়াত পেশ করা। যেমন আহলে কিতাব

সম্প্রদায়ের সামনে দাওয়াত পেশ করার জন্য কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত হেদায়াত দান করেছেঃ

وَلاَ تُجَادِلُوا اَهلَ الكتبِ الاَّ بِالَّتِي هِيَ اَحسَنُ الاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنهُم وَقُولُوا اٰمَنَّا بِالَّذِى اُنزِلَ اِلَينَا وَاُنزِلَ اِلَيكُم وَالٰهُنَا وَالٰهُكُم وَاحِدٌ وَنَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ * (عنكبوت- ٤٦) ـ

"আর উত্তম পন্থা ছাড়া আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের সাথে বিতর্ক করনা। তবে তাদের মধ্যে যারা যালেম তাদের ব্যাপারে স্বতন্ত্র কথা। তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি সেই জিনিসের ওপর যা আমাদের কাছে নাযিল করা হয়েছে এবং সেই জিনিসের ওপরও যা তোমাদের কাছে নাযিল করা হয়েছে। আমাদের ইলাহ এবং তোমাদের ইলাহ একই। আমরা তাঁরই অনুগত।"–(সূরা আনকাবূতঃ ৪৬)

এখানে যে সর্বোত্তম পন্থায় আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের সাথে বিতর্ক ও আলোচনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে তার পন্থাও বলে দেয়া হয়েছে। তা হচ্ছে– যেসব দিক থেকে তারা তোমাদের সম–মর্যাদা সম্পন্ন অথবা যেসব বিষয়ে তাদের ও তোমাদের মধ্যে অংশীদারিত্ব রয়েছে তা স্বীকার করে নাও। তাহলে তাদের এবং তোমাদের মধ্যে ঘৃণা–বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা এবং দূরত্বের পরিবর্তে নৈকট্য সৃষ্টি হবে। অতপর তাদের কাছে দাবী করতে হবে যে, এই স্বীকৃত সত্যের ভিত্তিতে যেসব জিনিস মেনে নেয়া অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে সে ব্যাপারেও যেন তারা আমাদের সাথে একমত হয়ে যায়।

দাওয়াতকৃত ব্যক্তির ওপর দাওয়াতের এই পন্থার মনোস্তাত্বিক প্রভাব এই হবে যে–সে যখন দেখতে পাবে, আহবানকারী নিজেকে বিরাট কিছু মনে করছে না এবং নিজের দাওয়াতকেও কোন নতুন আবিষ্কার হিসাবেও পেশ করছে না, বরং এই দাওয়াতে তার যতটুকু অংশ রয়েছে তাও সে স্বীকার করে নিচ্ছে–তখন সে এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করার দিকে অগ্রসর হবে। যদি সে হঠকারী, একগুঁয়ে এবং অবাধ্য না হয়ে থাকে তাহলে দাওয়াতকে কবুল করেও নিতে পারে। যদি এরূপ না করা হয়, বরং বুদ্ধিজীবী সমাজ এবং আহলে কিতাব সম্প্রদায়কেও মূর্খ ও অশিক্ষিতদের মত একই ভংগীতে সম্বোধন করা হয়, তাহলে যারা আহবান–কারীর মতই জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং আসমানী কিতাবের দাবীদার–স্বাভাবিকভাবেই তাদের মান–সম্ভ্রমবোধ আহত হবে। আর এ জিনিসটি হককে গ্রহণ করার পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে।

দশম মূলনীতিঃ হকের আহবানকারী যদি আহবানকৃত ব্যক্তির মধ্যে অবাধ্যতা, অনমনীয়তা এবং হঠকারিতার আভাস পায় তাহলে সে যেন নিজের পক্ষ থেকে এই রোগ বৃদ্ধির কোন সুযোগ সৃষ্টি করে না দেয়। বরং তার থেকে বেঁচে থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এমনকি সম্বোধিত ব্যক্তি যদি আহবানকারীর কোন যুক্তি-প্রমানের ওপর এমন বিরোধিতা করে বসে যা প্রকাশ্যতই ঝগড়া ছাড়া আর কিছুই নয়-তাহলে এই যুক্তির পেছনে পড়ে যাওয়া এবং এর পক্ষে আরো যুক্তি পেশ করার পরিবর্তে তার সামনে অন্য দিক থেকে হককে পেশ করার কৌশল অবলম্বন করা উচিৎ- যাতে সে নিজের হঠকারিতা প্রকাশ করার সুযোগ না পায়। বরং তার মধ্যে যদি সত্যকে গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকে তাহলে সে তা কবুল করে নেবে। আর যদি শুধু হঠকারীই হয়ে থাকে তাহলে অন্তত হতভম্ব হয়ে থেকে যাবে, বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাদ করার সুযোগ পাবে না। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং এক বাদশার মধ্যে অনুষ্ঠিত বিতর্কের কথা কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে। এটা এক্ষেত্রে সর্বোত্তম উদাহরণঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرٰهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْقَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرٰهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (بقره- ٢٥٨) ـ

"তুমি সেই ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার রব সম্পর্কে এই কারণে বিতর্কে লিপ্ত হতে সাহস পেয়েছে যে, আল্লাহ তাকে রাজত্ব দান করেছেন? ইবরাহীম যখন তাকে বলল, তিনিই হচ্ছেন আমার রব যিনি জীবিত করেন এবং মারেন। সে বলল, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং জীবিত রাখি। ইবরাহীম বলল, আল্লাহ পূর্বদিক থেকে সূর্য উদিত করেন। তুমি তা পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখাও তো। এতে কাফের ব্যক্তি লা-জওয়াব হয়ে গেল। আল্লাহ যালেমদের হেদায়াত করেন না।"-(সূরা বাকারাঃ ২৫৮)

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যে দলীল পেশ করেছিলেন, প্রতিবাদকারীর প্রতিবাদের দরুন তার সামান্যও ক্ষতি হতনা। তিনি ইচ্ছা করলে এরপর আরো অনেক

কিছু বলতে পারতেন। কিন্তু দাওয়াতকৃত ব্যক্তির মনোস্তাত্বিক অবস্থা অনুমান করে নেয়ার পর যদি তিনি এর ওপর আরো বক্তব্য রাখতেন তাহলে সেটা কুরআন মজীদের শিখিয়ে দেয়া পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী হতঃ

ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ـ

"তোমার রবের পথে ডাক বুদ্ধিমত্তার সাথে ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্কে লিপ্ত হও।"–(সূরা নহলঃ ২৫)

নবীদের প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

দীনে হকের কোন দাওয়াতই দুনিয়াতে ফলপ্রসূ হতে পারে না যদি তার সাথে একটি ক্রমবিন্যস্ত ও স্থায়ী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী না থাকে। যে কোন ধরনের আন্দোলনের জন্য এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু বিশেষ করে একটি হকের দাওয়াতের ক্ষেত্রে তা এর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ছাড়া হকের দাওয়াতের কল্পনাই করা যায় না। এই বিপ্লব জীবনের কোন একটি দিককে প্রভাবিত করে না, বরং তার প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সব দিককে এক নতুন আলোকশিখা দান করে। এ আন্দোলন কোন আংশিক পরিবর্তনের দাবী নিয়ে উত্থিত হয়না, বরং আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনের জন্য একটি সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচ এবং পরিকল্পনা পেশ করে। এ কারণে তার মেজাজের দাবী হচ্ছে এই আন্দোলন যে ক্রমিকতা অনুসরণ করে সামনে অগ্রসর হয়, অনুরূপ ক্রমিক ধারা অনুযায়ী সম্পূর্ণ ভারসাম্যপূর্ণ একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীও থাকতে হবে। এটা মূল দাওয়াতের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং যদি বলা হয় যে, মূল দাওয়াতের চেয়ে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব কিছুটা বেশীই তাহলে এটা খুব বেশী বলা হবে না। কেননা এই প্রশিক্ষণের ফলেই কোন দাওয়াত হৃদয়ের মধ্যে শিকড় গাড়তে সক্ষম হয়, অতপর তা ক্রমবিকাশ লাভ করে, অতপর তা ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। অবশেষে একদিন নিজের উপকারিতা ও কল্যাণের দ্বারা গোটা সমাজকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

একজন হকের আহবানকারীর কাজের সঠিক দৃষ্টান্ত একজন চাষীর কাজের মাধ্যমে দেয়া যেতে পারে। কোন ক্ষেত্রে কিছু বীজ ছড়িয়ে দিলেই যেভাবে একজন কৃষকের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারে না, অনুরূপভাবে লোকদেরকে কিছু ওয়াজ-নসীহত শুনিয়ে দেয়ার মাধ্যমে একজন হকের আহবানকারীর কাজ সমাপ্ত হতে পারে না। বরং তার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে- তার নিজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত দাওয়াতের সাথে তখন গভীর সংযোগ থাকতে হবে- যেমন সংযোগ থাকে বীজের সাথে একজন কর্তব্য পরায়ণ কৃষকের। সে সর্বদা লক্ষ্য রাখে চারা গাছগুলো যাতে যমীনে শিকড় গাড়তে পারে, সঠিক সময়ে যাতে পানি সিঞ্চন করা হয়, ঋতুর প্রতিকূলতা থেকে যাতে নিরাপদ থাকতে পারে, তার পরিবর্ধনে যাতে আগাছা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে না পারে, কীট-পতংগ ও পশু-পাখীর আক্রমন থেকে যাতে

নিরাপদ থাকতে পারে। এসব দিকে লক্ষ্য রাখতে গিয়ে সে তার রাতের ঘুম এবং দিনের আরাম হারাম করে দেয়। সে অবিরতভাবে পরিশ্রম করতে থাকে, শস্য ক্ষেত্রের দেখাশুনায় ব্যস্ত থাকে। অতঃপর এক সময় সে তার নিজের পরিশ্রমের ফল পেয়ে যায়। অনুরূপভাবে হকের আহবানকারীও একটি পর্যায়ে পৌছে নিজের দাওয়াতকে ফুলে ফলে সুশোভিত দেখতে পায়–যখন সে দাওয়াতের সাথে সাথে প্রশিক্ষণের প্রাণান্তকর এবং দীর্ঘ অনুশীলনকে সহ্য করার সাহস ও যোগ্যতা রাখে। অন্যথায় একজন অলস কৃষকের রূপিত বীজ যেভাবে যমীন ও আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এবং পশুপাখী ও কীট পতংগের আক্রমণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যায়, অনুরূপভাবে একজন প্রচারকের দাওয়াতও মরুভূমির নিষ্ফল ক্রন্দনে পরিণত হতে পারে।

নবীদের দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের পন্থার ওপর গভীর মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা করলে সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের জন্য যেসব মূলনীতি পাওয়া যায় তার মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি আমরা এখানে উল্লেখ করব।

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের প্রথম মূলনীতি

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হচ্ছে এই যে, আহবানকারীকে দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের কাজে তাড়াহুড়া করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তাকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, শিক্ষা–প্রশিক্ষণের যে খোরাক সে সরবরাহ করেছে তা ভালভাবে হজম হয়ে লোকদের চিন্তা ও কাজের অংশে পরিণত হয়ে গেছে কিনা? এর সঠিক অনুমান না করেই যদি আরো খোরাক দেয়া হয় তাহলে এর পরিণতি পাকস্থলীর গোলমাল এবং বদ–হজমের আকারে প্রকাশ পাবে। যে লোক হকের আহবানকারীদের ইতিহাস পাঠ করেছে, সে এ সম্পর্কে অনবহিত নয় যে, প্রতিটি হকের আহবানকারীর দাওয়াতের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করার বিবিধ কারণ হতে পারে।

যেসব লোক দাওয়াতকে কবুল করে নিয়েছে তারা হকের স্বাদের সাথে এইমাত্র নতুনভাবে পরিচিত হয়েছে। এই নতুন পরিচিতি তাদের মধ্যে হকের প্রতি এমন আগ্রহ সৃষ্টি করে যে, তাদের কাছে প্রশিক্ষণের ধারাবাহিক কর্মসূচী খুবই কঠিন মনে হয়। তারা হকের লালসায় এতটা মগ্ন হয়ে পড়ে যে, তারা নিজেদের ক্ষুধা এবং হজম শক্তিরও সঠিক অনুমাণ করতে পারে না, আর সংগঠনের অন্যান্য দুর্বলদের দুর্বলতাকেও বিবেচনা করতে প্রস্তুত থাকে না। তারা নিজেদেরকে নিজেদের আসল মর্যাদা থেকেও অধিক অনুমাণ করে এবং নিজেদের সংগীদেরও তাঁদের যোগ্যতা

থেকে অধিক অনুমান করে। এ কারণে তাদের পক্ষ থেকে সব সময় দাবী ওঠে, "ম্যাপে অধিক আছে কি?"

এদের ছাড়া আরো একটি দল রয়েছে যারা এখনো দাওয়াতের বিরোধিতাকারী হিসাবে চিহ্নিত। তারা সব সময় দাওয়াতের দুর্বল দিকের অন্বেষণে লেগে থাকে। এরা যদি তাদের পেশকৃত কর্মসূচীতে নাক গলানোর কোন সুযোগ না পায় তাহলে এই দাবী উত্থাপন করে যে, তোমাদের পুরা পরিকল্পনা পেশ কর। তাদের উদ্দেশ্য কেবল এই যে, তাদের দাবীর জবাবে যদি তৎক্ষণাৎ কোন জিনিস পেশ না করা হয় তাহলে তারা জনগণের সামনে বলে বেড়াবার সুযোগ পাবে যে, এটা একটা উদ্দেশ্যহীন এবং লক্ষ্যহীন দল। তাদের সামনে কোন নির্দিষ্ট মঞ্জিলে মকসুদও নেই এবং সেই মঞ্জিল পর্যন্ত পৌছার কোন সুস্পষ্ট এবং পূর্ণাংগ কর্মসূচীও নেই। আর যদি কোন জিনিস পেশ করা হয়, তাহলে এর মধ্যে কোন না কোন ছিদ্র অন্বেষণ করে তা লোকদের দেখাতে পারবো আর যদি কোন ফাঁক খুঁজে না পায় তাহলে ছিদ্র সৃষ্টি করার চেষ্টা

উপরন্তু হকের একজন সত্যিকার আহবানকারীর মধ্যে হকের প্রচারের জন্য প্রবল আকাংখা নিহিত থাকে। তা এতটা শক্তিশালী হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তাআলার দেয়া হিকমত যদি তার পৃষ্ঠপোষকতা না করত ধৈর্য ও অপেক্ষা এবং ধারাবাহিকতা ও প্রশিক্ষণের যাবতীয় সীমা ও শর্ত সে লংঘন করে ফেলত। এই আগ্রহকে যখন উল্লেখিত বিবিধ দাবী উত্তেজিত করে দেয় তখন অনেক সময় এমন হয় যে, আহবানকারী মধ্যম পন্থা অবলম্বনের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। অথচ এই মধ্যম পন্থা অবলম্বন তার উদ্দেশ্যের সফলতা এবং সংগঠনের সঠিক প্রশিক্ষণের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। যদিও হকের জন্য সত্যিকার ভালবাসার দাবী হচ্ছে এই যে, হকের জন্য মানুষের মধ্যে লোভীদের মত ক্ষুধা থাকবে যা তাকে অস্থিরও করে রাখবে, ধৈর্যহীনও বানিয়ে দেবে এবং তাড়াহুড়া করতেও বাধ্য করবে। কিন্তু সংগঠনের প্রশিক্ষণের দাবীও হকের প্রতি মর্যাদাবোধ এবং ভালবাসার দাবীর চেয়ে কম গুরুত্ব রাখে না। এ কারণে একজন প্রচারকের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে, সে এই উভয়টির মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখবে। যদি প্রথম জিনিসটির দাবী তাকে তাড়াহুড়া করার জন্য ব্যাকুল করে দেয়- তাহলে দ্বিতীয় জিনিসটির দাবী যেন তাকে অপেক্ষা করতে বাধ্য করে। যদি হকের প্রতি আহবান করার আগ্রহ এবং হকের সহায়তার আবেগ তাকে আগ্রহী লোকদের আগ্রহকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ছেড়ে না দিতে বাধ্য করে এবং দীনের পথে বাধা দানকারীদের সামনে চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হতে না দেয়- তাহলে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সে যেন পাত্রের ধারণ ক্ষমতায় অধিক পানি না ঢেলে দেয়।

যদি কখনো এমন হয়ে থাকে যে, প্রথমটির আবেগ এতটা প্রবল হয়ে গিয়েছিল যে, দ্বিতীয় জিনিসটির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি দেয়া সম্ভব হয়নি, তাহলে সংগঠনের প্রশিক্ষণের মধ্যে এমন ত্রুটি রয়ে গেছে যার প্রতিকার পরে আর সম্ভব হয়নি। এই ছিদ্র দিয়ে শয়তান সংগঠনের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে ফিতনা এবং মোচা উৎপাদন করেছে এবং গোটা জামায়াত তার ছড়ানো বিপর্যয় ও বিশৃংখলার আওতায় এসে গেছে। এর সবচেয়ে দুঃখজনক দৃষ্টান্ত আমরা বনী ইসরাঈলের ইতিহাসে দেখতে পাই। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন মিসর থেকে বের হয়ে সাইনা উপত্যকায় পৌছলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে শরীআতের নির্দেশাবলী সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তুর পার্বত্যে ডেকে নিলেন এবং এ উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করলেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এই নির্দিষ্ট দিনের পূর্বেই তুর পাহাড়ে পৌছে গেলেন। আল্লাহর নির্দেশ অবগত হওয়ার এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের যে আবেগ তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল, প্রথমত তা এতটা প্রবল ছিল যে, আল্লাহর তরফ থেকে ইংগিত পাবার পর সময় এবং তারিখের অনুসরণ করা তাঁর জন্য কষ্টকর ছিল। দ্বিতীয়ত, জাতির পক্ষ থেকে একের পর এক যে দাবী উত্থাপিত হচ্ছিল তার দ্বারাও এই আবেগ আরো উত্তেজিত হয়ে থাকতে পারে। যদিও এটা ছিল অতি উচ্চ ও প্রশংসনীয় আবেগ, আরেক দিক থেকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তুর পাহাড়ে পৌছে যাওয়া একথারই প্রমাণ বহন করছিল যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশ জানার জন্য খুবই অস্থির এবং উদ্বিগ্নমনা ছিলেন।

কিন্তু এই ব্যাপারটির ওপর আপত্তি তোলারও একটি দিক ছিল– যেদিকে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দৃষ্টি পড়েনি। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অবিলম্বে ডেকে নেয়ার পরিবর্তে তাঁর জন্য যে একটি বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করেছিলেন– এর দ্বারা আল্লাহর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মূসা (আ) এই অবকাশটুকু জাতির প্রশিক্ষণের কাজে ব্যয় করবেন এবং তাদেরকে যে মৌলনীতির শিক্ষা দেয়া হয়েছিল তা তাদের অন্তরে শক্তভাবে বসিয়ে দেবেন। তাহলে তারা কঠিন পরীক্ষা এবং বিপদের সম্মুখীন হওয়ার পরও নিজেদের ঈমান ও ইসলামকে নিরাপদ রাখতে পারবে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আরো অধিক নির্দেশ জানার আগ্রহ তার ওপর এতটা প্রভাবশালী হয়ে পড়ে যে, প্রশিক্ষণের গুরুত্বের অনুভূতি এই আগ্রহের সামনে পরাভূত হয়ে যায়। এর পরিণতি এই দাঁড়ালো যে, আল্লাহর দীনের দুশমনেরা তাঁর এই অনুপস্থিতি এবং জাতির দুর্বলতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল এবং জাতির একটা বিরাট অংশকে গরুর বাছুর পূজায় লিপ্ত করে দিল। এই অনাচারের সমস্ত দায়দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের তাড়াহুড়া প্রিয়তার

ওপর রাখছেন। যদিও তিনি শিক্ষা–প্রশিক্ষণ ও দাওয়াতের কাজেই ব্যাপৃত ছিলেন, কিন্তু এই তাড়াহুড়া প্রশিক্ষণের দায়িত্বের ক্ষেত্রে অমনোযোগিতার কারণ সাব্যস্ত হল। অতএব কুরআন মজীদ তাঁর এই তাড়াহুড়া এবং এর পরিণতি নিম্নোক্ত বাক্যে উল্লেখ করেছেঃ

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَى قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى * قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (طه ٨٣–٨٥)

"আর তুমি নিজের জাতিকে পরিত্যাগ করে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কেন চলে আসলে হে মুসা? সে বলল, তারা আমার পেছনেই আসছে। আর আমি তাড়াহুড়া করে তোমার দরবারে চলে এসেছি–হে খোদা, তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। তিনি বললেন, আচ্ছা, তাহলে শোন! আমরা তোমার পেছনে তোমার জাতিকে পরীক্ষার সম্মুখীন করে দিয়েছি এবং সামেরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে।"–(সূরা ত্বহাঃ ৮৩–৮৫)

এ আয়াত থেকে জানা গেল, জনগণকে আল্লাহর নির্দেশ এবং আইন–কানুন সম্পর্কে অবহিত করানো একজন আহ্বানকারীর যেমন অবশ্য কর্তব্য, অনুরূপভাবে পূর্ণ ধৈর্য ও দূরদর্শিতা সহকারে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়াও তার অবশ্য কর্তব্য। তাহলে দীনের শিক্ষা তাদের চিন্তা–চেতনা ও ব্যবহারিক জীবনে এতটা মজবুত হয়ে যাবে যে, কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও তারা এই শিক্ষার ওপর অবিচল থাকতে পারবে। যে আহ্বানকারী কেবল শিক্ষা–প্রশিক্ষণের দিকটির ওপর নজর রাখে এবং এই জিনিসের আকর্ষণ তার ওপর এতটা প্রভাবশালী হয়ে পড়ে যে, প্রশিক্ষণের জন্য যে ধৈর্য ও ধীরস্থিরতা প্রয়োজন সে তার হক আদায় করতে পারে না। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে–সেই অস্থির বিজয়ী বীর যে বিজিত এলাকায় নিজের কদম মজবুত করার চিন্তা না করেই কেবল সামনের দিকে ধাবিত হয়। এই ধরনের তাড়াহুড়ার পরিনাম কেবল এই হতে পারে যে, একদিকে সে এলাকার পর এলাকা দখল করে সামনে অগ্রসর হতে থাকবে, অপরদিকে এই বিজিত এলাকায় বনভূমির অগ্নিকাণ্ডের মত বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়বে।

সূরা তাহায় হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জাতির এই শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত পেশ করে আল্লাহ তাআলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাড়াহুড়া সম্পর্কে

সতর্ক করে দেন—বা আল্লাহর নির্দেশ জানার জন্য তাঁর মধ্যে বর্তমান ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও জনগণের প্রতি নিজের স্বভাব সুলভ আগ্রহ ও জাতির তাড়াহুড়ার কারণে চাইতেন যে, আল্লাহর অহী দ্রুত নাযিল হোক। তাহলে তিনি নিজের জ্ঞান আহরণের আগ্রহকেও শান্ত করতে পারতেন এবং জাতির দাবীকেও পূর্ণ করতে পারতেন। অতএব যখন অহী নাযিল হত, তিনি এই আগ্রহের আতিশয্যে একজন উৎসাহী ছাত্রের মত তা আয়ত্ব করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করতেন। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে এজন্য সতর্ক করেছেন যে, অহীর পূর্ণতার জন্য যে সময়সীমা নির্দিষ্ট রয়েছে তার পূর্বে গোটা কুরআন নাযিল করে দেয়ার জন্য তাড়াহুড়া করনা। তোমার অন্তরকে মজবুত করার জন্য এবং তোমার জাতির প্রশিক্ষণের জন্য এই অবকাশ এবং বিরতি দেয়া হচ্ছে। তাহলে তোমাকে যা কিছু শেখানো হচ্ছে তুমি তা ধারণ করতে পারবে এবং তোমার জাতিও তা গ্রহণ করার ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে।

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْانِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضٰى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا اِلٰى اٰدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهٗ عَزْمًا (طه- ١١٤-١١٥)

"কুরআনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করনা, যতক্ষণ তোমার প্রতি এর অহী পূর্ণতায় না পৌঁছে যায়। [অবশ্য] এই দোয়া করতে থাক, হে প্রভু! আমাকে আরো অধিক জ্ঞান দান কর। ইতিপূর্বে আমরা আদমের ওপর একটি দায়িত্ব দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা ভুলে গিয়েছিল। আর আমরা তার মধ্যে সংকল্পের ওপর কোন দৃঢ়তা পাইনি।"—(সূরা ত্বহাঃ ১১৪, ১১৫)

এই আয়াতের শেষাংশে তাড়াহুড়া করা থেকে বিরত থাকা এবং প্রশিক্ষণের গুরুত্ব পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে এই স্বভাবগত দুর্বলতা রয়েছে যে, আশা-আকাংখা ও আগ্রহের সামনে তার প্রতিজ্ঞা দুর্বল হয়ে যায়। এজন্য প্রয়োজন হচ্ছে—তার ওপর যে দায়িত্ব অর্পন করা হবে সে সম্পর্কে পূর্ণ চেতনা ও অনুভূতি সৃষ্টি করার জন্য তাকে উত্তমরূপে প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তাহলে সে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও নিজেকে অবিচল রাখতে পারবে।

এই প্রশিক্ষণের দাবী অনুযায়ী কুরআন মজীদ অল্প অল্প করে নাযিল করা হত। এর ওপর অধৈর্য বিরুদ্ধবাদীরা অভিযোগ উত্থাপন করত যে, কুরআন মজীদ যদি

আল্লাহর কিতাব হয়ে থাকে তাহলে তা অল্প অল্প করে নাযিল হচ্ছে কেন? আল্লাহর জ্ঞান তো বর্তমান–ভবিষ্যৎ সব কিছুতেই বেষ্টন করে আছে, তাঁকে তো চিন্তা করার প্রয়োজন হয়না, পরীক্ষা–নিরীক্ষা করারও প্রয়োজন পড়ে না এবং কোন সামগ্রিক কল্যাণের দিকেও নজর রাখার প্রয়োজন হয়না। তাহলে শেষ পর্যন্ত কি কারণে তিনি গোটা কুরআন শরীফ একই সময় নাযিল করেন না? অতএব একথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করছে যে, এটা মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেরই রচিত গ্রন্থ। চিন্তা–ভাবনা এবং পরিশ্রম ও অনুশীলনের পর যতটা পরিমাণ তৈরী করতে পারে তা উপস্থাপন করে দেয়।

এই অভিযোগের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই অনেক মুসলমানের ওপরও পড়েছিল এবং এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র হৃদয়েও অত্যন্ত অসহনীয় ঠেকছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বিরুদ্ধবাদীদের অভিযোগেরও কোন গুরুত্ব দেননি এবং দোষ অন্বেষণকারীদের এই অভিযোগ ও জ্ঞানার্জনের স্বভাবসুলভ আগ্রহের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাথীদের অন্তরে যে বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল– তারও কোন গুরুত্ব দেননি। বরং তিনি বলেছেন, তোমার এবং তোমার সাথীদের প্রশিক্ষণের দাবী হচ্ছে এই যে, আমার নির্দেশ সমূহ অল্প অল্প করে ধারাবাহিকভাবে নাযিল হবে। তাহলে তোমার হৃদয়ও তা বরদাশত করার জন্য পূর্ণরূপে শক্তিশালী হয়ে যাবে এবং জামাআতের শক্তিমান ও দুর্বলেরাও ভালভাবে তা গ্রহণ করে নিতে পারবে। যদি তাড়াহুড়া কর তাহলে তোমার উম্মাতের মধ্যে দুর্বলতা থেকে যাবে। এবং সামেরী যেভাবে বণী ইসরাঈলের সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করেছে–অনুরূপ ভাবে তোমার উম্মাতের মধ্যে কোন সামেরী জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করবে।

কুরআন নাযিলের ব্যাপারে আমরা যে ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করছি, সাহাবীগণ এবং তাদের পরবর্তীকালের লোকেরাও তা শেখার এবং শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে হুবহু এই ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন। এর সামগ্রিক কল্যাণও ঠিক তাই ছিল যে, যেসব লোক তা শিখবে–এমনভাবে শিখবে যেন তা তাদের মন–মগজের মধ্যেও বসে যায় এবং তাদের বাস্তব জীবনও তার রংএ রঞ্জিত হয়ে যায়। এটা কেবল এই অবস্থায়ই সম্ভব ছিল যে, কুরআনের জ্ঞানও লোকদেরকে ধারাবাহিকভাবে অল্প অল্প করে দেয়া হবে এবং সাথে সাথে এই জ্ঞান অনুযায়ী তাদের প্রশিক্ষণও দেয়া হবে। অতএব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন,

قال كان الرجل منا اذا تعلم عشر آيات لم يجاوز هن حتى يعلم معانيهن والعمل بهن -

"আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই কুরআনের দশটি আয়াত শিখে নিত সে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে নিয়ে তদনুযায়ী নিজের বাস্তব জীবনকে গড়ে তোলার পূর্বে সামনে অগ্রসর হত না"-

দ্বিতীয় মূলনীতি

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের দ্বিতীয় মূলনীতি হচ্ছে এই যে, আহবানকারী সংখ্যার চেয়ে গুনের দিকে বেশী নজর রাখবে। কখনো কখনো অবস্থা এই হয় যে, 'হারানো মেষের সন্ধান' করার আগ্রহ আহবানকারীর ওপর প্রভাবশালী হয়ে পড়ে যে, সে পালের মেষগুলো সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে পড়ে। এই অমনোযোগিতার পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, সে তো হারানো মেষগুলোর সন্ধানে মাঠ-জংগল চষে বেড়ায়, আর এদিকে পালের মেষগুলো হয় খাদ্যের অভাবে মরতে থাকে অথবা কোন নেকড়ে বাঘ বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে পড়ে এগুলোকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আপনজনকে উপেক্ষা এবং পরকে আপন করার এই আগ্রহ হকের আহবানকারীর মধ্যে নেহায়েত উত্তম আবেগ থেকেই সৃষ্টি হয়। তার ওপর প্রচার কার্যের জোশ এতটা প্রবল হয়ে যায় যে, প্রশিক্ষণের দায়িত্বানুভূতি তার সামনে হয় পরাভূত হয়ে যায় অথবা অন্তত পক্ষে পেছনে পড়ে যায়। সে এই কথার ওপর অধিক গুরুত্ব দিতে থাকে যে, যেসব লোক খোদাদ্রোহী এবং নাফরমাণ, তারা প্রথমে আল্লাহর নাম উচ্চারণকারী হয়ে যাক, অতপর তাদের প্রশিক্ষণ ও সংশোধণ পরে হতে থাকবে।

বাহ্যত এটা একটা সৎ উদ্দেশ্য, কিন্তু যদি এর গভীরে চিন্তা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, গুণ ও মানের ওপর সংখ্যাধিক্যকে অগ্রাধিকার দেয়ার মূল কারণ এখানেই নিহিত রয়েছে। অতপর আরো সামনে অগ্রসর হয়ে এই ভ্রান্ত দৃষ্টি ভংগী সৃষ্টি হয়ে যায় যে, লোকেরা হৃদয়ের পরিবর্তে মাথার পরিসংখ্যান নিয়ে পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হয়ে যায়। হকের আহবানকারীদের এই ভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্য কুরআন মজীদ তাঁদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছে যে, যেসব লোক হকের দাওয়াতের সাথে পরিচিত নয় তাদেরকে ডাকার এবং আপন করে নেয়ার আগ্রহ এতটা প্রবল হওয়া উচিৎ নয়-যার ফলে দাওয়াত গ্রহণকারী লোকদের হক মারা যেতে পারে-যারা এখন প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধির জন্য অপেক্ষায় রয়েছে এবং এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে।

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (الحجر– ٨٨) ـ

"এবং তাদের [কাফের] কোন কোন দলকে আমরা যে পার্থিব সম্পদ দিয়ে রেখেছি–তুমি সেদিকে তাকাবে না এবং তাদের প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতির জন্য দুঃখ বোধ করবে না, বরং ঈমানদার লোকদের নিজের অনুগ্রহের ছায়াতলে নিয়ে নাও।"–(সূরা হিজরঃ ৮৮)

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ه

"আর তোমার দিলকে সেই লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখ যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তোষ লাভের আশায় সকাল–সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। তাদের সম্পর্কে অন্যমনস্ক হয়ে তোমার দৃষ্টি যেন পার্থিব জীবনের ভোগবিলাসের দিকে না যায়।"–(সূরা কাহাফঃ ২৮)

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ

"সে ভ্রু কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফেরাল– এই কারণে যে, তার কাছে এক অন্ধ ব্যক্তি এসেছে। তুমি কি জান সে হয়ত পরিশুদ্ধ হবে, অথবা উপদেশ গ্রহণ করবে এবং উপদেশ তার উপকারে আসবে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তুমি তার পিছে লেগে গেছ।"–(সূরা আবাসাঃ ১–৬)

উল্লেখিত সব আয়াতগুলোতে আহবানকারীকে এই হেদায়াত দান করা হয়েছে যে, যেসব লোক দাওয়াত কবুল করে নিয়েছে, তারা যদিও সংখ্যার দিক থেকে কম এবং মর্যাদার দিক থেকে সাধারণ, কিন্তু তাদের প্রশিক্ষণে যে সময় ব্যয় হওয়া উচিৎ–তা যেন প্রভাবশালী লোকদের পেছনে নষ্ট করা না হয়। কারণ তাদের এই প্রভাব দাওয়াতের উপকারে আসার সম্ভাবনা থেকে থাকলেও কিন্তু তারা গর্ব–অহংকারের নেশায় মাতাল এবং দাওয়াতের প্রতি অসন্তুষ্ট।

তৃতীয় মূলনীতি

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের তৃতীয় মূলনীতি এই যে, যেসব মূলনীতির ওপর সংগঠনের ভিত্তি স্থাপিত–সংগঠনের কোন বিভাগেই যেন তা থেকে বিচ্যুতি না ঘটে বা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের রোগ ছড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি না হয়। যদি এ ধরনের কোন বিশংখলা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেখা যায় তাহলে সংগঠনের পরিচালকবৃন্দ এবং কর্মকর্তাদের দায়িত্ব হচ্ছে, বিশৃংখলা ছড়িয়ে পড়ার পূর্বে তার মূলোচ্ছেদ করার চিন্তা করা। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন স্বার্থ, অথবা উদারতা বা কোনরূপ হুমকি বা কারো ভালবাসা যেন প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়াতে পারে। এ ব্যাপারে সামান্য অবহেলা বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেমন এরূপ সামান্য অবহেলার সুযোগে মূসা আলাইহিস সালামের জাতির এক বিরাট অংশ আল্লাহর ইবাদত করার স্থলে বাছুর পূজায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই ধরনের বিশৃংখলার মূলোচ্ছেদ করার জন্য সংগঠনের নেতাদের শুধু শক্তিমান হৃদয়ের অধিকারী হলেই চলবে না, বরং কিছুটা কঠোর মনের অধিকারী হলেও কোন দোষ নেই। তাহলে নির্মমভাবে এই বিশৃংখলার মূল শিকড়সহ উপড়ে ফেলে দূরে নিক্ষেপ করতে পারবে।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন নিজের জাতির মধ্যে শিরকের ফিৎনা ছড়িয়ে পড়ার খবর জানতে পারলেন, তখন তিনি তূর পাহাড় থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম সেই লোকদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করেন– যারা তাঁর অনুপস্থিতিতে জাতির তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল এবং যাদের নমনীয়তা ও উদারতার সুযোগে এই বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। অতপর তিনি আসল অপরাধীদেরকে তাদের নিজ নিজ গোত্রের লোকদের দ্বারা হত্যা করিয়েছিলেন। যাতে প্রতিটি লোকের সামনে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, যেসব লোক সংগঠনের অভ্যন্তরে এ ধরনের বিশৃংখলা ছড়াবে–তারা নিজেদের রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকেও কোনরূপ সাহায্য-সহানুভূতি লাভ করার আশা করতে পারে না। উপরন্তু তিনি সামেরীর গড়া মূর্তিকেও ভেংগে খান খান করে দেন, যাতে ফিৎনার চিহ্ন মাত্রও জাতির মধ্যে অবশিষ্ট না থাকতে পারে। তিনি সামেরীকে এমন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেন যা তার গোটা জীবনের জন্য গলার বেড়ি হয়ে থাকল।

সংগঠনকে এ ধরনের বিপর্যয় থেকে মুক্ত রাখার জন্য ইসলাম এই বিধান দিয়েছে যে, সংগঠনের কোন ব্যক্তির মধ্যে যখন সাংগঠনিক মূলনীতি থেকে বিচ্যুতি পাওয়া যাবে, তখন গোটা সংগঠনের দায়িত্ব হচ্ছে–তার প্রতিরোধ এবং সংশোধনের চেষ্টা করা। সংগঠন যদি তা না করে, বরং লোকদেরকে যা ইচ্ছা তাই করতে দেয়া

হয় তাহলে তাদের অপরাধের কুফল তাদের পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং সংগঠনের ফাসেক এবং মুত্তাকী সবাই তাতে অংশীদার হয়ে যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমুদ্রযানের উপমা দিয়ে এই জিনিসের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যদি কোন যাত্রী সমুদ্র যানের তলদেশ ছিদ্র করতে উদ্ধত হয় এবং অন্য যাত্রীরা তাকে একাজ থেকে বিরত না রাখে তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হবে যে, সমুদ্রযানও ডুবে যাবে এবং এক ব্যক্তির দুষ্কর্মের শাস্তি সবাইকে ভোগ করতে হবে। অনুরূপভাবে কোন সংগঠন যদি তার নিজের ভেতরে অবস্থানকারী দুষ্কৃতকারীদের সাথে উদার ব্যবহার করে তাহলে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে এই যে, এই দুষ্কৃতকারীরা যে বিপদ ডেকে আনবে গোটা সংগঠন তার শিকার হবে। কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত বাক্যে এই বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছেঃ

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (الانفال- ٢٥) ـ

"দূরে থাক সেই বিপর্যয় থেকে–যার অশুভ পরিণাম বিশেষ করে কেবল তোমাদের সেই লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না যারা গুনাহ করেছে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ বড় কঠিন শাস্তি দানকারী।"–(সূরা আনফালঃ ২৫)

এই ফরজ আদায় করার জন্য সংগঠনের বিভিন্ন সোপান অনুযায়ী কর্মপন্থাও বিভিন্ন হবে। কিন্তু মূল ফরজ থেকে সংগঠন কোন অবস্থায়ই দায়িত্বমুক্ত হতে পারে না।

প্রাথমিক পর্যায়ে যখন সংগঠনের কোন রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাব থাকে না, তখন যেসব লোক সংগঠনের মূলনীতি সমূহ লংঘন করে–সংগঠনের মেজাজ তাদেরকে নিজের মধ্য থেকে ছাটাই করে পৃথক করতে থাকে। সে প্রথমত এমন লোকদের নিজের মধ্যে স্থানই দেয় না যারা তার রংএ উত্তমরূপে রঞ্জিত না হয়। যদি এ ধরনের স্থবির লোক কোন মতে সংগঠনের মধ্যে ঢুকেও পড়ে, তাহলে যেভাবে একজন সুস্থ মানুষের পাকস্থলীতে মাছি ঢুকেও বেশীক্ষণ থাকতে পারে না– অনুরূপভাবে এই ধরনের লোক এই ব্যবস্থার মধ্যে টিকতে পারে না। যদি প্রাথমিক পর্যায়েই কোন সংগঠনের অবস্থা এই হয় যে, তার মূলনীতিসমূহ লংঘনকারী লোকেরা এর অভ্যন্তরে নির্বিঘ্নে লালিত পালিত হতে পারে– তাহলে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এই সংগঠনের কোন মেজাজই গড়ে ওঠেনি এবং অতি দ্রুত এই সংগঠন বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ যখন সংগঠনের রাজনৈতিক শক্তি অর্জিত হয়–তখন সংগঠনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা থাকে–যাতে এর অভ্যন্তরে বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী উপাদান জন্ম নিতে বা অনুপ্রবেশ করতে না পারে। সে তার প্রতিরোধ করার জন্য প্রচার ও প্রশিক্ষণের সাধারণ উপায়–উপাদানের সাথে যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে শক্তিও ব্যবহার করে। এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান যদি পূর্ণ দায়িত্বানুভূতির সাথে নিজের যিম্মাদারী আদায় করে তাহলে গোটা সংগঠন দায়িত্বমুক্ত থাকে। কিন্তু খোদা না করুন যদি এই প্রতিষ্ঠান বিপথগামী হয়ে পড়ে তাহলে গোটা সংগঠনের দায়িত্ব হচ্ছে–এর সংশোধনের জন্য 'আমীর বিল–মারুফ এবং নাহী আনিল মুনকারের' (ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা অন্যায়ের প্রতিরোধ) পতাকা নিয়ে অগ্রসর হবে এবং যতক্ষণ তার সংশোধন না হবে–আরামের ঘুম ঘুমাতে পারবে না। এই সংশোধনের দাওয়াতের সীমা কুরআন মজীদ নির্ধারণ করে দিয়েছে। তা হচ্ছে, সংশোধনের আহবানকারীগণ সংশোধনের আওয়াজ তুলেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে না, বরং অপরাধীদের কর্মপন্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করে এই অপরাধ থেকে নিজেদেরও মুক্ত করে নেবে।

চতুর্থ মূলনীতি

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের চতুর্থ মূলনীতি হচ্ছে এই যে, দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে যতদূর সম্ভব লোকদেরকে তালীম ও দাওয়াতের মূল কেন্দ্রের সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য তাকিদ করতে হবে এবং তার উপায় উপাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যে পর্যায়ে সংগঠনের মেজাজ কেবল গড়ে উঠছে–সেই পর্যায়ে উপযুক্ত পরিবেশ এবং মূল কেন্দ্রের সাথে সরাসরি সংযুক্তি সঠিক প্রশিক্ষণের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজনীয় জিনিস। এই পর্যায়ে যদি এই দু'টি জিনিসকে অবহেলা করা হয়, তাহলে সংগঠনের এমন লোক খুব কমই সৃষ্টি হবে–যারা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক উভয় দিক থেকে এতটা শক্তিশালী হবে যে, নিজেরাও এ রংএ নিজেদের রঞ্জিত করতে পারবে এবং অন্যদেরও রঞ্জিত করতে পারবে। বরং উল্টো দিকে এমন অনেক লোক সৃষ্টি হয়ে যায় যাদের ওপর দাওয়াতের রং এতটা হালকা থাকে যে, পরীক্ষার একটি মাত্র কঠিন স্তর অতিক্রম করার সাথে সাথে তা বিলীন হয়ে যায়। এই ধরনের লোক বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকেও এতটা পরিপক্ক হয়না যে, অন্যের মধ্যে দাওয়াতের সঠিক চেতনা সৃষ্টি করতে পারে, আর জীবনাচারের দিক থেকেও এতটা মজবুত নয় যে, অনুকূল প্রতিকূল যেকোন অবস্থায় নিজের প্রচারকার্য অব্যাহত রাখতে পারে। এর পরিণতি এই দাঁড়ায় যে, যতক্ষণ কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বর্তমান থাকে–লোকদের

মধ্যে এই দাওয়াতের চর্চা বর্তমান থাকে। কিন্তু যখনই তার অন্তর্ধান ঘটে সমস্ত কোলাহল ঠান্ডা হয়ে যায়।

ইসলামে হিজরতের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার মধ্যে যে অনেক কৌশল নিহিত ছিল তার একটি বড় কৌশল ছিল এই যে, সমস্ত মুসলমান সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সান্নিধ্যে এসে লাভবান হতে পারবে এবং একটি অনুকূল পরিবেশে অবস্থান করে ইসলামের রং তাদের ওপর উত্তমরূপে ছেয়ে যাবে। যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দাওয়াত ও তালীমের মূল কেন্দ্র থেকে কায়দা উঠানো সম্ভব নয়–সেখানে ইসলামের দাওয়াতের দাবী হচ্ছে অন্তত প্রত্যেক এলাকার প্রতিভাবান এবং নেককার ব্যক্তিগণ দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের কেন্দ্রে আসবে এবং দীনের জ্ঞান লাভ করার পর যখন নিজ এলাকায় ফিরে যাবে তখন তাদেরকে দীন সম্পর্কে অবহিত করবে।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ * (توبه– ١٢٢) ـ

"আর সব মুসলমানদের পক্ষে জ্ঞানার্জনের জন্য বের হয়ে পড়া সম্ভব ছিল না। অতএব এরূপ কেন হল না যে, তাদের প্রতিটি দল থেকে একটি করে প্রতিনিধি দল বের হয়ে পড়ত এবং দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করত। এবং যখন তারা ফিরে আসত তখন নিজ নিজ গোত্রকে সতর্ক করত। তাহলে তারাও খোদাভীতির পথ অবলম্বন করত।"–(সূরা তওবাঃ ১২২)

পঞ্চম মূলনীতি

সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের পঞ্চম মূলনীতি হচ্ছে এই যে, সংগঠনের সামনে পরীক্ষার যে সুযোগ আসবে তাতে সংগঠনের ভুল ভ্রান্তি এবং স্থবিরতার ওপর পূর্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। পরীক্ষার মুহূর্ত যখন শেষ হয়ে যাবে, শান্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ এসে যাবে তখন প্রতিটি ভুল এবং স্থবিরতা সম্পর্কে নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করতে হবে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতা যেসব আকীদাগত স্থবিরতার ইংগিত করছে তাকে পরিষ্কারভাবে লোকদের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রথম প্রথম এই পর্যালোচনার সম্বোধন সাধারণভাবে হওয়া উচিৎ। এর উপকারিতা এই হবে যে, প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ স্থানে এই পর্যালোচনার দ্বারা সতর্ক হতে পারবে এবং স্বভাব–প্রকৃতিতে সংশোধনের যোগ্যতা থাকলে তার দ্বারা লাভবানও হবে। প্রথম

পর্যায়েই নির্দিষ্টভাবে শুধু ভুলকারীদের নাম ধরে ধরে তিরস্কার করার ফলে তাদের মধ্যে অপমানবোধ জাগ্রত হয়। এর ফলে তাদের মধ্যে সংশোধনমূলক অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরিবর্তে একগুঁয়েমী এবং হঠকারিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যায়। অবশ্য যখন কোন গ্রুপ সম্পর্কে বারবার তথ্যানুসন্ধান করার পরও এটা প্রমাণিত হয় যে, তারা কেবল কোন মানসিক জটিলতার কারণে অথবা ঘটনাক্রমে সংগঠনের মূলনীতি লংঘন করে না, বরং উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই তারা মুনাফেকী নীতিকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করে নিয়েছে–তাহলে এদেরকে সরাসরি নিজেদের ভুলের জন্য সতর্ক করতে হবে এবং গোপনীয়তা ও সহানুভূতির পন্থা পরিবর্তন করে দিতে হবে। এদের জন্য এটা হবে সর্বশেষ সতর্কিকরণ। এরপরও তারা যদি নিজেদের সংশোধন করে না নেয়, তাহলে এ ধরনের লোকদের নিজের ভিতর থেকে ছাটাই করে ফেলাই হচ্ছে সংগঠনের কর্তব্য।

রসূলুল্লাহ (স) মোনাফিকদের ব্যাপারে এই পন্থাই অবলম্বন করেছেন এবং সাংগঠনিক প্রশিক্ষণের দিক থেকে এটা বুদ্ধিজ্ঞান ও স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ। যে ব্যক্তি কুরআন মজীদের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে সে জানে যে, ইসলামের ইতিহাসে বদরের যুদ্ধই ছিল পরীক্ষার প্রথম সুযোগ। এই যুদ্ধেই প্রমাণিত হয় যে, সংগঠনের অভ্যন্তরে কিছু সংখ্যক মোনাফিক আত্মগোপন করে আছে। যুদ্ধের পরিস্থিতি অতিক্রান্ত হওয়ার পর কুরআন মজীদ এই লোকদের কার্যকলাপের কঠোর সমালোচনা করে। সূরা আনফাল থেকে এর সাক্ষ্য পাওয়া যাবে। কিন্তু ঐ সময় সুনির্দিষ্টভাবে তাদেরকে সরাসরি সম্বোধন করে তাদের তিরস্কার করাও হয়নি এবং সংগঠন থেকেও বহিষ্কার করা হয়নি। এরপর প্রতিটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই লোকেরা নিজেদের দুর্বলতা প্রদর্শন করতে থাকে। কিন্তু সাধারণ সমালোচনা এবং উপদেশ ছাড়া কুরআন মজীদ সরাসরি তাদের ওপর কোন আঘাত হানেনি। তবুকের যুদ্ধের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত এই অবস্থা বিরাজিত থাকে। কিন্তু এই লোকদের ওপর যখন প্রমান চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং একথা পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তাদের দুষ্কর্ম ও ঔদ্ধত্য কোন অজ্ঞতা বা সাময়িক পরাজিত মনোভাবের ফল নয়, বরং তারা যা কিছু করছে বুঝে শুনে ঠাণ্ডা মাথায়ই করছে–তখন তাদেরকে ছাটাই করে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হয়।

১২

হকের আহ্‌বানকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হকের আহ্‌বানকারীই হোক অথবা বাতিলের আহ্‌বানকারীই–তাদের কাউকেই আল্লাহ তাআলা দাওয়াত এবং প্রেরণার অধিক কোন কিছু ক্ষমতা দান করেননি। কোন নবীরও এই ক্ষমতা ছিলনা যে, তিনি কারো অন্তরে হেদায়াত ঢেলে দিতে পারেন এবং শয়তানের এই ক্ষমতা নেই যে, সে কোন ব্যক্তিকে ভ্রান্ত পথে লাগিয়ে দেবে। তাদের প্রত্যেকের কেবল এতটুকু ক্ষমতা আছে যে, তারা নিজ নিজ পথের দিকে আল্লাহর সৃষ্টিকে ডাকতে পারে। হেদায়াত অথবা গোমরাহী অবলম্বন করা দাওয়াতকৃত ব্যক্তির নিজের পছন্দ এবং আল্লাহর বিশেষ তৌফিক বা সহজলভ্যতার ওপর নির্ভশীল। এই তৌফিক এবং সহজলভ্যতার জন্য আল্লাহ তাআলা একটি নিয়ম নির্ধারন করে দিয়েছেন। এই নিয়ম অনুযায়ী তিনি নিজের সুস্থ প্রকৃতির এবং হেদায়াতের আকাংখী বান্দাদের নবীদের রাস্তায় চলার তৌফীক দান করেন এবং বক্র স্বভাবের এবং গোমরাহপ্রিয় বান্দাদের শয়তানের পথে চলার সহজতা দান করেন। নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এই সত্য তুলে ধরা হয়েছেঃ

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ – (قصص ٥٦) ـ

"তুমি যাকে ইচ্ছা হেদায়াত দান করতে পারনা, বরং আল্লাহ তাআলা যাকে চান হেদায়াত দান করেন। তুমি যতই আকাংখা করনা কেন অধিকাংশ লোকই ঈমান আনবেনা।"–(সুরা কাসাস–৫৬)

إِنْ تَحْرِصْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ * (نحل ٣٧)

"তুমি যদি তাদের হেদায়াত প্রাপ্তির আকাংখা কর তাহলে শুনে রাখ– আল্লাহ তাআলা যাদের গোমরাহ করে দেন তাদের হেদায়াত দান করেননা। এবং এদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।"–(সুরা নহল–৩৭)

كِتَابٌ اَنزَلنَاهُ اِلَيكَ لِتُخرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِاِذنِ رَبِّهِم (ابراهيم ١) ـ

"এই কিতাব যা আমরা তোমার ওপর নাযিল করেছি এজন্য যে, তুমি লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসবে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।"–(সূরা ইবরাহীমঃ১)

اِنَّ عِبَادِى لَيسَ لَكَ عَلَيهِم مِن سُلطَانٍ اِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ (الحج – ٤٢) ـ

"আমার বান্দাদের ওপর তোর (শয়তান) কোন জোর খাটবেনা। কেবল দুষ্ট প্রকৃতির লোক যারা তোর অনুসরণ করে–তাদের ওপরই তোর জোর খাটবে।"–(সূরা হিজরঃ ৪২)

وَمَا كَانَ لِى عَلَيكُم مِن سُلطَانٍ اِلاَّ اَن دَعَوتُكُم فَاستَجَبتُم لِى فَلاَ تَلُومُونِى وَلُومُوا اَنفُسَكُم (ابراهيم ٢٢) ـ

"তোমাদের ওপর কোন কর্তৃত্ব ছিলনা। আমি শুধু তোমাদের ডেকেছি আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছ। অতএব এখন তোমরা আমাকে তিরস্কার করনা, বরং নিজেদের নফসকে তিরস্কার কর।"–(সূরা ইবরাহীমঃ ২২)

এই বাস্তব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একজন হকের আহবানকারী এ ব্যাপারে চিন্তা করেনা। এবং তার চিন্তা করা উচিৎ নয় যে, লোকেরা তার দাওয়াত কান লাগিয়ে শুনছে কিনা। তার দাওয়াতের জন্য যুগটা অনুকূল কিনা এ বিষয়ে সে মাথা ঘামায়না এবং তার মাথা ঘামানোর প্রয়োজনও নেই। লোকদের দাওয়াত কবুল করা বা প্রত্যাখ্যান করা নিজের প্রচেষ্টার সাফল্য বা ব্যর্থতা এবং হকের দাওয়াতের পরিনাম সম্পর্কে সে একবার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিত করে নেয় যে, সে যে জিনিসটিকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে এবং যেটাকে সে গোটা দুনিয়ার জন্য সমান ভাবে কল্যাণকর মনে করে– সেই উদ্দেশ্যের দিকে লোকদের আহবান করাই তার কর্তব্য। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর লোকেরা তার দাওয়াত কবুল করে নিজেদের কর্তব্য পালন করছে কিনা এবং আল্লাহ তাআলা এই দাওয়াতকে দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে দেবেন কিনা– এই চিন্তা করে সে বিচলিত হয়না।

লোকদের দাওয়াত কবুল অথবা প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে বলা যায় তারা তার আহ্বানে সাড়া দিক বা না দিক উভয় অবস্থায় তার নিজের দায়িত্ব রীতিমত বহাল থাকে। তারা যদি তার দাওয়াত কবুল করে নেয় তাহলে তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য এবং মুক্তির পথ খুলে যাবে এবং সে আল্লাহর কাছে নিজের দায়িত্ব পালন ও দাওয়াতের সওয়াব পেয়ে যাবে। আর তারা যদি দাওয়াত কবুল না করে তাহলে তার মধ্যমে লোকদের সামনে আল্লাহর চূড়ান্ত প্রমান পূর্ণ হয়ে যাবে এবং আহবানকারীকে দায়িত্বমুক্ত ঘোষণা করা হবে। অর্থাৎ তার যে কর্তব্য ছিল তা সে পূর্ণ করেছে। কুরআন মজীদের হকের আহবায়কারীদের একটি দলের জবাব উল্লেখ করা হয়েছে। তাদেরকে এমন একদল লোকের সামনে অথবা নিজেদের দাওয়াত পেশ করা থেকে বিরত রাখা হয়েছিল–যারা কোনক্রমেই দাওয়াত কবুলকারী ছিল না। এই জবাব থেকে হকের আহবানকারীর দায়িত্বের ধরণ পরিষ্কাররূপে বুঝা যায়। তা হচ্ছে লোকেরা তার দাওয়াত কবুল করুক বা না করুক উভয় অবস্থায় তার দায়িত্ব হচ্ছে দাওয়াত দিতে থাকা। লোকেরা যদি তা কবুল করে তাহলে তারা হেদায়াত পেয়ে যাবে, আর যদি কবুল না করে তাহলে সে আল্লাহর দরবারে দায়িত্বমুক্ত সাব্যস্ত হবে।

وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

''যখন তাদের মধ্যে একটি দল (অপর দলকে) বলল, তোমরা এমন লোকদের কেন নসীহত কর–যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা হয় ধ্বংস করে দেবেন অথবা কঠিন শাস্তি দেবেন? তারা জবাবে বলল, আমরা তা এজন্য করছি যে, আল্লাহর কাছে আমাদের অপারগতা প্রমাণ হয়ে যায় এবং তারা হয়ত খোদাভীতির পথ অবলম্বন করতে পারে।''–(সুরা আ'রাফঃ ১৬৮)

এখন থাকল আল্লাহ তাআলার সাহায্য সহায়তার প্রসংগ। এ ব্যাপারে শুধু এই কথাটুকুই যথেষ্ট যে, আল্লাহ তাআলা তার কাছে এই হককে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন–এটা তার মনের মধ্যে এই নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে যে, এই হকের দাওয়াত দেয়া, লোকদের তা কবুল করা এবং হকের দিকে আহবান করা এবং দুনিয়াতে তা বিস্তৃত করার সংকল্প নিয়ে অগ্রসর হয় তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা এই কাজে তাকে সাহায্য করবেন। এক দয়াময় ও অনুগ্রহশীল প্রভু সম্পর্কে সে কখনো এই সন্দেহ করতে পারেনা যে, তিনি যে রাস্তার ব্যাপারে বলেছেন যে, এটাই হচ্ছে সরল

সহজ পথ–সেই পথে চলা অসম্ভব এবং যে জীবন ব্যবস্থাকে তিনি স্বভাবগত জীবন বিধান বলেছেন– তা এতটা জটিল এবং তার ওপর আমল করা এতটা অসম্ভব যে, লোকেরা তা গ্রহণই করবেনা। অনন্তর একজন ন্যায়নিষ্ঠ আহবানকারী তার মেহেরবান প্রভূ সম্পর্কে সে এই সন্দেহ করতে পারে না যে, তিনি তার ওপর একটি দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে এই নির্দেশ দেবেন যে, তোমার করনীয় কাজ হচ্ছে এই এবং এটা করার মধ্যেই রয়েছে তোমার মুক্তি এবং আমার অনুগ্রহ, কিন্তু যখন সে এ কাজ করা শুরু করে দেবে এবং তার সামনে বিপদ এসে যাবে তখন তিনি তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে রাখবেন এবং কোনরূপ সাহায্য করবেন না।

আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে এই সুধারনা এবং ভরসা প্রতিটি আহবানকারীর মধ্যে বর্তমান থাকে যে, তার বাতানো পথে চলা কঠিন নয়, তাঁর দেয়া জীবন ব্যবস্থা জটিলও নয় এবং এর ওপর আমল করাও কঠিন নয়, তিনি তাকে অসহায় পরিত্যাগ করবেননা এবং তাঁর সাহায্য অবশ্যই সে লাভ করবে। বিরুদ্ধবাদীরা যখন তার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে আরম্ভ করে এবং বাহ্যত মনে হতে থাকে যে, এই কাজ এখন আর সামনে অগ্রসর করা যাবেনা, তখন এই ভরসা তার মনে দৃঢ়তা ও উৎসাহ যোগায় যে, যে রাস্তার দিকে আল্লাহ্ তাআলা নিজেই আংগুলি নির্দেশ করে বলেছেন, এটাই হচ্ছে সত্য পথ–তখন সে পথে বিচরণকারী মঞ্জিলে মাকসুদ পর্যন্ত অবশ্যই পৌঁছে যাবে এবং এ পথে যত কঠিন বাধাই আসুক না কেন–কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর সাহায্য আসবেই। আল্লাহ্ তাআলার সাথে হকের আহবানকারীদের এই সম্পর্ক এবং তাঁর ওপর এই ভরসা রয়েছে। সুরা ইবরাহীমের নিম্নোক্ত আয়াতে তা প্রকাশ পেয়েছেঃ

وَمَا لَنَا اَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ (١٢) ـ

"আমরা কেন আল্লাহর ওপর ভরসা করবনা? অথচ তিনি আমাদের জন্য আমাদের চলার পথ খুলে দিয়েছেন। আর তোমরা আমাদের যে উৎপীড়নই করবে–আমরা তাতে ধৈর্য ধারণ করব। ভরসাকারীরা যেন আল্লাহর ওপরই ভরসাকরে।"–(আয়াতঃ১২)

কখনো কখনো এরূপ হয়ে থাকে যে, আহবানকারী তার দায়িত্বের সীমা নির্দিষ্ট করার ভুল করে বসে। সে মনে করতে থাকে যে, লোকদের নিকট ঠিক ঠিকভাবে হককে পৌছে দেয়া পর্যন্তই তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয়। বরং লোকদের দ্বারা হককে

কবুল করিয়ে নেয়া পর্যন্ত তার দায়িত্ব রয়েছে। এই ভ্রান্তির একটি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি একেতো এই হয়ে থাকে যে, নির্ভেজাল হককে পেশ করার পরিবর্তে আহবানকারীর মধ্যে বিরুদ্ধবাদীদের বাতিল আকীদা ও চিন্তার সাথে সমঝোতা করার ঝোঁক প্রবণতা সৃষ্টি হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, একটি ভুল দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নেয়ার কারণে সে নিজের জীবনকে কঠিন চিন্তাধারা এবং জটিলতার মধ্যে নিক্ষেপ করে। এই ধরনের ভ্রান্তি থেকে বাঁচানোর জন্যে কুরআন মজীদ বিস্তারিত পথনির্দেশ দান করেছে। যেমন,

وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ - (الانعام- ٦٩) ـ

"তাদের কাজের কোন দায়িত্ব পরহেজগার লোকদের ওপর অর্পিত নয়। অবশ্য তাদের উপদেশ দান করা কর্তব্য–এই আশায় যে, তারা ভ্রান্ত নীতি ও চরিত্র থেকে বিরত থাকবে।"–(সূরা আনআমঃ ৬৯]

اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (انعام ١٠٦.١٠٧) ـ

"তুমি সেই জিনিসের অনুসরণ কর–যা তোমার ওপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হচ্ছে। তিনি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই। তুমি এই মুশরিকদের জন্য ব্যতিব্যস্ত হবেনা। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে (তিনি এমন ব্যবস্থা করতে পারতেন যে) এরা শিরক করতনা। (কিন্তু আল্লাহ তাআলা দীনের ব্যাপারে জবরদস্তি করেননি।) আমরা তোমাকে এদের ওপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি (যে তারা কোন ভুল করতে পারবেনা)। আর তুমি তাদের জন্য দায়িত্বশীল নও (যে তাদের ঈমান আনার ব্যাপারটি তোমার দায়িত্বে বর্তাবে)।"–(সূরাআনআমঃ১০৬,১৭)

فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ - (الرعد- ٤٠)

"তোমার দায়িত্ব শুধু পূর্ণরূপে পৌছে দেয়া, হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার।"
–(সূরা রা'দঃ ৪০)

طه، مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى*

"তা'হা। আমরা তোমার ওপর কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে তুমি নিজের জীবনকে বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করবে। এটা তো স্মারক সেই সব লোকের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে।"–(সূরা ত'হাঃ ১–৩)

বর্তমান যুগে যেসব লোক বিশ্বব্যাপী খোদাদ্রোহী শক্তির বিজয় দেখে হাতের ওপর হাত রেখে বসে আছে এবং হকের দাওয়াতের কোন সুযোগ দেখতে পাচ্ছেনা। অথবা হকের দাওয়াত বিস্তৃতি হওয়ার সম্ভাবনা না দেখে বাতিলের প্রচারে লেগে গেছে–তারা পূর্বোল্লেখিত ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত রয়েছে। এই লোকদের সামনে যদি এই সত্য পরিষ্কার থাকত যে তাদের দায়িত্ব শুধু পৌছে দেয়া; তাদের পেশকৃত দাওয়াত লোকদের কবুল করা বা না করা এবং এই দাওয়াতের ব্যপকতা লাভ করা বা না করা তাদের সাথে সম্পর্কিত নয় বরং এ ব্যাপারটি আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্কিত–তাহলে তারা সম্ভাবনা বা অসম্ভবনার জটিলতায় জড়িয়ে পড়তনা এবং একটি বাতিলের প্রচারের দায়িত্বও নিজেদের কাঁধে তুলে নিতনা। বরং তারা নিজেদের সাধ্যমত হকের প্রচার করত এবং আল্লাহ তাআলার কাছে আশা রাখত যে, যখন তিনি নিজেই হক এবং হককে ভালবাসেন–তখন এ হককে তিনি অবশ্যই প্রসারিত করবেন। কিন্তু তারা নিজেদের বোঝার সাথে আল্লাহ তাআলার দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে চাইল। যখন তারা অনুমান করতে পারল যে, এটা অত্যন্ত ভারী বোঝা, তাদের পক্ষে তা বহন করা অসম্ভব, তখন তাদেরকে বাধ্য হয়ে এই ঘোষণা দিতে হল যে, যাই হোক কল্যাণ ও বরকত পূর্ণ ব্যবস্থা হচ্ছে তাই যা ইসলাম পেশ করেছে–কিন্তু বর্তমান যুগে তাকে ব্যাপক ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যেহেতু সম্ভব নয়– এই কারণে একটি অনৈসলামিক ব্যবস্থার প্রচার এবং তা কবুল করে নেয়া ছাড়া কোন গত্যান্তর নেই।

এই ধারণার মধ্যেই গোমরাহী লুকিয়ে আছে। এসবকিছু প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই এবং এখানে তা প্রকাশ করার সুযোগও নেই। অবশ্য আমরা একটি কথার দিকে ইশারা করতে চাই। এই লোকেরা জ্ঞাতসারে হকের পথ পরিত্যাগ করে কেবল এই ধারণার শিকার হয়ে বাতিলের পথ অবলম্বন করেছে যে, এই পথে চলে তারা সহজেই নিজেদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছে যেতে পারবে। অথচ এ পথেও যদি সফলতা আসে (যাকে তারা সফলতা মনে করছে) তবে আল্লাহর হুকুমেই আসতে পারে, তাদের নিজেদের চেষ্টা তদবীরে নয়। তারা একটি ভ্রান্ত পথে চালিত হয়ে

আল্লাহর কাছে নিজেদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্য অপেক্ষা করার পরিবর্তে যদি নিজেরাও হকের পথে চলত, অন্যদেরও এ পথে চলার আহবান জানাত এবং আল্লাহর কাছ থেকে তৌফীক ও সফলতার জন্য অপেক্ষা করত– তাহলে এটা কি উত্তম ছিলনা?

তারা হকের আহবানকারী হিসাবে নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সীমা সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেনি। এই মারাত্মক ভুল তাদের সমস্ত চেষ্টা–সাধনাকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পথে নিয়োজিত করেছে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে সত্যের দিকে হেদায়াত দান করেছেন, তাকে কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংকোচন ব্যতিরেকে লোকদের কাছে পৌছে দেয়াকেই শুধু নিজেদের কর্তব্য মনে করেনি, বরং তাদেরকে হকের অনুসারীতে পরিণত করাকেও নিজেদের দায়িত্ব মনে করে বসল। এই কাজ যখন তাদের কাছে কঠিন মনে হল, তখন তারা হককে পরিত্যাগ করে বাতিলকেই গ্রহণ করে নিল। এই ভ্রান্ত পদক্ষেপ অবশ্যম্ভাবীরূপে একজন আহবানকারীকে দয়াময় আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে শয়তানের রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দেয়। তখন সে কেবল আহবানকারীই থাকেনা বরং দাবীদার হয়ে আল্লাহর অধিকার সমূহে হস্তক্ষেপ করা এবং একটি নতুন ধর্মমত পেশকারী হিসাবে আবির্ভূত হয়।

একজন আহবানকারী যদি নিজের মর্যাদা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত থাকত তাহলে তার কাছ থেকে এটা আশাই করা যেতনা যে, সে নিরাস এবং সন্দেহপ্রবণ হয়ে বসে থাকবে অথবা হকের পরিবর্তে বাতিলের প্রচার শুরু করে দেবে। অবশ্য শুধু প্রচারকার্য পর্যন্তই তার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ–এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তার মধ্যে যাতে বেপরোয়া মনোভাব লঘুত্ব সৃষ্টি হতে না পারে–সেদিক থেকে তার নিজের ওপর নিজের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এই জিনিস থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য সব সময় আহবানকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্যকে দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে। এ দিকে খেয়াল না রাখার কারণে আল্লাহর কাছে এই অভিযোগের ভিত্তিতে তার গ্রেপ্তার হওয়ার আশংকা রয়েছে যে, তাবলীগ অথবা সাক্ষ্যদানের ফরজ যেভাবে আদায় করার নিয়ম ছিল সেভাবে তা আদায় করা হয়নি। আম্বিয়ায়ে কেরামদের সম্পর্কে বলা যায়, রিসালাতের দায়িত্বানুভূতি তাঁদের মধ্যে এতটা প্রবল ছিল যে, অনেক সময় তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনীয় বিশ্রামের কথাও ভুলে যেতেন। এমনকি নিজেদের এবং নিজেদের দাওয়াতের মর্যাদা ও মাহাত্মের কথাও স্মরণ থাকতনা। বরং তাঁদের

অস্বাভাবিক ব্যস্ততার মাধ্যমে প্রকাশ পেত যে, তাঁরা নিজেদেরকে লোকদের কুফর ও ঈমানের দায়িত্বশীল মনে করছেন। এই ধরণের ব্যস্ততার ওপর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদের মহব্বত সুলভ ভংগীতে অভিযুক্ত করেছেন। এর কতিপয় দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। এই ধরনের ব্যস্ততা এবং বাহুল্য থেকে বেঁচে থাকাটাই হকের প্রতিটি আহবানকারীর বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিৎ।

১৩

হকের দাওয়াতের প্রতিদ্বন্দী

প্রতিটি হকের দাওয়াতকে তিন ধরনের প্রতিদ্বন্দীর সম্মুখীন হতে হয়ঃ

১. অনমনীয় শত্রু

২. প্রতীক্ষাকারী

৩. অসচেতন

এদের মধ্যে প্রতিটি শ্রেণীর গুণবৈশিষ্ট্য এবং মানসিক অবস্থা পরস্পর থেকে ভিন্নতর। এ কারণে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে তাদের প্রত্যেকের সাথে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যবহার করতে হয়। ব্যবহারের এই পার্থক্যের ওপরই দাওয়াতের সাফল্য অনেকাংশে নির্ভশীল। যদি কোন আহবানকারী এই বিভিন্ন শ্রেণীকে চিহ্নিত করতে এবং তাদের বিশেষ আচরণ ও ঝোঁকপ্রবণতা সম্পর্কে অনবহিত থাকে তাহলে তাদের দাওয়াত সফল হওয়ার আশা করা যায় না। বিষয়টি গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য করে আমরা এই সব শ্রেনীর শত্রুদের স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট এবং তাদের ঝোঁকপ্রবণতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

১. অনমনীয় শত্রু

অনমনীয় শত্রু বলতে তাদের বুঝানো হয়েছে যারা দাওয়াতের পরিচয় এবং প্রভাব অনুমান করতেই তার বিরোধীতা করার জন্য আদা-পানি খেয়ে ময়দানে অবতীর্ন হয়। তাদের বিরোধীতার মধ্যে এমনিতে তো বিভিন্ন প্রকারের আচরণ কার্যকর থাকে-কিন্তু তিনটি আচরন আসল এবং মৌলিক। (এক) বর্বরতা মূলক শত্রুতা, (দুই) অহংকার ও ঘৃণাবিদ্বেষ, (তিন) ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তা। এই তিন ধরনের আচরণ হকের বিরোধীতায় অগ্রগামিতার দিক থেকে সম্পূর্ণ একই পর্যায়ভূক্ত; কিন্তু নিজের প্রানসত্তার দিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রকৃতির। বর্বরতা মুলক শত্রুতার রোগ মুলত জাহেলী ব্যবস্থার সাথে একনিষ্ঠতা ও হৃদ্যতারই ফলশ্রুতি। যেসব লোক সমসাময়িক যুগের জাহেলী ব্যবস্থার একনিষ্ট এবং বিশ্বস্ত খাদেম তারাই সাধারনত এই রোগে আক্রান্ত থাকে। এই লোকেরা যখন দেখতে পায় যে, এমন একটি আহবান উত্থিত হয়েছে যা তাদের নেতৃত্বাধীন ব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে তদস্থলে কোন নতুন ব্যবস্থা চালু করতে চায়-তখন তাদের মধ্যে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তারা এর

মধ্যে নিজ জাতির রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখতে পায়। তারা দেখতে পায় যে, এই নতুন আহ্বানের দ্বারা তাদের গোত্রের মধ্যে ভাংগন সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাদের গড়ে তোলা সংঘ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। তারা এটাও অনুমান করে যে এই দাওয়াত বাপ–দাদা ও পূর্বপুরুষদের সুপরিচিত পন্থা এবং প্রাচীন রাজনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ কারণে তাদের অন্তর এর প্রতি বিষন্ন হয়ে পড়ে।

এই সবকিছু মিলে তাদের মধ্যে আহবানকারী এবং আহ্বানের বিরুদ্ধে একপ্রকার কঠিন বেদনা এবং প্রচন্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং তারা পূর্ণ উদ্দমে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং প্রাণ দিতে তৈরী হয়ে যায। কিন্তু যেহেতু তাদের এই বিরোধিতা অনেকাংশে জাতীয় নিষ্ঠার ওপর ভিত্তিশীল, এজন্য তার মধ্যে নীচতা, জঘন্যতা ও হীনতার মিশাল কম থাকে। এটা একটা পুরুষোচিত বিরোধীতা হয়ে থাকে। এর মধ্যে উত্তেজনা আছে বটে, কিন্তু এই উত্তেজনা ভদ্রতা, সৌজন্য ও আভিজাত্যের পরিবর্জিত হয়না। এধরনের বিরোধীতার ক্ষেত্রে ভুল বুঝাবুঝি দূর হওয়ার পর এই বিরোধীতা প্রেম ভালবাসায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে। যদি তাই হয়ে যায় তাহলে এই ভালবাসাও উত্তেজনাপূর্ণ দুর্দমনীয় বিরোধীতার মত দুর্দমনীয় ভালবাসার রূপ গ্রহণ করতে পারে। ইসলামের দাওয়াতের ইতিহাসে এর সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে– আবু জাহল এবং হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরোধীতা। আবু জাহল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ পর্যন্ত ইসলামের দাওয়াতের বিরোধতায় যেরূপ তৎপর ছিল তা প্রতিটি মানুষেরই জানা আছে। কিন্তু এই চরম শত্রুতা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওপর কোন জঘন্য অপবাদ আরোপ করার চেষ্টা কখনো করেনি। তিনি যখন দাওয়াতের কাজে বের হতেন তখন সে বিরোধীতার জোশে ছায়ার মত তাঁর অনুসরন করতো যাতে কেউ তাঁর কথা শুনতে না পারে। কিন্তু সে যখন বিরোধীতা করত তখন তার ধরণটা এরূপ হত যে, "হে মুহাম্মদ! আমি তো একথা বলছিনা যে, তুমি মিথ্য বলছ। কিন্তু তোমার দাওয়াত বাপদাদা ও পূর্বপুরুষদের পন্থার পরিপন্থী।" তার এজন্যই বেশী রাগ হতো যে, তার দাওয়াত কোরাইশদের ঐক্যকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছিল। সে রসূলুল্লাহর (স) ওপর সবচেয়ে যে অপবাদ লাগাত তা হচ্ছে–তিনি পুত্রকে পিতার থেকে এবং ভাইকে ভাইয়ের থেকে পৃথক করে পরস্পরের শত্রু বানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং বদরের যুদ্ধে সে যখন দেখতে পেল ইসলামের দাওয়াত কোরইশদেরকে কোরাইশদেরই বিরুদ্ধে কাতারবন্দী করে দিয়েছে, তখন সে পরিপূর্ণ আবেগের সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করলঃ

اللهم اقطعنا للرحم ، وآتانا بما لا يعرف فاحنه الغداة .

"হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ককে অধিক ছিন্নকারী এবং এই বিদআতের উদ্ভাবক তাকে আগামী কাল পরাজিত কর।"

এই দোয়া যদিও জাহেলিয়াতের শত্রুতার বিষের মধ্যে ডুবানো, কিন্তু তার মধ্যে আবু জাহেলের সৌজন্যবোধ এবং জাতিপূজার যে দিকটি প্রতীয়মান হয়ে আছে–তা অস্বীকার করা যায়না। এই ধরনের বিরোধীরা দাওয়াতের বিরোধীতায় যতই তৎপর হোকনা কেন তাদের মধ্যে স্বজাতি প্রীতির একটি সৌন্দর্য প্রকট হয়ে থাকে। এ কারণে হকের আহবানকারীর দৃষ্টিতে তাদের একটি বিশেষ সম্মান রয়েছে। তারা সব সময় অন্তরে এই আশা পোষন করে যে তাদের এই সৌন্দর্য বাতিলের পরিবর্তে হকের খেদমতে ব্যবহার হোক। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (স) এ কারণে ইসলামী দাওয়াতের সমস্ত বিরোধীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে আবু জাহল ও হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনুহুর ইসলাম গ্রহণের জন্য দোয়া করেছিলেন। তাহলে তাদের ইসলাম কবুল করার ফলে ইসলামের দাওয়াত শক্তি ও সুনাম অর্জন করতে পারবে।

তার এই দোয়া হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনুহুর বেলায় কবুল হয়। ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি ছাত্রই জানে যে, তাঁর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই হঠাৎ করে পরিস্থিতি ভিন্নতর হয়ে গেল। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি যে উদ্দাম উৎসাহ, যে তৎপরতার এবং যে বলবীর্য ও শত্রুতা নিয়ে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরোধীতা করেছিলেন ইসলাম গ্রহনের পর তার চেয়েও অধিক দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এবং সাহসিকতার সাথে ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে থাকলেন। তাঁর জাহেলী বিদ্বেষ ইসলামের রং গ্রহণ করতেই শত্রুমিত্র সবাই অনুভব করতে লাগল যে, এখন ইসলামের কাতারে একজন ব্যাঘ্র হৃদয়ের অধিকারী মর্দে মুমিন এসে গেছে। হযরত উমরের (রা) জীবনাচারে সেই সৌন্দর্য বর্তমান ছিল যা মানুষের যাবতীয় উন্নত বৈশিষ্টের জন্য খামিরের কাজ দিতে পারে। কিন্তু এই সৌন্দর্য অসংখ্য জাহেলী ধ্যানধারণার নীচে চাপা পড়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের দীনের দাওয়াতের ঘর্ষনে যখন এই বাতিল ধ্যানধারণার আবর্জনা দুরিভূত হয়ে গেল তখন নীচে থেকে তা খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে এলো। এর উজ্জলতা শেষ পর্যন্ত দুনিয়ার দৃষ্টি সমুহকে আলোহীন করে দিল।

নিজের যুগের জাহেলী ব্যবস্থার সাথে হযরত উমরের সম্পর্কটা কোন স্বার্থপরতার ভিত্তিতে ছিলনা। বরং ইসলাম গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই

ব্যবস্থাকে হক মনে করতেন। এটাকে তিনি নিজের সম্মানিত পূর্ব-পুরুষদের উত্তরাধিকার মনে করতেন। নিজের জাতির মানমর্যাদার স্থায়ীত্ব এর মধ্যেই দেখতে পেতেন। এসব কারণে তিনি এই ব্যবস্থার অনুসারীদের নিজের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা এবং বিরোধীদের নিজের দুশমন হিসাবে চিহ্নিত করাকে নিজের ধর্মীয় এবং জাতীয় কর্তব্য মনে করতেন। কিন্তু যখন তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, তিনি যা বুঝেছেন তা সত্য নয়, বরং সত্য তার বিপরীত রয়েছে, তখন যে আবেগ উদ্দীপনা তাকে জাহেলী ব্যবস্থার একনিষ্ঠ সেবক বানিয়ে রেখেছিল তা ইসলামের সেবা এবং সাহায্যে নিয়োজিত করলেন। এই ধরনের উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিরা হীন স্বার্থের উর্ধে অবস্থান করার কারনে কোন সত্য প্রতিভাত হয়ে যাবার পর তা প্রত্যাখ্যান করতে উঠেপড়ে লাগেনা এবং কোন জিনিস গ্রহণ করার পর তার অত্যাবশ্যকীয় দাবী পুরণ করা থেকেও পিছপা হয়না। বরং কোন একটি সত্য প্রমানিত হওয়ার পর তা কবুল করে নেয়ারও সৎসাহস রাখে এবং তার জন্য নিজেদের যে কোন ধরনের ব্যক্তিস্বার্থ কোরবানী করতে পারে। তার চরিত্র ও নৈতিকতার এই দিকটির কারণে তারা যেখানেই থাকুক না কেন নিজেদের একটি বিশেষ মর্যাদা এবং স্থানের অধিকারী হয়ে থাকে।

এই গ্রুপের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক রয়েছে। কতকের শত্রুতা নিজের সীমা অতিক্রম করে আত্মম্ভরিতা এবং দাম্ভিকতার রূপ লাভ করে। এদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত জাহেলিয়াতের ফাঁদ থেকে বের হওয়ার সৌভাগ্য হয়না। যেমন আবু জাহেল। কতিপয় লোক সামান্য দ্বন্দ সংঘাতের পর সামান্য হুশীয়ারীর পর সতর্ক হয়ে সৎপথ পেয়ে যায়। যেমন হযরত উমর এবং হযরত হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা। কতিপয় লোকের জাহেলিয়াতের পর্দা ভেদ করে বের হয়ে আসতে অনেক বিলম্ব হয়। যেমন আবু সুফিয়ান (রা)। কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য এদের সবার মধ্যে সমানভাবে বর্তমান থাকে। তা এই যে, তারা যখন জাহেলিয়াতকে পরিত্যাগ করে ইসলামকে গ্রহণ করে নেয়, তখন আসার সাথে সাথেই ইসলামের প্রথম সারিতে নিজেদের স্থান করে নেয়- যেভাবে তারা গতকাল পর্যন্ত জাহেলিয়াতের প্রথম কাতারে ছিল।

خيارکم فی الجاهلية خيارکم فی الاسلام ، ـ

"তাদের মধ্যে জাহেলী যুগে যারা সর্বোত্তম, ইসলামেও তারাই সর্বোত্তম। তবে শর্ত হচ্ছে যখন তারা (দীনের) গভীর জ্ঞান অর্জন করে।" (বুখারী-কিতাবুল মানাকিব ও কিতাবুল আম্বিয়া, মুসলিম-কিতাবুল ফাযায়েল)

গর্ব অহংকার এবং হিংসা বিদ্বেষের বসবর্তী হয়ে সাধারনত যেসব লোক হকের দাওয়াতের বিরোধিতা করে তারা হচ্ছে সেই লোক যারা কৃত্রিম দীনদারী এবং পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ধনাঢ্যতার কারণে জাহেলী ব্যবস্থার মধ্যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের পদে সমাসীন থাকে। তারা সামনে চলার কারণে সামনে চলতে এতটা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, হকের পেছনে চলাটা নিজেদের জন্য প্রতিবন্ধক মনে করে। তাই তারা হকের পেছনে চলার পরিবর্তে হককে নিজেদের পেছনে চলতে বাধ্য করতে চায়। পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ধার্মিকতার মনমানসিকতা সাধারণত এই হয়ে থাকে যে, তারা হককে বাপদাদার মীরাস এবং নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করতে থাকে। পৌরহিত্য এবং মর্যাদাপূর্ন পরিবেশে লালিত পালিত এবং বড় হওয়ার কারণে তারা এটা ধারণাই করতে পারেনা যে, তাদের নিজেদের সত্তা এবং পরিমন্ডলের বাইরেও হক থাকতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত প্রাচুর্যের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা পার্থিব শান-শাওকত ও জাকজমকে নিজেদের হকপন্থী হওয়ার স্বপক্ষে দলীল সাব্যস্ত করে এবং খেয়াল করে যে, যখন তারা সম্মান ও মর্যদার অধিকারী তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের চিন্তা এবং কর্মও হক। এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোকদের যখন এমন কোন দাওয়াত চ্যালেঞ্জ করে যা তাদের বাহ্যিক দীনদারীর পরিপন্থী অথবা যার আঘাত তাদের প্রবৃত্তির ওপর পড়ে তখন তারা অস্থির হয়ে এই দাওয়াতের বিরোধিতায় কোমর বেধে দাড়িয়ে যায়। বিশেষ করে এই দাওয়াত যখন তাদের পরিমন্ডল ছাড়া অন্য কোন পরিমন্ডল থেকে উত্থিত হয় তখন এই অবস্থায় তাদের বিরোধিতা চরম আকার ধারণ করে। তারা এই অহংকারে ডুবে থাকে যে, হক তাদের সাথেই রয়েছে এবং তা চিরকাল তাদের সাথেই থাকবে। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, তা তাদের মধ্য থেকে বিলীন হয়ে গেছে তাহলে যখনই তা পুনরায় দুনিয়ায় পুন প্রকাশ পাবে-তাদের মাধ্যমেই প্রকাশ পাবে। অতএব এই অহমিকতায় লিপ্ত ব্যক্তিদের কখনো এমন হককে কবুল করা প্রায় অসম্ভব যার আহবানকরী স্বয়ং তারা নয়।

অতএব হকের দাওয়াতের গোটা ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যেসব লোক এই ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে হকের প্রতি ঈমান আনার সৌভাগ্য তাদের খুব কমই হয়েছে। মক্কা এবং তায়েফের নেতৃত্বশীল ব্যক্তিবর্গ-যারা বলত, আল্লাহ তাআলাকে যদি কোন নবী পাঠাতেই হত তাহলে তিনি আমাদের মধ্য থেকেই কাউকে পাঠাতেন-এই রোগেই আক্রান্ত ছিল। এই লোকেরা ইসলামের সত্য দীন এবং আল্লাহর দীন হওয়ার ব্যাপারটিকে এই জন্য অস্বীকার করত যে, এটা যদি সত্য এবং আল্লাহর নাযিল করা দীন হত তাহলে আমাদের পূর্বে এই অধম ও দারিদ্রক্লিষ্ট ব্যক্তি তা

পেতনা। এই লোকদের সাথে ইহুদীরাও শরীক ছিল। তাদের ইসলাম বিরোধীতার অন্তরালে শুধু এই আবেগই কার্যকর ছিল যে, তারা যদি এই সত্যকে মেনে নেয় তাহলে তাদের ধর্মীয় নেতৃত্বের সমস্ত সম্মান এবং মর্যাদা ভুলুন্ঠিত হয়ে যাবে। এই ধরনের লোক যদিও হকের দাওয়াতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এবং সন্দেহ পেশ করে থাকে–যাতে তাদের বিরোধিতাকে বৈধ এবং যুক্তিসংগত প্রমাণ করতে পারে–কিন্তু বাস্তবে এই সব অভিযোগ এবং সন্দেহ শুধু বিরোধিতা, অহংকার ও বিদ্বেষের মূল কারণ গুলোকে ধামাচাপা দেয়ার জন্য দাঁড় করানো হয়ে থাকে। এই ধরনের বিরোধীরা হকের আহবানকারী সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আশার চেয়ে নিরাশাই অধিক দেখতে পায়। এদের মধ্যে খুব কম লোকেরই হককে গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়ে থাকে। এসব লোক গর্ব অহংকারের বর্শবর্তী হয়ে নিজেদেরকে খোদার আসনে বসিয়ে নেয় এবং যতক্ষণ তাদেরকে এই আসন থেকে হটাতে বাধ্য করা না হয় ততক্ষণ তা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত হয় না।

কুরআন মজীদে গর্ব অহংকারকে সত্য দীন কবুল করার ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতার মধ্যে শুমার করা হয়েছে। এ কারণে কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এসব লোকের পেছনে অধিক সময় নষ্ট করা থেকে বিরত রাখা হয়েছে। এসব লোক পার্থিব ধনসম্পদের প্রাচুর্য অথবা ধর্মীয় এবং পার্থিব নেতৃত্বের কারণে নিজেদের গর্ব–অহংকারে মত্ত হয়ে থাকে। হযরত ঈসা আলাইহিস সাল্লাম নিজের সমসাময়িক আলেম এবং ফকিহদের অহংকার ও দাম্ভিকতার ভিত্তিতে বলেছিলেন, "কল্যাণ হোক তাদের যারা হৃদয়ের কাংগাল, আসমানের রাজত্বে তারাই প্রবেশ করবে।" তিনি আরো বলেছিলেন, "সূইয়ের ছিদ্রে উট প্রবেশ করা সহজ, কিন্তু সম্পদশালীরা খোদার রাজত্বে প্রবেশ করতে পারবে না।" সময়ের পরিক্রমা তার এই ভবিষ্যদ্বানীকে সত্য প্রমান করেছে। ইনজীল এবং কুরআন মজীদ উভয় গ্রন্থ থেকে জানা যায়, জেরুসালেমের আলেম এবং ফকীহদের মধ্যে একজন লোকও হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতের উপর ঈমান আনেনি। এমন কি তাদের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁকে নদীর তীরে জেলেদের কাছে নিজের দাওয়াত পেশ করতে হয়। তিনি তাদের মধ্যে এমন কিছু সংখ্যক আল্লাহর বান্দাকে পেয়ে গেলেন যারা হকের দাওয়াত প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে নেয়।

নবী (স) যখন দীনের দাওয়াত পেশ করেন তখনও প্রায় এই একই অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের আলেম সমাজের মধ্যে মুষ্টিমেয় লোক

ইসলাম গ্রহণ করে। অন্যান্যরা সবাই নিজেদের পৌরহিত্ব ও বুজর্গীর অহংকারে হকের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়িয়ে থাকে। যেসব লোক ঈমান আনে কুরআন মজীদের যেখানেই তাদের বিশেষ গুণ উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গুন এই বলা হয়েছে–

انهم لا يستكبرون (مائده ٨٢) ـ

"আর তাদের মধ্যে অহংকার ও অহমিকাবোধ নেই।"–(মায়েদাঃ ৮২)

এ থেকে জানা যায়, এসব লোকদের অন্তর ধর্মীয় এবং পার্থিব নেতৃত্বের রোগ আক্রমন করতে পারেনি এবং তারা নিজেদের হকের উর্ধে মনে করতনা। এই লোকদের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, প্রথম প্রথম তারা নিজেদের দাম্ভিকতার কারনে দাওয়াতকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকে এবং সেদিকে কোন গুরুত্বই দেয়না। কিন্তু দাওয়াত যখন সামনে অগ্রসর হতে থাকে এবং তারা নিজেদের পায়ের তলার মাটি সরে যেতে দেখে, তখন তাদের হিংসা বিদ্বেষ প্রবল আকার ধারন করে। এসময় তারা দাওয়াত এবং দাওয়াত দানকারীর বিরুদ্ধে এমন সব কিছুই করতে থাকে যা অহংকার ও বিদ্বেষে নিমজ্জিত লোকেরা করতে পারে।

স্বার্থপূজার কারণে আত্মকেন্দ্রীক লোকেরাই সাধারনত হকের দাওয়াতের বিরোধিতা করে থাকে। তাদের যাবতীয় নৈতিক এবং সমষ্টিগত দর্শন নিজেদের সত্তা থেকে শুরু হয় এবং অনবরত নিজেকে কেন্দ্র করেই তা আবর্তিত হতে থাকে। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে একাকি বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করা সম্ভব নয়–এই প্রকৃতিগত দুর্বলতার কারণে তারা কোন সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে শামিল হয় বটে, কিন্তু তার ভেতরে প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের স্বার্থ খুঁজে বেড়ায়–কিন্তু কোথাও দায়িত্বের বোঝা বহনের জন্য প্রস্তুত নয়। তাদের কাছে হক এবং বাতিলের মানদন্ড হচ্ছে তাদের নিজেদের সত্ত্বা। যে জিনিস তাদের নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে তা সত্য এবং যে জিনিসের মাধ্যমে তাদের ব্যক্তি স্বার্থ ক্ষুন্ন হচ্ছে তা বাতিল। যেসব লোকের নৈতিক এবং সমষ্টিক ধ্যানধারনা এতটা নীচ–তারা নিজেদের স্বার্থবিরোধী যে কোন দাওয়াতের বিরোধিতা করে থাকে। এদের মধ্যে উন্নত মানবীয় গুনাবলী কখনো বর্তমান থাকে না। এ কারণে কোন হকের ব্যবস্থার জন্য স্বাভাবিক ভাবে তাদের অস্তিত্ব এতটা নিষ্ফল, যতটা নিষ্ফল একজন স্ত্রীর জন্যে নপুংসক স্বামী। এসব লোক নিজেদের স্বভাবগত হীন চরিত্র ও স্বার্থপরতার করণে কোন বাতিল দাওয়াত বা বাতিল জীবন ব্যবস্থার দিকেই আকর্ষন রাখে। কিন্তু এর সাথেও তাদের সম্পর্কটা

হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপে মুনাফেকী সুলভ ও স্বার্থপরতাপূর্ণ। এর জন্য তারা আন্তরীক আবেগ–উৎসাহের সাথে কোন আঘাত সহ্য করতে প্রস্তুত নয়।

ইসলামের প্রচারের ইতিহাসে এর বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে আবু লাহাবের অস্তিত্ব। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সাল্লামের দাওয়াতের সাথে তার সমস্ত বিরোধ শুধু এই কারণে ছিল যে, তার প্রচারকার্যের ফলে আবু লাহাবের চরিত্রের যাবতীয় দোষত্রুটি জনসমক্ষে এসে যাচ্ছিল। স্বার্থপরতা অর্থগৃধ্নুতার মাধ্যমে সে যে ধনসম্পদ কুক্ষিগত করেছিল তা সবই বিপদের মাথায় ছিল। একেতো সে কোরাইশদের কায়েমকৃত জাহেলী ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিল–কিন্তু এই ব্যবস্থার সাথে তার সমস্ত যোগসূত্র কেবল এই জন্য ছিল যে, সম্মানজনক পদ এবং কা'বা ঘরের তত্ত্বাবধানের কারণে ধনসম্পদ অর্জনের অনেক সুযোগ তার হস্তগত ছিল। এর অধিক তার জাতির জন্য তার সহানুভূতিও ছিলনা, আর যে জাহেলী ব্যবস্থার সে সর্বোচ্চ নেতৃত্বে সমাসীন ছিল তার কল্যাণ অকল্যানের সাথেও তার কোন আগ্রহ ছিল না। এর সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এমনি তো সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ছিল এবং লোকদের সামনে প্রকাশ করতো যে, এটা বাপ–দাদার পূর্ব পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে ধ্বংসকারী দাওয়াত। কিন্তু বদরের যুদ্ধে কোরাইশ গোত্রের সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ধর্মীয় আবেগ–উত্তেজনা সহকারে অংশ গ্রহণ করে, অথচ ইবরাহীমী উত্তরাধিকারের সবচেয়ে বড় দাবীদার এই ব্যক্তি যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকে এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি ভাড়া করা লোক যুদ্ধে পাঠায়। অথচ কোরাইশদের দৃষ্টিতে এটা ছিল একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ।

যে কোন হকের দাওয়াতের সাথে এ ধরনের লোকের স্বাভাবিক সম্পর্ক কেবল বিরোধীতাই হতে পারে এবং বিরোধীই হয়ে থাকে। এরা নীচতা ও নিকৃষ্টতায় এতটা পাকাপোক্ত এবং নিপুন হয়ে যায় যে, এমন কোন দাওয়াত যা উন্নত নৈতিকতার দিকে আহবান জানায়, যা সহানুভূতি, সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের দাবী জানায়, যা কোরবানী, স্বার্থত্যাগ এবং প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য ডাক দেয়–তা তাদের কাছে কোন আবেদনই সৃষ্টি করতে পারেনা। এই প্রকারের দাওয়াতের জন্য তাদের কান বধির এবং তাদের অন্তর মৃতবৎ হয়ে থাকে। তারা এ দাওয়াতের প্রতি নিজেদের মধ্যে কোন আকর্ষণ বা ঝোঁক তো অনুভব করেইনা বরং এর প্রতি ঘৃনা বিদ্বেষ অনুভব করে। এই ধরনের লোকদের বিরোধিতাও তাদের নৈতিক অধপতনের কারণে অত্যন্ত নীতিগত বিরোধীতার পরিবর্তে তারা সাধারণ চোগলখোরী, অপবাদ ইত্যাদির

আশ্রয় নেয় এবং গালাগালি ও দোষ প্রচারের মাধ্যমে নিজেদের নেতৃত্বের অহংকার বজায় রাখার চেষ্টা করে।

২. প্রতীক্ষাকারী দল

প্রতিক্ষাকারী (মুতারাব্বিসীন) বলতে এমন লোকদের বুঝায় যারা হকের দাওয়াতকে তো একটা সীমা পর্যন্ত হক বলে অনুভব করে, কিন্তু তাদের মধ্যে এতটা নৈতিক শক্তিও বর্তমান নেই যে, হককে হক হওয়ার ভিত্তিতে কবুল করে তার জন্যে জীবন বাজি রাখতে পারে; আর বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও তারা এতটা উন্নত নয় যে, হকের ব্যবস্থা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ হওয়ার পূর্বে এর সফল হওয়ার সম্ভাবনাকে অনুমান করতে পারে– যার নিদর্শন এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। এই দুর্বলতার কারণে এই লোকেরা কোন সত্যকে সত্য হওয়ার ফয়সালা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধির ভিত্তিতে করার পরিবর্তে এটাকে ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। যদি ভবিষ্যৎ তাকে সফলতার দ্বারে পৌছতে সুযোগ দেয় তাহলে তারা এটাকে গ্রহণ করবে, অন্যথায় জীবনটা যে ভাবে কেটে যাচ্ছে এভাবেই শেষ করবে। এই লোকেরা নিজেদের নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিকে দুর্বলতার কারণে একটি মানসিক দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়নের মধ্যে পড়ে থাকে। এ কারণে তারা হকের দাওয়াতের বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে খুব তৎপর নয়। কিন্তু সমসাময়িক প্রচলিত ব্যবস্থার প্রভাবে এরা দাওয়াতের বিরোধী পক্ষের সাথেই যোগ দেয়। আর হক বাতিলের দ্বন্দ্ব–সংঘাত চলাকালীন সময়ে তারা চেষ্টা করে যে, সমঝোতার কোন উপায় সৃষ্টি হয়ে যাক, যাতে হক ও বাতিল মিলে মিশে পাশাপাশি চলতে পারে। হকের সহায়ক ব্যক্তিদের মধ্যে মোনাফিকদের যে ভূমিকা রয়েছে–হকের বিরোধীদের মধ্যে এদের ভূমিকা ঠিক তদ্রুপ। হকের বিরাট বিজয় সাধিত হওয়ার পরও তাদের নৈতিক দুর্বলতার কারণে অপেক্ষা আর শেষ হয় না।

ইসলামের দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব লোকের এরূপ মানসিক অবস্থা ছিল তারা বদরের যুদ্ধের সময় বলত এই যুদ্ধে যদি মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর সাথীরা জয়যুক্ত হয় তাহলে আমরা তাঁর দাওয়াতকে হক বলে মেনে নেব এবং তাঁর সাথে সংযুক্ত হব। কিন্তু এই যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেল এবং মুসলমানরা বিজয়ী হল তখন তারা নিজেদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারটি ভবিষ্যত যুদ্ধের ফলাফলের ওপর মুলতবী করে দিল। এসব যুদ্ধের ফলাফলও যখন কোরাইশদের বিরুদ্ধে গেল এবং কার্যত তাদের সামরিক শক্তি সম্পূর্ণ খতম হয়ে গেল তখন তারা অপেক্ষা করতে লাগল–দেখা

ইহুদীদের শক্তিও বিপর্যস্ত হয়ে গেল তখন তাদের অপেক্ষা সমাপ্তি হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু এরপরও তাদের মধ্যে এমন একটি দল রয়ে গেল যারা রোমীয়দের সাথে মুসলমানদের সংঘাতের ফলাফল কি দাড়ায় তার অপেক্ষা করতে থাকল। এভাবে তাদের অপেক্ষা আর শেষ হবার নয়–যতক্ষণ কুফরী ব্যবস্থার উপর টিকে থাকাটা তাদের জন্য অসম্ভব না হয়ে দাঁড়ায়।

এদের মৌলিক দুর্বলতা হচ্ছে এই যে, এরা বুদ্ধিবিবেকের সাহায্যে সত্যকে যাচাই করে তার ওপর ঈমান আনতে চায়না। বরং তার বিজয় স্বচক্ষে দেখে তার উপর ঈমান আনার খাহেশ পোষণ করে। যে সব লোক আল্লাহর ওপর ঈমান আনার পূর্বে তাঁকে স্বচক্ষে দেখে নেয়ার আকাংখা পোষণ করত–তাদের সাথেই এদের আকাংখার হুবহু মিল রয়েছে। এটা হচ্ছে একটা শিশুসুলভ আকাংখা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এর ওপর কোন গুরুত্বই দেননি। বরং পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে, জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে যে ঈমানকে উপলব্ধি করা হয়েছে তাই নির্ভরযোগ্য, চোখের দেখা ঈমান নয়। যে ব্যক্তি একটি সত্যকে এজন্য সত্য বলে মানে যে, তার উত্তম ফল তার সামনে উপস্থিত রয়েছে, তার বিরোধীদের খারাপ পরিণতি তার নিজের চোখে দেখছে–সে মূলত সত্যের ওপর ঈমান আনেনি। বরং সে হয় স্বার্থের পূজারী অথবা ক্ষতির ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত। যে ব্যক্তি বাহ্যিক পূজার এই পর্যায় পর্যন্ত নেমে যায় তার মধ্যে এবং একটি পশুর মধ্যে শুধু গঠন প্রকৃতির পার্থক্য অবশিষ্ট থাকে। তার পক্ষে দুনিয়াতে এমন কোন নৈতিক ব্যবস্থার অনুগত থাকা মোটেই সম্ভব নয়–যার ফলাফল আজ নয় বরং কাল প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষা থাকে।

এই হচ্ছে আসল রহস্য যার কারণে এই ধরনের লোকেরা হকের আহবানকারীদের দৃষ্টিতে কোন মূল্যই রাখেনা। তাদের মানসিকতা হচ্ছে অন্ধ অনুসরণ প্রিয় মানসিকতা। এরা চলন্ত গাড়ীর আরোহী হতে অভ্যস্ত, চাই তা যেদিকেই যাক। এরা কুফরীর অনুসারী। করণ কুফরী ব্যবস্থা বিজয়ী হয়ে আছে। তারা ইসলামেরও সহযাত্রী হয়ে যাবে যদি তা বিজয়ীর আসন দখল করতে পারে। তাদের মধ্যে সেই পৌরুষত্ব নেই যার অভ্যন্তরীন আকর্ষনে হকের দিকে ছুটে আসবে। বরং তারা চাপের মুখে হকের দিকে ছুটে আসে। এই কারণে এ ধরনের লোকের দ্বারা সংগঠনের শক্তি বাড়েনা বরং কমে যায়। ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে যারা ঈমান এনেছিল তাদের সাহস শক্তির অবস্থা এমন ছিল যে, তাদের একজন দশজন কাফেরের মোকাবিলায় যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর যখন তাদের সাথে ইসলাম গ্রহণকারী বিরাট সংখ্যক লোক যুক্ত হল তখন এই শক্তি কমে গেল এবং এর অনুপাত প্রতি দুইজন কাফেরের বিরুদ্ধে একজন মুসলমান–এই পর্যায়ে নেমে আসলো।

নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক দুর্বলতার কারণে এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা কখনো কোন হকের দাওয়াতের এমন পর্যায়ে ঈমান আনতে পারেনা যখন তা দ্বন্দ্ব সংঘাতে বিভিন্ন রকম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সামনে অগ্রসর হয়। এটা হয়ত সম্ভব যে, তারা হকের দাওয়াতের স্বপক্ষে গোপনে শুভর্পনে কোন ভাল মন্তব্য করতে পারে, অথবা তাদের হৃদয়ের গোপন কোনে এই দাওয়াত সফল হওয়ার আকাংখা সৃষ্টি হতে পারে। এটাও অসম্ভব নয় যে, যেসব লোক হকের দাওয়াতের বিরোধিতা করে তাদেরকে তারা মনে মনে ভাল নাও জানতে পারে। বরং এটাও সম্ভব যে, এই ধরণের লোকেরা কখনো কখনো হকের দাওয়াতের আর্থিক অথবা নৈতিক সাহায্য লাভের আশাও করতে পারে। এসব কিছুই সম্ভব। কিন্তু এই লোকেরা ইতস্ত বিক্ষিপ্ত তক্তাগুলো একত্র করে তা দিয়ে নৌকা তৈরী করে তাকে নদীর উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে ভাসিয়ে দিয়ে প্রতিকূল আবহাওয়ার মোকাবিলা করে তীরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার কোন যোগ্যতাই রাখেনা।

তাদের মানসিক অবস্থা দাওয়াতের বিভিন্ন ধরনের অনুকূল এবং প্রতিকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হতে থাকে। কখনো দাওয়াতের সাফল্যের লক্ষণ দেখে তাদের অন্তরে কাতুকুতু সৃষ্টি হয়ে যায় যে, সামনে অগ্রসর হয়ে দাওয়াতকে কবুল করে নিতে চায়। কখনো বিপদ মুসীবত এবং বাধাবিপত্তি দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে নীরব হয়ে যায় এবং দাওয়াতকে নির্বুদ্ধিতা এবং আহবানকারীকে নির্বোধ এবং পাগল সাব্যস্ত করতে থাকে। কিন্তু বিরোধীদের মত উদ্দীপনা নিয়ে দাওয়াতের মূলোৎপটনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া অথবা প্রকাশ্য ভাবে তার উপর ঈমান এনে এর সাহায্য সহযোগীতার জন্যে আদাপানি খেয়ে লেগে যাওয়াটা তাদের পক্ষে খুব কমই ঘটে থাকে। এরা যদি দাওয়াতের মূলোৎপটনের কামনা করে তাহলে এভাবে নয় যে, তার মূলোৎপটন করার জন্য তাদের নিজেদের কোন বিপদের ঝুঁকি বহন করতে হতে পারে। বরং তারা চায় এই নৌকা কোন শিলাখন্ডের সাথে ধাক্কা খেয়ে আপনা আপনি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাক। অনুরূপভাবে এরা যদি দাওয়াতের সাফল্য কামনা করে তাহলে এমন ভাবে নয় যে, এ পথে তাদেরকে কোন আঘাত সহ্য করতে হবে। বরং তারা চায়, অন্যরা দাওয়াতের জন্য ধনসম্পদ এবং জীবন উৎসর্গ করে তাকে সাফল্যের শিখরে পৌছে দেবে আর এরা তার ফল ভোগ করবে।

৩. অসচেতন গ্রুপ

অসচেতন (মোগাফফিলীন) বলতে জনসাধারনের সেই অংশকে বুঝানো হচ্ছে যারা নিজেদের রুজি রুটি এবং দৈনন্দিনের প্রয়োজন মিটাতে গিয়ে কখনো এতটুকু

নির্ভীকতা এবং উন্নত চরিত্র ব্যক্তি পূজার জড়তা অতিক্রম করে হকের পূজার পথ খুলে দেয়। এবং একের পর এক এই স্তরের লোকদের একটা বিরাট অংশ হকের বাহু বন্ধনে এসে যায়।

(১৪)

হকের দাওয়াতের সমর্থনকারী দল

হকের দাওয়াতের বিরোধীদের মত এর সমর্থনকারী লোকেরাও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত–

১. অগ্রবর্তী দল (সাবেকীনাল আওয়ালীন)।

২. উত্তম অনুসারী দল (মুত্তাবিঈনা বি–ইহসান)।

৩. দুর্বলচেতা এবং মোনাফিকের দল।

অগ্রবর্তী দল

হকের দাওয়াতের সমর্থনকারী লোকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হচ্ছে অগ্রবর্তী দলের লোকেরা। হকের দাওয়াত উত্থিত হওয়ার সাথে সাথেই যেসব লোক তা কবুল করে নেয় এবং অসংকোচে তার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়–তারাই হচ্ছে অগ্রবর্তীদলের লোক। এরা হচ্ছে সুস্থ প্রকৃতির অধিকারী লোকদের দল–যারা দাওয়াত পাবার পূর্বেও নিজেদের মধ্যে এমন জিনিসের অনুভব করতে থাকে–যেদিকে হকের আহবানকারী লোকদের ডেকে থাকে। এরা বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে এতটা উন্নত হয়ে থাকে যে, তারা শুধু দুনিয়ার প্রকাশ্য দিক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেনা, বরং এর অদৃশ্য দিকের ইংগিতসমূহও অবলোকন এবং হৃদয়াংগম করতে থাকে। তাদের দৃষ্টিতে প্রকাশ্য দিকের চেয়ে এই গোপন রহস্যেরই প্রকৃত মূল্য রয়েছে। তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় কেবল প্রবৃত্তির গোলাম হয় না, বরং বুদ্ধিবিবেক এবং স্বভাব–প্রকৃতির দাবীসমূহ জানার চেষ্টা করে এবং জীবনের প্রতিটি স্তরে এই দাবীগুলোকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তাদের জ্ঞানবুদ্ধি এতটা শক্তিশালী এবং কর্মতৎপর হয়ে থাকে যে, তারা বাপদাদা ও পূর্ব পুরুষদের রীতিনীতি ও প্রচলিত প্রথার জিঞ্জিরে বন্দী থেকে অসহায়ভাবে পড়ে থাকাটা কখনো পছন্দ করে না। তারা প্রতিটি কথার ভাল এবং মন্দ দিক সম্পর্কে অবহিত হওয়ার চেষ্টা করে, এটাকে সমালোচনা ও পর্যবেক্ষণের মানদন্ডে স্থাপন করে, এর মধ্যে যে জিনিসকে বুদ্ধিবিবেক, স্বভাব–প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পায় তা কবুল করে নেয়। সাম্প্রদায়িক এবং সাংগঠনিক গোঁড়ামী ও অন্ধ অনুসারিতা

থেকে এরা মুক্ত এবং স্বাধীন। তাদের মতে সত্য কোন ব্যক্তি বিশেষের আঁচলে বন্দী থাকতে পারে না, কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর মধ্যেও অবরুদ্ধ থাকেনা এবং তা পরিত্যাক্ত সম্পত্তির ন্যায় ওয়ারিসদের কাছে হস্তান্তরিত হয় না, তারা কোন কথাকে সত্য বলে মেনে নেয়ার জন্য জ্ঞানবুদ্ধি এবং প্রকৃতির সাক্ষ্যকেই যথেষ্ট মনে করে। তারা একথার মোটেই পরোয়া করে না যে, কে এ কথার বিরোধী আর কে সমর্থক। তারা অতীতেরও মুরীদ নয়, বর্তমানেরও দাস নয়। তারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ছাড়া কোন মহান থেকে মহত্তম নেতাকেও মুজ্তাহিদ এবং সনদ হওয়ার মর্যাদা দান করেনা।

অনুরূপভাবে এসব লোক নৈতিক এবং কর্ম সম্পাদনার দিক থেকেও অনেক উন্নত হয়ে থাকে। তাদের জ্ঞান যে জিনিসের সত্য হওয়াকে তাদের সামনে তুলে ধরে–তাদের নৈতিক সাহস তাদেরকে তা গ্রহণ করতে এবং তার জন্য যে কোন ক্ষতিকে বরদাশত করতে প্রস্তুত করে দেয়। হকের সাহায্যের জন্য এসব লোক প্রখর অনুভূতি সম্পন্ন হয়ে থাকে। তাদের পক্ষে হককে নির্যাতিত অবস্থায় দেখা সম্ভব নয়। এ জন্য তাদের মন সব সময় দুঃখ ভারাক্রান্ত থাকে। তারা সমসাময়িক যুগের এমন প্রতিটি কাজেই অংশ গ্রহণ করে যার মধ্যে তারা সামষ্টিক কল্যাণের কোন দিক দেখতে পায়। হকের জন্য কোন কাজ হচ্ছে, অন্যরা তার জন্য দুঃখ-মুসীবত ভোগ করছে, জানমাল কোরবানী করছে–আর তারা নীরবে তামাশা দেখার মত তা অবলোকন করে যাচ্ছে, অথবা দূর থেকে কিছু প্রশংসা–সূচক বাক্য উচ্চারণ করে পরিতৃপ্ত হয়ে যাবে–এমন আচরণ তাদের ব্যক্তিত্ব কখনো বরদাশত করতে পারে না। বরং এই দাওয়াতকে সম্প্রসারিত করার জন্য তারা নিজেরাও সক্রিয় হয় এবং এ পথে বড় থেকে বৃহত্তর কোরবাণী পেশ করার জন্য নিজেদের পেশ করে দেয়। তারা নিকৃষ্টতম পরিবেশেও উত্তম ও নিষ্কলুস জীবন যাপন করার জন্য চেষ্টিত থাকে এবং এজন্য নিজেদের যুগের জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত থাকে। যেখানে সবার হাত জুলুম এবং অন্যায়–অবিচারে পরিপূর্ণ সেখানে তারা আদল-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে। যেখানে এতীমদের হক আত্মসাৎ হয়ে যাচ্ছে, যেখানে কন্যা সন্তানদের জীবন্ত কবর দেয়া হয়, যেখানে বিধবাদের সংগীহীন সাহায্যহীন অবস্থায় ফেলে রাখা হয়–সেখানে তারা এতিমদের হক পৌঁছে দেয়, যালেম পিতার কন্যা সন্তানদের নিজ খরচে লালন–পালন করার দায়িত্ব গ্রহণ করে এবং বিধবাদের দেখাশুনা করে। যেখানে জুয়া, শরাব, ব্যভিচার, রাহাজানি এবং লুটতরাজকে কৌশল মনে করা হয় এবং এজন্য গৌরব করা হয়–সেখানে তারা

উদারতা, বদান্যতা, সৃষ্টিরসেবা, অতিথি সেবা, আর্তগরীবদের সেবা, নির্যাতিতদের সাহায্য এবং অন্যান্য ব্যাপারে উন্নত চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়। তাদের মধ্যে গর্ব-অহংকারের পরিবর্তে বিনয় ও নম্রতা এবং সত্য প্রীতির আবেগ দেখা যায়। হিংসা-বিদ্বেষের স্থলে হকের পথে বেঁচে থাকা এবং অগ্রবর্তী হওয়ার চেষ্টা করে। আত্মকেন্দ্রিকতা ও স্বার্থপরতার স্থলে স্বার্থত্যাগ ও খেদমতে-খালকের আবেগে পরিপূর্ণ থাকে। কোন ব্যবস্থাকে সত্য বলে মেনে নেয়ার পর অপমান ও লাঞ্ছিত হওয়ার আশংকায় অথবা আরাম-আয়েশের সুযোগ খতম হয়ে যাওয়ার ভয়ে তার সাহায্য করতে এগিয়ে না আসাকে তারা অত্যন্ত জঘন্য ব্যাপার মনে করে। অনুরূপভাবে কোন একটি জিনিসকে বাতিল বলে স্বীকার করে নেয়ার পর এর সাথে নিজেদের কোন পার্থিব স্বার্থ জড়িত থাকার কারণে তাকে পরিত্যাগ না করাকেও তারা অত্যন্ত লজ্জার মনে করে। কোন একটি সৎকাজ করতে গেলে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অথবা বাতিল খুবই শক্তিশালী, এর মোকাবিলা করা সম্ভব নয়, অথবা যুগের পরিস্থিতি অত্যন্ত প্রতিকূল এবং এই প্রতিকূল অবস্থায় হকের আহবানকারীদের কাজ হচ্ছে দুঃখ ও বিপদাপদকে ডেকে আনা—এর কারণে হকের সাহায্যকারী না হওয়াটাও তাদের পৌরুষত্ব ব্যক্তিত্বের জন্য অসম্মানজনক মনে করে। প্রথম কথা হচ্ছে এই ধরনের আশংকা তাদের প্রশস্ত হৃদয়ের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে না, যদিও বা সৃষ্টি হয় তাহলে তাদের জাগ্রত মনোবল শীঘ্র তা দূর করে দিতে সক্ষম হয়। এবং তাদের অন্তরের গভীর থেকে যে কাজের ডাক উঠছে তা করার জন্য তারা নতুন উদ্যমে প্রস্তুত হয়ে যায়।

এ ধরনের একটি পবিত্র ও নিষ্কলুষ দল প্রত্যেক যুগের জাহেলী ব্যবস্থার মধ্যে বর্তমান থাকে। বৃষ্টির অন্ধকার রাতে জোনাকীরা যেভাবে আলোর চমক দেখায়, অনুরূপভাবে এই লোকেরা নিজেদের যুগের অন্ধকারের মধ্যে আলোকের মত বিচরণ করে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে তাদের যুগে আলোর একটি দৃশ্য অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু তাদের শক্তি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকে। এজন্য তাদেরকে সংঘবদ্ধ করে ঐক্যসূত্রে গেঁথে নেয়ার জন্য কোন হকের আহবানকারীর উত্থিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাদের মধ্যে এসব সৌন্দর্য ও যোগ্যতার সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও দুটি কারণে তারা একজন হকের আহবানকারীর মুখাপেক্ষী।

একটি কারণ তো হচ্ছে এই যে, তাদের যুগে হক তার সমষ্টিগত আকারে বর্তমান থাকে না। শুধু তার কতগুলো অংশ বিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকে। যেমনটা নবীদের সেই নবীর মধ্যবর্তী যুগে হয়েছিল। এইরকম সময়ে সালেহীনদের এই দলটি

একে সুবিধাজনক এবং সঠিক অবস্থান চিহ্নিত থাকে, এই লোকেরা দুনিয়ার সাধারণভাবে প্রকৃতির ছাড়াছাড়ি কোন জিনিস হক টিকাই; কিন্তু এই প্রকৃতির সংশোধন কিভাবে করা যায় তা তাদের জানা থাকে না। তারা নিজেদের সমসাময়িক যুগের দুর্নীতি থেকে যতদূর সম্ভব নিজেদের মুক্ত রাখেন, কিন্তু নেকী এবং গোমরাহের রাজপথ তাদের সামনে বর্তমান থাকে না। সুতরাং অন্যদেরকে সেদিকে ডাকার প্রশ্নই উঠে না। তারা এটা ঠিকই অনুভব করেন যে, সাধারণ ভাবে আল্লাহকে পাবার একমাত্র বন্দনার মাধ্যম আল্লাহ তায়ালা, কিন্তু আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার পন্থা সরাসরি তাদেরও জানা থাকে না এবং তা জানারও কোন উপায় তাদের কাছে থাকে না। এই শ্রেণীর লোকেরাই নবুয়্যাতে মুহাম্মাদীর প্রাক্কালে এবং সাহাবাদের আগমনের পূর্বে কোরাইশদের জাহেলী ধর্মের প্রতি বিরাগ হয়ে নিজস্বভাবে আল্লাহর ইবাদত করতো এবং কাবা ঘরের দেয়ালের সাথে মিশে গিয়ে অত্যন্ত অনুতাপের সাথে বলত,

“হে আল্লাহ! তোমার ইবাদত করার পদ্ধতি কি তা আমাদের জানা নেই। অন্যথায় আমরা সেই পদ্ধতিতে ইবাদত করতাম।”

তাদের স্বাভাবিক জ্ঞানের মানসিকতা সম্পন্ন কবিও ছিল। তাদের কবিতার ঢং তাদের যুগের সাধারণভাবে প্রচলিত ইন্দ্রিয়াসক্ত ও অশ্লীলতাপূর্ণ কবিতার চেয়ে এতটা ভিন্নতর ছিল যে, স্বয়ং নবী করীম (সঃ) তাদের কবিতা শুনে এভাবে প্রশংসা করেছেনঃ

“এরা মুসলমান হবার পথে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল।” তাদের মধ্যে অনলবর্ষী বক্তাও ছিল, যাদের বক্তৃতা বর্তমান কালেও মওজুদ রয়েছে। তা পাঠ করে প্রতিটি ব্যক্তি অনুমান করতে পারবে যে, তারা সত্যের দরজায় করাঘাত করেছিল অবশ্যই, যদিও তা খুলতে সক্ষম হয়নি। এদের মধ্যে অরাকা ইবনে নওফেল, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসমান ইবনে হুয়াইরিস, ইয়াযীদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল প্রমুখের মত নির্ভীক লোক ছিল। তারা প্রকাশ্যভাবেই বলত, “এটা কি বাজে এবং অর্থহীন কথা যে, আমরা একটা পাথরের সামনে মাথা নত করি। অথচ এটা না শুনতে পায়, না দেখতে পায়, না কোন ক্ষতি করতে পারে, আর না কারো কোন উপকার করতে পারে।”

এই লোকেরা সত্যের সন্ধানী ছিল, কিন্তু তাদের সময় পূর্ণ হক বর্তমানই ছিল না। এজন্য তারা হক নিয়ে আগমনকারী একজন লোকের মুখাপেক্ষী ছিল যে, তিনি

তাদের পথ প্রদর্শন করবেন। সুতরাং যখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব হল এবং তিনি হকের আওয়াজ বুলন্দ করলেন তখনই তাঁর যুগের হকের অনুসন্ধানী সমস্ত লোক তাঁর চারপাশে এসে জমা হয়ে গেল। এই লোকেরা হকের স্বাদের সাথে পরিচিত ছিল, তাই হককে চেনার ব্যাপারে তাদের কোন কষ্ট হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি কথা তাদের কাছে তাদের নিজেদের হৃদয়ের কথাই মনে হল। তারা একজন সহজ সরল ব্যক্তি এবং একজন মিথ্যুকের মধ্যে সহজেই পার্থক্য করতে পারত। এ জন্য তাঁর পূতপবিত্র চরিত্র দেখার পর তাদের এরূপ ধারণাও হয়নি যে, এই ব্যক্তি মিথ্যাও বলতে পারে। তারা তাঁর আহবান এবং তাঁর চেহারা দেখেই তাঁর নবুওয়াতকে চিনে ফেলেছে এবং ডাক দিয় উঠেছে।–

رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِي لِلاِيمَانِ اَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا – (آل عمران-١٩٣) ـ

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবানকারীর ডাক শুনেছি–তিনি ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান আন। অতএব আমরা ঈমান এনেছি।" (সূরা আলে ইমরানঃ ১৯৩)

এই লোকেরা যেহেতু হকের জন্য অপেক্ষমান ছিল, এজন্য তা পেয়ে যাওয়ার পর তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়নি। বরং তা পেয়ে যাওয়ার পর তাদের অবস্থা এমন হয়ে গেল–যেমন হারানো বন্ধুকে অনেক দিন পর ফিরে পাবার পর যে অবস্থা হয়ে থাকে।

وَاِذَا سَمِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَى الرَّسُولِ تَرَى اَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا اٰمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ * (مائده- ٨٣) ـ

"রসূলের ওপর যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা যখন তারা শুনতে পায়–তখন তোমরা দেখতে পাও হককে চিনতে পারার আবেগে তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে যায়। তারা বলে, হে আমাদের প্রভু! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদেরকে হক প্রকাশকারীদের মধ্যে লিখে নিন।" (সূরা মায়েদা ঃ ৮৩)

দুইঃ তাদের বিচ্ছিন্নতা এবং অসংগঠিত থাকার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, হক তাদের সামনে বর্তমানে থাকতে পারে, তারা এ দাবী এবং দায়িত্ব–কর্তব্য

বোঝার জন্য কোন নবীর আগমন এবং কোন কিতাব নাযিলের মুখাপেক্ষী না হতে পারে, কিন্তু তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য এমন কোন নেতার অভাব থেকে যায়–যে তাদের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে এক পথে নিয়োগ করতে পারে। যে সমাজে রাতের গাঢ়ো অন্ধকারের ন্যায় জাহেলিয়াত ছেয়ে রয়েছে–এমন একটি বিকৃত পরিবেশে সৎপথের সাথে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিটি লোকের মধ্যে এরূপ যোগ্যতা বর্তমান থাকে না যে, সে নিজেই কাফেলার পথ প্রদর্শন এবং জাতির নেতৃত্ব দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য সামনে এগিয়ে আসতে পারে। ইমামত এবং নেতৃত্বের পাগল তো নিসন্দেহে অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের পথ প্রদর্শনের জন্য এগিয়ে আসে, কিন্তু নেককার লোক–যারা নেতৃত্বের ভাল–মন্দ ও সুবিধা–অসুবিধা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন–যতদূর সম্ভব তারা এই মহান কাজের দায়িত্ব থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তারা নিজেদের খোদাভীতি এবং দায়িত্বানুভূতির কারণে প্রথমত নিজেদের পরিমাপ করার ব্যাপারে অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ হয়ে থাকে। যদি পরিমাপ করার ব্যাপারে তারা কোনরূপ ভুল করেও বসে–তাহলে এই ভুল তাদের দ্বারা সচেতন অবস্থায় এবং সজ্ঞানে সংঘটিত হয় না। তারা কখনো নিজেদের দিকের পাল্লা ভারী করার জন্য চেষ্টা করেনা। বরং তারা সাধ্যমত সতর্কতা অবলম্বন করার কারণে নিজেদের সম্পর্কে প্রকৃত যোগ্যতা থেকেও কমই অনুমান করে থাকে। নিজেদেরকে নিজেদের আসল যোগ্যতা থেকেও কম করে পরিমাপ করাটা সতর্কতা এবং তাকওয়ার একটি আবশ্যকীয় দাবী। অযোগ্য এবং অপদার্থ লোকেরা রাজনীতি ও নেতৃত্বে যতটা লোভী হয়ে থাকে–যোগ্য এবং উপযুক্ত ব্যক্তিরা তার প্রতি ততটা ভীতসন্ত্রস্ত থাকে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং হযরত উমর ফারুক (রাঃ) উভয়ে নিজনিজকে সাকীফায়ে বণী সায়েদায় যেভাবে খেলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণও আমাদের সামনে রয়েছে। খেলাফতে রাশেদার পরবর্তী যুগে এই জিনিসের জন্য অযোগ্য এবং লোভী ব্যক্তিরা যেভাবে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং খুনখারাবী করেছে তাও আমাদের জানা আছে। যেসব লোকের মধ্যে খোদার ভয় রয়েছে তারা অগ্রবর্তী হয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করার পরিবর্তে অন্যরা তা গ্রহণ করুক–সাধ্যমত এই চেষ্টা করেন। এই ধরনের অনুভূতি মূলতই কল্যাণকর। কিন্তু তারও একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। তারা যদি এই সীমা অতিক্রম করে যায় তাহলে এর ফল এই দাঁড়ায় যে, নেককার লোকদের ওপর ব্যক্তিগত পর্যায়ের বেকীর ধারণা প্রভাবশালী হয়ে পড়ে এবং হকের প্রতিষ্ঠার জন্য সমষ্টিগতভাবে আন্দোলন পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আল্লাহর যেসব বান্দা সামগ্রিকভাবে আন্দোলন পরিচালনা করার গুরুত্বকে ভালভাবে হৃদয়াংগম করতে

সক্ষম তারা এই ধরনের পরিস্থিতিকে বরদাশত করতে পারেনা। তারা জানে যে, এই ধরনের ব্যক্তিগত আমল এবং বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার দ্বারা দ্বীনে হকের দাবী পূর্ণ হতে পারে না। এই অনুভূতি যখন কোন ব্যক্তির উপর এতটা প্রভাবশালী হয়ে পড়ে যে, সে তাকে আর দাবিয়ে রাখতে পারে না— তখন সে আল্লাহর দ্বীন নিয়ে একাকিই দাঁড়িয়ে যায় এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য আহবান জানাতে থাকে।

এই আহবান জামায়াতে নামায পড়ার জন্য অপেক্ষমান লোকদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে নেয়। তারা তার সাথে এজন্য ঝগড়া বাধায়না যে, তুমি কেন আযান দিলে। কেননা তারা জানে যে, আযানের সময় কখন হয়ে গেছে। তারা এজন্যও হিংসায় পুড়ে মরেনা যে, এই কাজ সে করল কেন, তারা করলনা কেন। বরং তারা তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, সে এমন কাজ করেছে যার অপেক্ষায় তারা বিছানায় শুয়ে শুয়ে পার্শ পরিবর্তন করতে থেকেছে, কিন্তু উঠার সাহস করতে পারেনি। তারা এটাও দেখার প্রয়োজন মনে করে না যে, এই ব্যক্তি পূর্ণাংগ মুত্তাকী রাত্রি জাগরণকারী সাধক কি না। কেননা তারা জানে যে, সমস্ত শবজিন্দা সাধক এবং পরিপূর্ণ মুত্তাকী শুয়ে আছে এবং সময়ের কর্তব্য কাজ জানার তৌফিক এই ব্যক্তিরই হয়েছে। তারা এটাও চিন্তা করে না যে, সে আজ যেভাবে আজকের দায়িত্ব পালন করেছে, আগামীকালের দায়িত্বও অনুরূপভাবে পালন করতে পারবে কি না। বরং তারা আশা রাখে যে, সে আজকের কাজ যেভাবে আঞ্জাম দিয়েছে, অনুরূপ ভাবে আগামী কালের কাজও সম্পাদন করার তৌফীক পেয়ে যাবে। যদি সে তৌফীক না হয় তাহলে আল্লাহ তাআলা আগামী কালের কাজের জন্য আর কোন বান্দাকে দাঁড় করিয়ে দেবেন। সে কোন্ গোত্রের? কোন্ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডিগ্রীধারী? তার অতীত কেমন ছিল? এসব প্রশ্ন তাদের কাছে আলোচনার বাইরে। এজন্য যে, সত্য কোন গোষ্ঠী অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। যে ব্যক্তি বর্তমান সময়ের করনীয় কাজ কি তা বুঝতে সক্ষম হয়েছে তার কাছে অতীতের জট খোলার অবসর নেই। এধরনের নির্মল মানসিকতার অধিকারী লোক— যারা পূর্ব থেকেই হকের কালেমা সমুন্নত করার আকাংখা পোষণ করে আসছে— তারা সমাজে এই দাওয়াতের অভাবে নিজেদের ব্যথা বেদনার নিরাময় লাভ করতে থাকে। একারণে তারা অবিলম্বে এই দাওয়াত কবুল করে নেয় এবং তাকে সফলতার দ্বার পর্যন্ত পৌঁছানোর সংগ্রামে তৎপর হয়।

এই দলটির মধ্যে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহরে-গ্রাম্য, যুবক-বৃদ্ধ, পুরুষ-নারী প্রত্যেক পর্যায়ের লোক পাওয়া যায়। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিই

নৈতিক দিক থেকে কখনো নীচু মানের নায়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে নিজের গুণাবলীর দিক থেকে পূর্ব থেকেই বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী এবং নিজের পরিমন্ডলে অন্যদের কাছে নির্ভর যোগ্য বলে স্বীকৃত। এই লোকদের একত্র করার জন্য হকের আহ্বানকারীকে ব্যাপক পরিশ্রম করতে হয়না। বরং তারা নিজেরাই প্রতিটি স্থান থেকে আকর্ষিত হয়ে আহ্বানকারীর চারপাশে জড়ো হয়। আহ্বানকারী তাদের খোঁজ করে বের করেনা। বরং তারাই আহ্বানকারীকে খুঁজে নেয়। এরা পিপাসার্ত। এজন্য তারা এটা আশা করেনা যে, নদীর প্রবাহ তাদের কাছে এসে যাক, বরং মরুভূমি ও পাহাড়পর্বত অতিক্রম করে তারাই পানির উৎসের কাছে পৌছে যায়। তাদের প্রকৃতির স্বচ্ছ তৈল আগুনে স্পর্শ করার পূর্বেই প্রজ্জলিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। এ কারণে দিয়াশলাই দেখার সাথে সাথে প্রজ্জলিত হয়ে উঠে। তারা কোন মু'জিযা বা অলৌকিক কিছু দেখানোর দাবি করে না। নাম, বংশ পরিচয় ও বংশ তালিকা জিজ্ঞেস করেনা, অর্থহীন বিতর্ক ও যুক্তিপ্রমাণ দাড় করায় না। শুধু এতটুকুই দেখে যে, আহবানকারী যে কথার দিকে ডাকছে তা সত্য কি না। এবং নিজেও এ পথের অনুসরণ করছে কিনা। যদি এদিক থেকে তারা নিশ্চিত হয়ে যায় তাহলে তারা পরিপূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে তার অনুসারী হয়ে যায়। ভবিষ্যতের কোন সম্ভাব্য বিপদের আশংকায় আজকের একটি বাস্তব সত্যকে তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেনা। তারা একথার ওপর নিশ্চিত থাকে যে, যে জ্ঞানের ভিত্তিতে তারা আজ হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে হককে গ্রহণ করেছে—সেই জ্ঞান আগামী কালও হক এবং বাতিলের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য তাদের কাছে বর্তমান থাকবে। যদি তারা দেখতে পায় যে, কোন স্তরে আহবান কারীর রাস্তা হকের রাজপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে, তখন সেখান থেকে তারা আহবান কারীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের লক্ষ্য অপবিত্র না করে হকের রাজপথে নিজেদের লক্ষ্য স্থির করে দেয়।

২. উত্তম অনুসারী দল

হকের দাওয়াত কবুলকারীদের দ্বিতীয় পর্যায়ের লোক হচ্ছে উত্তম অনুসারীদের দল; অর্থাৎ যারা অগ্রবর্তী দলের দেখা দেখি হকের দিকে অগ্রসর হয়। এই লোকেরা জ্ঞানবুদ্ধি এবং চরিত্র নৈতিকতার দিক থেকে অগ্রবর্তী দলের সমান পর্যায়ের নয়। এ কারণে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন বড় ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারেনা। এবং কোন নতুন পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য পা উঠাতে ভয় পায়। তাদের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা বর্তমান থাকে না। এজন্য অন্যদের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী

লোকদের সাহসিকতা ও বীরত্ব তাদেরকে যতটা প্রভাবিত করে, হকের দাওয়াতের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং প্রামানিক শক্তি তাদেরকে ততটা প্রভাবিত করতে পারে না। এরা যখন দেখতে পায় হকের কোন দাওয়াত আত্মপ্রকাশ করছে, কতিপয় লোক সামনে অগ্রসর হয়ে সাহসিকতার সাথে তা কবুল করে নিয়েছে, তাকে নিয়ে তারা আরো সামনে অগ্রসর হচ্ছে এবং তাকে দুনিয়ায় প্রসারিত করার জন্য তারা যে কোন ধরনের বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা বরদাশত করার জন্য প্রস্তুত আছে– তখন এটা তাদের অন্তরকে প্রভাবিত করে এবং তারা এর সহযোগীতা করার জন্য নিজেদের সাহস–শক্তিকে পরীক্ষা করতে থাকে। এই লোকদের যোগ্যতা এবং প্রতিবন্ধকতা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এজন্য এই দলে কিছুটা সময় লেগে যায়। কিন্তু হকের আহবানকারীদের অবিরত প্রচেষ্টা এবং তাদের সামনে আগত বিপদাপদে তাদের ধৈর্য ও অবিচলতা দেখতে দেখতে শেষ পর্যন্ত তাদের অন্তরের রংও পরিষ্কার হয়ে যায়। এবং তারা সাহস করে একের পর এক বাতিল থেকে বের হয়ে এসে হকের সাথে মিলিত হয়।

এই লোকেরা যদিও অগ্রবর্তী দলের দেখাদেখি হকের দাওয়াতের সহযোগী হয়ে থাকে, কিন্তু যখন সহযোগীতা করে তখন পূর্ণ সহযোগীতা করে, কোন প্রকারের দুর্বলতা, সংশয় সন্দেহ, কাপুরুষতা, মানসিক দুর্বলতা এবং নিফাকের প্রকাশ করেনা। তার কারণ এই যে, তারা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক দিক থেকে যদিও প্রথম কাতারের লোক নয়, কিন্তু দ্বিতীয় সারির উন্নত ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকে। তারা নিজেদের অহংবোধের দুর্বলতার কারণে নিজেদের যুগের জাহেলিয়াতের দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়, কিন্তু তাদের মধ্যেকার হকের চেতনা একেবারে মরে যায় না। এ কারণে বাতিল ব্যবস্থার গাড়ী যতক্ষণ টানতে থাকে, কষ্ট এবং অস্থিরতা সহকারে টেনে থাকে এবং নিজেদের হৃদয়ের গভীরে হকের প্রতি মর্যাদা অনুভব করতে থাকে। বাতিল ব্যবস্থার সাথে তাদের এই সংযোগ কখনো সংকুচিত হয়ে যায়, আবার কখনো প্রসারিত হয়। কিন্তু এই সংযোগ কখনো একেবারে ছিন্ন হয়ে যায় না। নিঃসন্দেহে বলা যায় নিজেদের পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে তাকে পরিবর্তন করে দেয়ার মত যোগ্যতা তাদের মধ্যে থাকে না। একারণে তাদেরকে নিজেদের যুগের জাহেলী ব্যবস্থার উপর পরিতৃপ্ত থাকতে হয়। কিন্তু তাদের এই পরিতৃপ্তির গভীরে একটি বেদনা চাপা পড়ে থাকে। যখন তাদের সামনে হকের কোন দাওয়াত এসে যায় তখন এই বেদনা উত্থিত হয়ে আসে। এই যাতনা বৃদ্ধি পেতে পেতে যখন তাদের সহ্যের সীমার বাইরে চলে যায়, তখন তারা সাহস করে সেই পথে অগ্রসর হতে থাকে যে পথে কতিপয় সত্যপন্থী লোকদের তারা চলতে দেখে। তাদের এই আসাটা যেহেতু নিজেদের ইচ্ছায়

হয়ে থাকে, অন্য কারো চাপের কারণে নয় এবং তাদের এই পদক্ষেপ যেহেতু তাদের নির্ভীকতার দাবী অনুযায়ী হয়ে থাকে, কোন গোপন স্বার্থপরতার কারণে নয়, এজন্য সংকল্প ও দূরদৃষ্টির পাথেয় তাদের কাছে মওজুদ থাকে—যা পরবর্তী স্তরসমূহে এবং বিপদে আপদে তাদের ঈমানের হেফাজত করে এবং বড় থেকে বৃহত্তর কোন পরীক্ষায়ও তাদের পা কসকে যেতে দেয়না।

এই লোকদের হকের দিকে টেনে আনার জন্য হকের আহবানকারীকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়। আমরা পূর্বেও বলে এসেছি যে, এই লোকেরা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকেও এতটা অগ্রগামী নয় যে, হকের বাস্তব নমুনা দেখা ছাড়াই তারা তাদের আয়ত্বে আসতে পারে, আর নৈতিক দিক থেকেও তারা এতটা উন্নত নয় যে, তার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে পারে। তাদের এই দুটি দুর্বলতার কারণে হকের আহবানকারীকে তাদের সাথে কিছুকাল যাবত সংঘাতে লিপ্ত থাকতে হয়। সর্বপ্রথমেই তারা এই কথার মুখাপেক্ষী যে, তাদের সামনে হককে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে এর কোন দিকই অস্পষ্ট থেকে যেতে না পারে। তাদের মনের মধ্যে যেসব সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হয় তাও দূর করতে হবে এবং অন্যদের দ্বারা যেসব সন্দেহ তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে যতদূর সম্ভব তাও দূরীভূত করার চেষ্টা করতে হবে। এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তাদের হৃদয় পূর্ণরূপে দাওয়াতের সত্যতার ওপর জমে যেতে পারে। যখন এটা সম্ভব হবে তখন তাদের নৈতিক মনোবল বৃদ্ধি করার জন্য তাদের সামনে দৃঢ় সংকল্পপূর্ণ এবং বীরত্বপূর্ণ ঘটনার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হবে। এসব দৃষ্টান্ত তাদের মনের শক্তি বৃদ্ধি করে দেবে, তাদের দুশ্চিন্তা ও সংশয় দূর করে দেবে, প্রতিকূল পরিবেশেও তাদেরকে হক পথে চলার পন্থা বলে দেবে। এভাবে তাদের জ্ঞানবুদ্ধি এবং তাদের অন্তর উভয়ই পূর্ণরূপে জীবন্ত এবং জাগ্রত হয়ে যাবে। অতপর আল্লাহর তৌফীক যদি তাদের সহায়তা করে তাহলে তারা হকের রাস্তায় চলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে।

৩. দুর্বলচেতা এবং মোনাফিকের দল

দুর্বলচেতা লোক এবং মোনাফিকদের আমরা শুধু বাহ্যিক সাদৃশ্যের কারণে একই দলভুক্ত করেছি। কিন্তু নিয়াত ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে তারা পৃথক দুটি দল। এজন্য আমরা এখানে সংক্ষেপে এবং পৃথক পৃথক ভাবে তাদের গুণাবলী ও বিশেষত্ব আলোচনাকরব।

দুর্বলচেতা বলতে এমন লোকদের বুঝায় যারা বুঝেশুনে হককে তো কবুল করে নেয় এবং সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করার নিয়াতও রাখে, কিন্তু তাদের ইচ্ছাশক্তি

ও সংকল্প দুর্বল থাকে। এ কারণে একনিষ্ঠ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও তারা হকের পথে নড়বড়ে অবস্থায় অগ্রসর হয় এবং পদে পদে হোঁচট খেতে খেতে চলতে থাকে। এই লোকেরা বারবার পড়ে যায় আবার উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু প্রত্যেকবার পতিত হওয়ার পর তাদের উঠে দাঁড়ানোটা হকের পথে চলার জন্যই হয়ে থাকে। এমনটা হয়না যে, হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল তো উঠে দাঁড়ানোর আর নাম নেই, অথবা উঠলো তো হকের পথের পরিবর্তে বাতিলের পথ ধরে অগ্রসর হওয়া শুরু করল। এরা নিজেদের ভুলত্রুটি স্বীকার করে এবং এজন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। এবং অনবরত তওবা ইস্তেগফার করার মাধ্যমে এই মালিন্য দূরীভূত করার চেষ্টা করে। মনমানসিকতা এবং নিয়্যতের দিক থেকে এরা নিম্নস্তর পর্যায়ের নয়। একারণে তাদের মধ্যে এমন ভাল লোকও পাওয়া যায় যারা দাওয়াতের সূচনা মূহুর্তেই তা কবুল করে নেয়ার সাহস করে, কিন্তু পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাদের ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার প্রকাশ ঘটতে থাকে এবং প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারা সব সময় প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। সূরা তওবায় এ ধরনের লোকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছেঃ

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (توبه - ١٠٢)

"আরো কিছু লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। তারা কিছু ভাল কাজও করে এবং এর সাথে সাথে কিছু খারাপ কাজও তাদের দ্বারা প্রকাশ পায়। আশা করা যায় আল্লাহ্ তাআলা তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাশীল এবং করুণাময়।"–(আয়াতঃ ১০২)

এই লোকদের মধ্যে সাহসিকতা ও অবিচলতা সৃষ্টি করার জন্য তাদের সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কারণ–সমূহ ভালভাবে অনুসন্ধান করে তা দূর করার জন্য চেষ্টা করা প্রয়োজন। যদি এই দুর্বলতার কারণগুলো মানসিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যায়ের হয়ে থাকে তাহলে তাকে আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুনাবলী, তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা, তাঁর কৌশল এবং তাঁর নির্ধারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান সম্পর্কে অবহিত করা দরকার। তিনি এই বিধান মোতাবেক তাঁর পথে অগ্রসরমান লোকদের সাথে ব্যবহার করে থাকেন। যদি তার মধ্যে দুনিয়ার লোভ লালসা থেকে থাকে তাহলে তাকে আল্লাহর রাস্তায় ধনসম্পদ খরচ করার জন্য অভ্যস্ত করতে হবে। তাহলে এই রোগ দূর হতে পারে। যদি তার মধ্যে জীবনের মায়া এবং মৃত্যুর ভয় অধিক প্রবল হয়ে থাকে তাহলে তার সামনে মৃত্যুর নিশ্চিত আগমন এবং হকপন্থীদের জন্য

পরিণামের দিকটি পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরতে হবে। এই পর্যায়ভুক্ত লোকেরা শিক্ষা প্রশিক্ষণের সুযোগকে কাজে লাগায়। তাই ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতার কারণে তাদের উন্নতি ধীর গতিতে হলেও তারা এক জায়গায় থেমে থাকেনা। বরং শিক্ষা প্রশিক্ষণের সুযোগ থেকে ফায়দা উঠিয়ে সামনে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে। এই ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * (توبه ١٠٣)

"তুমি তাদের ধনমাল থেকে সদকা গ্রহণ করে তাদেরকে পাকপবিত্র কর এবং তাদের জন্য দোয়া কর। কেননা তোমার দোয়া তাদের জন্য সান্ত্বনার কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন।" –(সূরা তওবা ঃ ১০৩)

মোনাফিকদের দল মৌখিক স্বীকারোক্তি সীমা পর্যন্ত তো হকের দাওয়াতের অনুসারী হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের অন্তর বাতিলের সাথে লেগে থাকে। কখনো তো এরূপ হয়ে যায় যে, শুধু কোন সাময়িক প্রভাবে হকের সাথে এসে যুক্ত হয়, অতপর এ পথে যখন বাধা বিপত্তি ও পরীক্ষা শুরু হয়ে যায় তখন তারা নিজেদের এই হক গ্রহণ করার ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু শুধু কৃত্রিম লজ্জাবোধের কারণে বাধ্য হয়ে হকের সাথে বন্দী হয়ে থাকে। কখনো এমন হয়ে থাকে যে, তারা অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে হক পন্থীদের শিবিরে ঢুকে বিবাদ বিশৃংখলা সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানের জন্য হকের দিকে এসে থাকে। শুধু দেখানোর জন্য হকের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ ও কল্যাণকামী বলে যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে দুশমনদের এজেন্ট হিসাবেই কাজ করে। কখনো এমনও হয়ে থাকে যে, তারা হকের ক্রমবর্ধমান শক্তি অবলোকন করে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায় এবং নিজেদের পার্থিব সুযোগ সুবিধার খাতিরে হকের সাথে কিছুটা বাহ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। এই কারণে এবং এজাতীয় আরো অন্যান্য কারণে তারা মুখে হকের প্রকাশ করে এবং সাধ্যমত এই প্রকাশকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে বটে কিন্তু প্রতি পদে পদে তাদের ভ্রান্তি এবং দুষ্কৃতি তাদের আসল চেহারাকে উন্মোচিত করে তুলে ধরে।

এই শ্রেণীর লোকদের দ্বারা হকের আহবানকারীর কাজ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পর্দার অন্তরালে হকের কল্যাণকামীর বেশে অবস্থানকারী মোনাফিকদের এই দল হকের আন্দোলনের জন্য যতটা বিপদজনক–হক বিরোধীদের কোন দলই এর জন্য

ততটা বিপ্লবজনক নয়। এরা আপনজনের ভান ধরে অন্যের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করে এবং এতটা সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে কাজ করে যে, অন্য কেউ ততটা সুন্দর ও নিখুঁতভাবে তা করতে সক্ষম নয়। এরা দাওয়াত এবং দাওয়াত দানকারীর বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে অসংখ্য ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করে থাকে। যেহেতু তাদেরকে নিজেদের লোক মনে করা হয় এবং তারা যা কিছু বলে নিষ্ঠা ও দরদের ভান করে বলে– এজন্য লোকেরা তাদের ছড়ানো বিভ্রান্তির শিকার হয়। এরা সব সময় সংগঠনের মধ্যে ভাংগন সৃষ্টির অপচেষ্টা করে এবং প্রতিটি অগ্নিস্ফুলিংগকে চেপে ধরে নিরাপদে হেফাজত করে যাতে সুযোগ মত তাতে ফুৎকার দিয়ে বিবাদ বিশৃংখলার আগুন জ্বালিয়ে দেয়া যায়। এরা সংগঠনের অভ্যন্তরে শত্রু–বাহিনীর দালালের ভূমিকা পালন করে। তাদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আড্ডা জমিয়ে বেড়ায়। আর প্রচার করে যে, হকের খেদমতের জন্যই এই আড্ডা বসানো হচ্ছে। হকের বিরোধিতা করার জন্য তারা হকের দুশমনদের সাথে সব সময় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। আর প্রকাশ্যে দাবী করে যে, এ সবই হকের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে। হকপন্থীদের উদ্দম উৎসাহ নস্যাৎ করে দিতে পারে এমন প্রতিটি কথা তাদের মনোপুত এবং তা ছড়িয়ে বেড়াতে বিশেষ মজা পায়। পক্ষান্তরে হকপন্থীদের শক্তিসাহস বৃদ্ধিকারী প্রতিটি কথা তাদের জন্য দুশ্চিন্তা ও নিরাশার কারণ হয়ে থাকে। হকের পথে তারা কদমে কদমে বিপদ আর বিপদই দেখতে পায়। সংগঠনের কল্যাণের রংএ সবসময় তাদের প্রচেষ্টা থাকে যাতে এই বিপদের ভয় প্রতিটি অন্তরে বসিয়ে দেয়া যায়। তারা নিজেদের কাপুরুষতাকে লুকানোর জন্য বিভিন্ন রকম ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অন্যদের আবেগ–উদ্দিপনা, শৌর্যবীর্য এবং স্বার্থ ত্যাগের মনোবৃত্তিকে দমিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। হকের বিজয় এদের জন্য নৈরাশ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ভবিষ্যতের গহবরে তারা হকের জন্য বিপদ এবং ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায়না। কর্মগত দিক থেকে তারা শূণ্যের কোঠায় অবস্থান করে। এ কারণে সংগঠনের অভ্যন্তরে নিজেদের অহংকের বজায় রাখার জন্য ভিত্তিহীন দাবী, মিথ্যা শপথ এবং তোষামদকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করে। হকের প্রতিটি সাফল্যকে তারা বিদ্বেষের চোখে দেখে। খোদা না করুন যদি হকপন্থীদের ওপর কোন বিপদ এসে যায় তাহলে তারা নিজেদের মনে শান্তনা অনুভব করে।

এই শ্রেণীর লোকেরা যেহেতু উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিশৃংখলা ও ফেৎনা ফাসাদ ছড়িয়ে বেড়ায় এজন্য তাদের মধ্যে সংশোধনকে গ্রহণ করার যোগ্যতা খুব কমই থাকে। এদের মধ্যে যারা শুধু কোন সাময়িক অসতর্কতায় ও অমনোযোগিতার

কারণে অন্যদের কপট ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মোনাফিকী কাজ করে বসে—কেবল তারাই সংশোধন প্রক্রিয়াকে গ্রহণ করে। এ ধরনের লোকদের সামনে যখন প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তখন তারা অবশ্যই নিজেদের ভুলের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং নিজেদের দৃষ্টিভংগিকে সংশোধন করারও চেষ্টা করে। কিন্তু যেসব পিশাচ দুষ্কর্মকেই নিজেদের ধর্ম বানিয়ে নেয় এবং নিজেদের এই পেশায় পূর্ণ অভিজ্ঞ ও দক্ষ হয়ে যায় তারা সংশোধনের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয় এবং নিজেদের দৃষ্টিভংগীর মধ্যে সামান্য পরিবর্তন আনতেও প্রস্তুত হয়না। এই ধরনের লোকদের বেলায় হকের আহ্বানকারীর কর্মপন্থা হচ্ছে এই যে, সংগঠনকে তাদের ফেৎনা থেকে নিরাপদ রাখার জন্য পূর্ণরূপে চেষ্টা করতে হবে। তার কৌশল হচ্ছে এই যে, তাদের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধিকে যতক্ষণ সংগঠনের শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও আত্মশুদ্ধির উপায় বানানো যেতে পারে ততক্ষণ তাদেরকে সংগঠনের অভ্যন্তরে খোলামেলা ভাবে থাকার অনুমতি দেবে। যখন এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে তাদেরকে অতিসত্বর সংগঠন থেকে বিচ্ছিন্ন করে পৃথক করে দিতে হবে। অতপর কোন প্রকারেই সংগঠনের সাথে তাদের কোনরূপ সম্পর্ক অবশিষ্ট থাকতে দেয়া যাবে না।

১৫

হকের দাওয়াতের পর্যায়সমূহ

প্রতিটি হকের দাওয়াতকে সাফল্যের সর্বশেষ মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছার জন্য সাধারণত তিনটি পর্যায় অতিক্রম করতে হয়ঃ

দাওয়াত
হিজরাত
জিহাদ

বর্তমান যুগে লোকেরা বেশীরভাগ কেবল ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের বিপ্লব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এ কারণে তারা মনে করে এসব বিপ্লবের ক্ষেত্রে যেসব পর্যায় এসেছে তা প্রতিটি বিপ্লবের ক্ষেত্রেই অতিক্রম করতে হবে। এসব বিপ্লব সংঘটনের জন্য যে পন্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে তাই যে কোন আন্দোলনের জন্য কার্যকর হতে পারে। এটা একটা ভুল ধারণা। শুধু এই কারণে তারা এই ভ্রান্তিতে লিপ্ত রয়েছে যে ইসলামী পদ্ধতির কোন বিপ্লবের ইতিহাস তাদের সামনে বর্তমান নেই। অন্যথায় তারা জানতে পারত আম্বিয়ায়ে কেরাম অথবা তাঁদের পন্থা অনুযায়ী আমলকারীদের নির্দেশনায় যে বিপ্লব সাধিত হয় তার বৈশিষ্ট্য সমূহ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এই ভুল ধারনা দূরীভূত করার জন্য প্রতিটি পর্যায়ের বিশেষত্ব ও দাবী সমূহের ওপর এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

প্রথম পর্যায়—দাওয়াত

প্রথম পর্যায় বা স্তর হচ্ছে দাওয়াতের স্তর। প্রথমে যে স্তরের লোকদের দাওয়াত দেয়া হয় তারা হচ্ছে ক্ষমতাসীন ও সমাজের নেতৃত্বশীল লোক। কিন্তু এই শ্রেণীর

---

১. এই 'সাধারণত' শব্দটিকে বিশেষভাবে দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে। প্রতিটি হকের দাওয়াতকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছার জন্য এই তিনটি পর্যায় অতিক্রম করা অত্যাবশ্যকীয় নয়। উদ্দেশ্য কেবল এই যে, সাধারণ ভাবে এই তিনটি পর্যায় এসে থাকে। অন্যথায় গণতন্ত্রের এই যুগে শুধু প্রথম পর্যায়েই হকের দাওয়াতকে সফলতার পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারে— এরূপ সম্ভাবনাও আছে।

লোকেরা নিজেদের অবস্থার ওপর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকে এবং নিজেদের আনন্দ ও ভোগবিলাসিতার মধ্যে মগ্ন থাকে। আহবানকারী প্রতিটি দিক থেকে সমসাময়িক চিন্তা পদ্ধতি, নৈতিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং সমাজ ব্যবস্থার ত্রুটি সমূহ চিহ্নিত করে বাতিল ব্যবস্থাকে শেষ পর্যন্ত যে পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে তা সামনে তুলে ধরে। কিন্তু প্রকাশ্যত বাতিলের গাড়ী দ্রুতবেগে চলতে থাকে, এ কারণে সমসাময়িক ব্যক্তিদের পক্ষে এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে, এই গাড়ীর দেহ জীর্ণশীর্ণ এবং তা শীঘ্রই কোন খাদে পতিত হবে। যখন প্রকাশ্য অবস্থা অনুকূল থাকে তখন অমনোযোগী লোকদেরকে কোন ব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা সম্পর্কে সতর্ক করা কোন সহজ কাজ নয়। তারা নিজেদের অমনোযোগিতা ও উন্মত্ততার কারণে শুধু নিজেদের দুর্বলতা ও দুষ্কৃতির দিকেই দৃষ্টি দেয়না তা নয়–বরং এই দর্বলতা ও দুষ্কৃতিকেই তারা সৌন্দর্য এবং পূর্ণতা বলে প্রমাণ করে এবং যেসব লোক এগুলোকে খারাপ ও দুষ্কর্ম আখ্যা দেয় এরা তাদেরকে আহাম্মক এবং নির্বোধ বলে গালিদেয়।

এই লোকেরা যে দর্শনের অনুসারী-তা কোন জিনিসের জন্য কোন নৈতিক ভিত্তি মোটেই স্বীকার করেনা। তাদের মতে গোটা দুনিয়া হয় দুর্ঘটনার ফল অথবা কেবল শক্তির মেরুদন্ডে ঘূর্ণাক খাচ্ছে। এ কারণে তাদের সামনে হকের আহবানকারীর পেশকৃত উপদেশ ও নসীহতসমূহ অর্থহীন মনে হয়। তাদের সুউচ্চ অট্টালিকার ওপরতলায় প্রথমত একজন গরীব আহবানকারীর আওয়াজ পৌছতেই পারেনা। যদিও বা পৌছতে পারে তাহলে এটাকে অসময়ের ডাক সাব্যস্ত করে শুনেও না শুনার ভান করে এবং যথারীতি নিজেদের কল্পনা বিলাসে মগ্ন হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের চিন্তার মধ্যেও কোন ত্রুটি দেখতে পায়না এবং নিজেদের জীবন ব্যবস্থার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পায় না এবং নিজেদের জীবন ব্যবস্থার মধ্যে কোন শূণ্যতা অনুভব করেনা। অনেক ডাকাডাকির পর যদিও তাদের কেউ নিজের গভীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয় এবং আহবানকারীর কোন কথা তার কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে তাহলে হয় অহংকার ও দাম্ভিকতার নেশা তাকে সত্যকে স্বীকার করে নিতে বাধা দেবে অথবা স্বার্থপূজা ও আত্মকেন্দ্রিকতার পরিনামদর্শিতা প্রভাবশীল হয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। অবশ্য সুস্থ প্রকৃতির লোকেরা এই ডাকাডাকিতে অবশ্যই প্রভাবিত হয় এবং সমসাময়িক বাতিল ব্যবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় অথবা কমপক্ষে এর সাথে কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্ক রাখেনা। এই লোকেরা দীনের দাওয়াত কবুল করে নেয়ার জন্য অগ্রসর হয়। এদের অধিকাংশই আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছল হয়ে থাকে। তারা নেতৃত্বের চিন্তায় নিমগ্ন হয়না, তাদের সামনে স্বার্থ সংরক্ষনের প্রশ্নও থাকেনা।

সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থার সহায়তার জন্য তাদের মধ্যে কোন অবস্থা গোঁড়ামীও থাকেনা। যেসব উপায়-উপকরণ ফিতনা ফাসাদে লিপ্ত করতে পারে তা থেকে তারা অনেকটা বঞ্চিত বলা যায়। এজন্য তাদের অন্তর মৃতবৎ হয়ে থাকেনা, বরং কিছুটা নিশ্বাস বাকি থাকে এবং সামান্য ধাক্কায় তার মধ্যে জীবনের স্পন্দন শুরু হয়ে যায়। এই পর্যায়ের লোকদের মধ্যে সর্বপ্রথমে যুবক বয়সী উদ্যমশীল লোকেরাই দাওয়াতেদর দিকে অগ্রসর হয়।

হযরত মুসা আলাইহিস সালামের সম্পর্কে কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে যে, তাঁর দাওয়াতের ওপর সর্ব প্রথম তাঁর জাতির একদল যুবক ঈমান আনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতেও কমবেশী একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তাঁর নবূওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব লোক ঈমান আনে তাদের অধিকাংশই ছিল যুবক। তার কারণ এই যে, যুবকদের রক্তে আছে উত্তেজনা এবং তাদের চরিত্রে রয়েছে বীরত্ব ও সাহসিকতা। তাদের সূক্ষ্ম আত্ম মর্যাদাবোধ কিছুটা স্বভাবগত ভাবেই জাগ্রত থাকে এবং এর কিছুটা খুব সহজেই জাগ্রত করা যায়। এরা বিরোধিতার দ্বারা খুব কমই প্রভাবিত হয় এবং স্বার্থকে খুব কমই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এরা যখন কোন কথার সত্যতা অনুভব করতে পারে তখন তারা হককে গ্রহণ করার কারণে সম্ভাব্য বিপদ ও জান মালের ক্ষতি হওয়ার আশংকাকে মোটেই পরোয়া করে না। তারা এসব আশংকাকে উপেক্ষা করে হককে কবুল করে নেয়। এবং বিপদের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাদের উদ্যমকে শীতল করে দেয়ার পরিবর্তে আরো অধিক গরম করে দেয়।

দাওয়াতের এই প্রাথমিক পর্যায়ে হকপন্থীদের যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় তা সমসাময়িক ক্ষমতাশীন ব্যক্তিদের দ্বারা সৃষ্ট নয়। ক্ষমতাশীন ব্যক্তিরা প্রথম দিকে দাওয়াত এবং দাওয়াত দানকারীকে মোটেই পাত্তা দেয়না। এই প্রাথমিক পর্যায়ের সমস্ত বাধা বিপত্তি দাওয়াত দানকারীর নিকটস্থ পরিবেশ থেকে মাথা উত্তোলন করে। এই পর্যায়ে পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা, ভাই-ভাই, চাচা-ভাতিজা, মামা-ভাগ্নে, স্বামী-স্ত্রী, মনিব-গোলাম ও ছাত্র-শিক্ষকের সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। পিতা পুত্রকে হক গ্রহন করা থেকে বিরত রাখার জন্য নরম গরম যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। তাকে নিজের অধিকার এবং অতীত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। নিজের আর্থিক অনটন ও বার্ধক্যের কথা উল্লেখ করে। পুত্রের নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সমূহ সামনে তুলে ধরতে থাকে। এই পথের বিপদাপদ এক এক করে গুণে গুণে তুলে ধরে। পরিবারের সমূহ ক্ষতির কথা উল্লেখ করে কাঁদতে

থাকে। আশা-ভরসা শেষ হয়ে যাওয়ার শোকগাথা গাইতে থাকে। সবশেষে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়ার এবং ধনসম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার হুমকি দেয়। এভাবে শুরু হয়ে যায় নির্যাতনের পালা।

এসব কিছু কেন করা হয়? এজন্য যে, পুত্র যদি হককে কবুল করার সংকল্প নিয়ে থাকে তাহলে তাকে যেন তা থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। আর যদি তা কবুল করে থাকে তাহলে তা থেকে যেন পশ্চাৎগামী হয়ে যায়। মা কন্যার সাথে, ভাই ভাইয়ের সাথে, চাচা ভাতিজার সাথে, মামা ভাগ্নের সাথে, স্ত্রী স্বামীর সাথে, মালিক গোলামের সাথে এবং শিক্ষক ছাত্রের সাথে ঠিক একই ধরনের দৃষ্টি ভঙ্গী পোষণ করে থাকে। যে যেদিক থেকে অন্যের ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী সে সেদিক দিয়ে হককে গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার জন্য তা ব্যবহার করে থাকে। এবং অন্যের ওপর নিজেদের বংশীয় আইনগত এবং নৈতিক অধিকার সমূহের মূল্য শুধু এই দাবী করে যে, এর বিনিময়ে হক গ্রহণকারী তাদের অবলম্বন করা বাতিলের পুজা করবে এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য সর্বাপেক্ষা বড় অধিকারীর (আল্লা) সাথে বিদ্রোহ করবে।

এই যুগের বাধা-বিপত্তি ও বিপদ-মুসীবতের কথা কুরআন মজীদের সূরা আনকাবুতে বর্ণিত হয়েছে এবং সাথে সাথে তার সমাধানের জন্য যে মৌলিক পথনির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে তাও বলে দেয়া হয়েছে। আমাদের জন্য বিস্তারিত আলোচনায় যাবার সুযোগ নেই। এজন্য শুধু প্রয়োজন পরিমাণ ইংগিত করেই শেষ করব। এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম মৌলিক কথা এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য এই বিধান নির্দিষ্ট করেছেন যে, হক পন্থীদের বিভিন্ন রকম পরীক্ষার সম্মুখীন করে যাচাই করা হবে তারা নিজেদের হকপন্থী হওয়ার দাবীতে সত্যবাদী না মিথ্যবাদী। এজন্য তারা যেন ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে বিরক্ত এবং সন্দেহ প্রবন হয়ে না পড়ে বরং হাসিমুখে এবং ধৈর্য সহকারে তার মোকাবিলা করবে। তাদের নিশ্চিত থাকা উচিৎ যে, পরীক্ষার এই পর্যায় অতিক্রম করতে পারলে তারা অবশ্যই সফলকাম হবে।

الم، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ - (عنكبوت - ٢-١)

"আলীফ-লাম-মীম। লোকেরা কি এই মনে করে নিয়েছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এতটুকু বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে আর তাদের পরীক্ষা করা হবেনা? অথচ আমরা তো এদের পূর্বেকার লোকদের পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো অবশ্যই দেখে নিতে হবে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।"

(সূরা আল কাবুতঃ ১-৩)

এরপর পিতা-মাতার পক্ষ থেকে হকপন্থীদের যে বাধা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় সে সম্পর্কে মৌলিক পথনির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই হেদায়েত সেইসব ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে যেখানে হকের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কারীরা পিতামাতার সম পর্যায়ের

وَوَصَّيْنَا الْاِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَاِن جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (عنكبوت- ٨) ـ

"আমরা লোকদেরকে তাদের পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি। কিন্তু তারা যদি আমার সাথে এমন কোন (মা'বুদকে) শরীক বানাবার জন্য তোমার উপর চাপ দেয়-যাকে তুমি (শরীক বলে) জাননা-তাহলে তুমি তাদের আনুগত্য করবেনা।"-(সূরা আনকাবুত ঃ ৮)

অর্থাৎ আল্লাহর অধিকার যেহেতু পিতা-মাতার অধিকারের তুলনায় অধিক অগ্রগণ্য, এজন্য আল্লাহর আনুগত্য করার ব্যাপারে পিতা-মাতার কোন বাধা প্রতিরোধের পরোয়া করা জায়েজ নয়। এ প্রসংগে পিতা-মাতা এবং বুজুর্গ আকাবেরদের আবেগাপ্লুত আবদারও জবাব দিয়ে দেয়া হয়েছে যা সাধারণত যুবকদের কাছে করে থাকে। "তোমরা আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে থাক। তোমরা যদি এটাকে ভ্রান্ত মনে কর তাহলে শাস্তি এবং সওয়াব আমরা মাথা পেতে নেব। শাস্তি এবং সওয়াবের কোন দায়িত্ব তোমাদের বহন করতে হবেনা।"

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبِعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطٰيٰكُمْ وَمَاهُمْ بِحٰمِلِيْنَ مِنْ خَطٰيٰهُمْ مِّنْ شَيْءٍ ط اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ه وَلَيَحْمِلُنَّ اَثْقَالَهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ (عنكبوت - ١٢-١٣) ـ

"এই কাফেররা ঈমানদার লোকদের বলে, তোমরা আমাদের রীতিনীতি মেনে চল–তোমাদের ত্রুটি বিচ্যুতির বোঝা আমরা বহন করব। অথচ তাদের ত্রুটি বিচ্যুতির কোন অংশই তারা বহন করতে প্রস্তুত হবেনা। তারা নিঃসন্দেহে মিথ্যা কথা বলে। তাবে তারা নিজেদের পাপের বোঝা অবশ্যই বহন করবে, আর নিজেদের বোঝার সাথে আরো অনেক বোঝাও। কিয়ামতের দিন তাদের এসব মিথ্যা রচনা সম্পর্কে নিশ্চিতই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে– যা এখন তারা করছে।"–(সূরা আনকাবুত ঃ ১২, ১৩)

এই মৌলিক হেদায়াত দান করার পর তিনজন দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী নবী হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম এবং হযরত লূত আলাইহিমুস সালামের দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। একজন হকপন্থী বান্দাহকে নিজের নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয় স্বজনের বাধা প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলায় কি ধরনের দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করতে হবে তা তাদের বাস্তব কর্মের নমুনা থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। হকের স্বার্থে আত্মীয় সম্পর্কের ভালবাসা ও স্বজনপ্রীতি থেকে কিভাবে মুখাপেক্ষীহীন হতে হবে তাও এখান থেকে জানা যায়। সর্বাধিক প্রিয় আত্মীয় হচ্ছে তিনজন। পুত্রের সম্পর্ক, পিতা–মাতার সম্পর্ক এবং স্ত্রীর সম্পর্ক। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম হকের স্বার্থে পুত্রের মত প্রিয় জিনিসের জন্য নিজের কলিজাকে পাথর বানিয়ে নিয়েছেন। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এই হকের খাতিরে পিতার মত স্নেহপরায়ন এবং সম্মানিত ব্যক্তিত্বের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়েছেন। হযরত লূৎ আলাইহিস সালাম এই হকের জন্যই স্ত্রীর মত প্রাণপ্রিয় ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেছেন। অবশিষ্ট সমস্ত আত্মীয়–সম্পর্ক এই তিনটি সম্পর্কের অধীনে এবং ভালবাসা ও সম্মানের দিক থেকে এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের। তাহলে হকের খাতিরে যখন এ ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার হুকুম এসেছে এবং আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা তাতে মোটেই পরিতাপ করেননি–সেক্ষেত্রে অন্যান্য আত্মীয়–সম্পর্কের কি উল্লেখ করাযায়।

এসব উদাহরণ পেশ করার পর একথাও পরিষ্কার করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যদিও রক্ত সম্পর্কিত এসব আত্মীয়–সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ হচ্ছে নিজের পরিপূর্ণ সংসারকে নিজের হাতে বিরান করে দেয়া–কিন্তু যে ব্যক্তি হকের ভালবাসায় এই বাজী খেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় এবং জীবনকে বাজি রেখে খেলে যায়–আল্লাহ তাআলা তার বিরান সংসারকে পুনরায় ভর্তি করে দেন। সে যা কিছু হারায় তিনি এ দুনিয়ায় তাকে তার কয়েকগুণ বেশী দান করেন এবং আখেরাতেও তার জন্য অফুরন্ত

নিআমতের ব্যবস্থা করা হয়। অতএব আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের হিজরতের কথা উল্লেখ পূর্বক তার কল্যাণের কথা নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেনঃ

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَبَ وَآتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا ج وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ

"আর আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকুব দান করেছি এবং তার বংশে নবুওয়াত ও কিতাব রেখে দিয়েছি। তাকে দুনিয়ায় এর প্রতিফল দান করেছি এবং আখেরাতে সে নিশ্চিতই সৎকর্মশীল লোকদের মধ্যে শামিল হবে।"

(সূরা আনকাবুত ঃ২৭)

সবচেয়ে বড় যে জিনিসটি কোন ব্যক্তিকে তার নিকটের পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ব্যাপারে কাপুরুষ বানিয়ে দেয়—তা হচ্ছে তার আর্থিক দুরাবস্থা। হকের খাতিরে ভালবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করাটাও খুবই বীরত্বপূর্ণ কাজ, কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি সাহসের সাথে এই ঘাটি অতিক্রম করতেও পারে তবে এরপর তাকে নিজের এই পরিবেশ থেকে আঁচল ঝেড়ে উঠে দাঁড়ানো কোন সহজ কাজ মনে হয় না—যার আর্থিক উপায় উপকরণের ওপর এখন পর্যন্ত সে নির্ভরশীল এবং যার আওতার বাইরের পৃথিবী তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। এই সংশয় দূর করার জন্য কুরআন মজীদ সূরা আনকাবূতেই এই শিক্ষা দিয়েছে যে, আল্লাহর ইবাদতের হক যেমন করেই হোক আদায় করতে হবে, এজন্য মানুষকে ঘরবাড়ী সবকিছু পরিত্যাগ করে হলেও। যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্দেগী তাঁর আনুগত্যের আবেগে ঘরবাড়ী শূন্য হয়ে পড়বে—আল্লাহর প্রশস্ত দুনিয়া তার জন্য সংকীর্ণ প্রমাণিত হবে না। যদি এ পথে তার মৃত্যু এসে যায় (এবং মৃত্যু সবার কাছে আসবেই) তাহলে তার জন্য খোদার বেহেশতের অফুরন্ত নিয়ামত এবং কল্যাণ রয়েছে। যদি সে জীবিত থাকে তাহলে এটা কেন চিন্তা করবে যে, সে কি খাবে? জমিনের বুকে এমন কোন্ জীব রয়েছে যা নিজের আহার নিজের সাথে বেঁধে নিয়ে বেড়ায়? কিন্তু এরপরও সে যেখানেই যায়—আল্লাহ তার ভাগের রিযিক তাকে পৌঁছিয়ে দেন। তাহলে মানুষতো এসব জীব জন্তুর তুলনায় আল্লাহর কাছে অনেক মূল্য ও মর্যাদা রাখে। তাহলে শেষ পর্যন্ত তিনি কেন তাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত রাখবেন?

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ * كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ * وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاط وَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ * وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ط اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ * وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ، فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ * اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ * (عنكبوت ٥٦-٦٢)

"হে আমার বান্দাগণ যারা ঈমন এনেছ–আমার পৃথিবী তো বিশাল বিস্তীর্ণ। অতএব তোমরা কেবল আমারই ইবাদত কর। প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে। পরে তোমরা সকলেই আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে তাদেরকে আমরা জান্নাতের সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহে স্থান দেব, যার তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। ভালকাজ সম্পাদনকারীদের জন্য এটা কতই না উত্তম প্রতিদান। সেই লোকদের জন্য–যারা ধৈর্য ধারণ করেছে এবং নিজেদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা রাখে। কত জীবজন্তু এমন আছে যারা নিজেদের রিযিক বহন করে চলেনা, আল্লাহ্‌ তাদের রিযিক দান করেন। আর তোমদের রিযিকদাতাও তিনিই। তিনি সবকিছুই শুনেন ও জানেন। তুমি যদি এদের কাছে জিজ্ঞেস কর, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কে নিয়ন্ত্রিত করে রেখেছেন–তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, আল্লাহ। তাহলে তারা কোনদিক থেকে ধোঁকা খাচ্ছে? আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন আর যার জন্য ইচ্ছা সংকীর্ণ করে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন।" (সূরা আনকাবূত ঃ ৫৬–৬২)

যে সব লোক নিজেদের চারপাশের পরিবেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে দৃঢ় এবং অবিচল প্রমাণিত হয় এবং হকের খাতিরে নিজেদের রক্ত সম্পর্কিত এবং বংশীয় আত্মীয়-সম্পর্কের কোনই পরোয়া করেনা তারা স্বাভাবিকভাবেই এমন লোকদের মধ্যে নিজেদের হৃদয়ের সম্পর্ক ও সংযোগ খুজে বেড়ায় যারা রক্ত বংশের দিক থেকে যদিও তাদের সাথে শরীক নয়-কিন্তু চিন্তা ও কর্মের দিক থেকে একই মতের অনুসারী এবং তাদের মতই হকের খাতিরে নিজেদের পরিবেশের সাথে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত রয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে মানুষের গঠন এমন যে, সে একাকি জীবন যাপন করতে পারে না। এ কারণে সে যখন নিজের পূর্বেকার সম্পর্কের বিছানা গুটিয়ে নেয় তখন নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। এটা তার একটি প্রকৃতিগত প্রয়োজন। এ ছাড়া তার জীবনের সঠিক উন্নতি সম্ভব নয়। এ কারণে হক পন্থীদের যুদ্ধ নিজেদের নিকট পরিবেশের সাথে যতই তীব্র হতে থাকে-তাদের মধ্যেকার সম্পর্কও ততই মজবুত এবং সুদৃঢ় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা সমাজের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সমাজ এবং পরিবারের মর্যদা লাভ করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে এতটা প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে, তাদের অস্তিত্ব একটি সংগঠন হিসাবে অনুভূত হতে থাকে। এবং সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থা তাদের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া শুরু করে।

হকের আহবানকারীরা যখন এই পর্যায়ে পৌছে যায়, তখন সমসাময়িক যুগের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণ যারা এ পর্যন্ত এদিকে ভ্রূক্ষেপ করেনি, অনুভব করতে থাকে যে, এ পর্যন্ত তারা যে জিনিসটিকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির প্রতারণা ও পাগলামী বলে ধারণা করে আসছিল-তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য। এখন যদি তারা এ সম্পর্কে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা না নেয় তাহলে এটা তাদের অনুসৃত ব্যবস্থার জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়-যার পতাকাবাহী তারা নিজেরাই এবং যার প্রাণবায়ুর ওপর তাদের সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও গৌরব অহংকার কায়েম রয়েছে। এই বিপদ অনুভব করেই তারা হকের দাওয়াতকে পরাভূত করার জন্য কোমর বাঁধতে থাকে এবং নির্বিচারে জুলুম-নির্যাতন শুরু করে দেয়। এই নির্যাতন যেহেতু ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এজন্য তাতে নির্যাতনের যাবতীয় পন্থাই অনুসরণ করা হয় যা মানুষকে কষ্ট দেয়ার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। দুনিয়ার অতিত ইতিহাস সাক্ষ্য যে, হকপন্থীগণকে সমসাময়িক ক্ষমাতাসীন ব্যক্তিদের হাতে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছে, তরবারীর অবিরত আঘাতে টুকরো টুকরো হতে হয়েছে, করাতের সাহায্যে দ্বিখন্ডিত করা হয়েছে, হিংস্র পশুর দ্বারা ছিন্নভিন্ন করা হয়েছে, মরুভূমির

উত্তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে, জিন্দান খানায় বন্দী করা হয়েছে, নিজেদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্ব যদিও নীতিগতভাবে চিন্তার স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে, কিন্তু দীনের যে দাওয়াত জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগকে শয়তানের অধীনতা থেকে বের করে এনে আল্লাহর আনুগত্যের অধীনে নিয়ে আসতে চাচ্ছে তার পতাকাবাহীদের জন্য আজো দুনিয়ার ইতিহাস খুব সম্ভব পরিবর্তিত হয়নি। পূর্বকালে হকপন্থীদেরকে যেসব কঠিন বিপদ–মুসীবতের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে আজও হকপন্থীদের সে সব অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ (بقره - ٢١٤)

"তোমরা কি মনে করেছ যে, অতি সহজেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে? অথচ এখন পর্যন্ত তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় (বিপদাপদ) আপতিত হয়নি। তাদের ওপর বহু কষ্ট, কঠিন বিপদ এসেছে, তাদেরকে সত্যাচারে জর্জরিত করে দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তদানীন্তন রসূল এবং তার সাথীরা আর্তনাদ করে উঠেছে–আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? তখন তাদের সান্তনা দিয়ে বলা হয়েছে আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটে।"

(সূরা বাকারাঃ ২১৪)

এই যুগটি যদিও হক পন্থীদের জন্য খুবই কঠিন হয়ে থাকে, কিন্তু তারা যদি তাতে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে পারে এবং ক্ষমতাসীনদের যাবতীয় অত্যাচার সত্ত্বেও নিজেদের দাওয়াত এবং নিজেদের মতামতের ওপর অবিচল থাকতে পারে–তাহলে তাদের নৈতিক শক্তির প্রভাব তাদের বিরোধী পক্ষের অন্তরের মধ্যেও বসে যায়। তাদের সংগঠন এবং তাদের মতবাদের জন্য সমসাময়িক চিন্তাধারা এবং ব্যবস্থায় এতটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় যে, যেসব লোক কখনো এই দাওয়াতের নামও শুনতে প্রস্তুত ছিল না তারাও সমঝোতার জন্য এমন কোন মধ্য পথ খুঁজে বের করার জন্য চেষ্টা শুরু করে দেয়–যার ওপর উভয় দল সম্মত হতে পারে এবং যে

কোনভাবে এই ঝগড়ার পরিসমাপ্তি ঘটানো যেতে পারে। কিন্তু মূলনীতির ক্ষেত্রে কোন সমঝোতার প্রশ্নই সৃষ্টি হতে পারে না। এ কারণে হকপন্থীরা যেভাবে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর অবর্ণনীয় যুলুম–অত্যাচারের মোকাবিলা করেছে, অনুরূপভাবে তাদের এই বাতিল আকাংখার মোকাবিলা করতেও বাধ্য হয় এবং তারা প্রমান করে দেয় যে, তারা যে মতবাদের প্রচারক তা থেকে ইঞ্চি পরিমানও সরে দাঁড়াতে তারা প্রস্তুত নয়। এই পর্যায়ে হকপন্থীদের দিক নির্দেশনার জন্য নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرجُونَ لِقَاءَ نَا ائتِ بِقُراٰنٍ غَيرِ هٰذَا اَو بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِى اَنْ اُبَدِّلَهُ مِن تِلقَائِ نَفسِى ج اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَايُوحٰى اِلَىَّ ج اِنِّى اَخَافُ اِنْ عَصَيتُ رَبِّى عَذَابَ يَومٍ عَظِيمٍ * (يونس–١٥) ـ

"আমাদের সুস্পষ্ট কথাগুলো যখন তাদের পড়ে শুনানো হয়–তখন যাদের মনে আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা নাই তারা বলে, এর পরিবর্তে অপর কোন কুরআন নিয়ে আস অথবা এতে কোনরূপ পরিবর্তন আনয়ন কর। (হে মুহাম্মদ) তাদের বলে দাও, আমার কি অধিকর আছে যে, আমি নিজের পক্ষ থেকে এর মধ্যে কোন পরিবর্তন আনয়ন করব? আমি তো কেবল সে কথারই অনুসরণ করি যা আল্লাহর তরফ থেকে আমার কাছে অহী করা হয়। আমি যদি আমার প্রভুর অবাধ্যাচরণ করি তাহলে আমার এক অতি ভয়ংকর দিনের সন্মুখীন হওয়ার ভয় আছে।" (সূরা ইউনুসঃ ১৫)

বাতিল পন্থীদের এই আকাংখার শিকড় কেটে দেয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে আবার নতুন করে হকের মতবাদের পরিস্কার বিবরণ দেয়া হয়েছে–যাতে সমঝোতার সম্ভাবনা সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِن كُنتُم فِى شَكٍّ مِن دِينِى فَلاَ اَعبُدُ الَّذِينَ تَعبُدُونَ مِن دُونِ اللّٰهِ وَلٰكِن اَعبُدُ اللّٰهَ الَّذِى يَتَوَفّٰكُم وَاُمِرتُ اَن اَكُونَ مِنَ المُؤمِنِينَ وَاَن اَقِم وَجهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُشرِكِينَ (يونس ١٠٥) ـ

"(হে নবী) বল, হে লোকেরা! তোমরা যদি আমার দীন সম্পর্কে তোমাদের কোনরূপ সন্দেহ থেকে থাকে তাহলে শুনে রাখ—তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর যাদের দাসত্ব কর—আমি তাদের দাসত্ব করি না। বরং আমি তো কেবল সেই আল্লাহর ইবাদত করি যিনি তোমাদের মৃত্যু দান করেন। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, যেসব লোক ঈমান এনেছে আমি তাদের মধ্যে একজন হব। (আমাকে আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে) তুমি একনিষ্ঠ হয়ে যথাযথভাবে নিজেকে এই দীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও। আর কখনকালেও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।" (সূরা ইউনুস ঃ ১০৫)

এই ধরনের সমঝোতার প্রস্তাব অনেক সময় হকপন্থীদের মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে দেয়। সেও কোন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে নরম-গরম সমঝোতা হয়ে যাওয়ার মধ্যেই কল্যাণ দেখতে পায়। তাদের এই দুর্বলতার প্রতিকারের জন্য নিম্নোক্ত উপদেশ দেয়া হয়েছেঃ

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطغَوا ط انَّهُ بِمَا تَعمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلاَ تَركَنُوا الَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللّٰهِ مِن اَولِيَاءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ * وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ الَّيلِ انَّ الحَسَنٰتَ يُذهِبنَ السَّيِّئَاتِ ذٰلِكَ ذِكرٰى لِلذّٰكِرِينَ * وَاَصبِر فَانَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيعُ اَجرَ المُحسِنِينَ * (هود - ١١٢-١١٥)

"যেভাবে তুমি নির্দেশ পেয়েছ সেভাবে সুদৃঢ় থাক এবং সেই লোকেরাও যারা তোমার সাথে তওবা করেছে। দাসত্বের সীমা লংঘন করনা। তোমরা যা কিছু করছ তিনি তার প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি রাখছেন। এই যালেমদের প্রতি একটুও ঝুকবেনা—অন্যথায় জাহান্নামের আওতায় পড়ে যাবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের জন্য কোন অভিভাবক পাবে না। অতপর তোমাদের কোনরূপ সাহায্য করা হবে না। নামায কায়েম কর দিনের দুই প্রান্তে এবং রাতের কিছু অংশে। নিশ্চিতই ন্যায় কাজসমূহ অন্যায় কাজকে দূরীভূত করে দেয়। খোদার স্মরণকারীদের জন্য এটা একটা মহাস্মারক। আর ধৈর্য ধারণ কর, আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের কর্মফল কখনো বিনষ্ট করেন না।" (সূরা হুদঃ ১১২-১১৫)

হকপন্থীরা যখন সফলতার সাথে এই পর্যায় অতিক্রম করে যায় এবং বিরুদ্ধবাদীদের ভয় ও তাদের সন্ত্রীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে দাওয়াতের কাজে কোনরূপ পরিবর্তন পরিবর্ধনে রাজী না হয়, বরং নিজেদের পূর্ণ দাওয়াতের কাজ কোনরূপ পরিবর্তনছাড়া সম্পূর্ণ নির্ভয়ে চালিয়ে যায়–তখন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তাদের পরাভূত করার জন্য এক নতুন ফন্দি আঁটে। এখন তারা যে কোনভাবে দাওয়াতের নেতাদের প্রলোভনের জালে শিকার করার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা আহবানকারীর সামনে উদার মনে এমন সব জিনিসের প্রস্তাব করে, এই পার্থিব জীবনে যা পাবার আকংখা করা হয়। সম্পদের প্রাচুর্য, নেতৃত্বের বড় বড় পদ, সমসাময়িক স্বার্থে পূর্ণ অংশীদারিত্ব ইত্যাদি। এর বিনিময়ে তারা শুধু এই দাবী করে যে, যে দাওয়াত তাদের আরাম–আয়েশ ও প্রশান্তি নষ্ট করে দিচ্ছে তাতে তারা কিছুটা পরিবর্তন আনয়ন করতে সম্মত হয়ে যায়।

হকপন্থীদের জন্য এই চাকচিক্যময় ও প্রলোভনীয় বিপদ অতীতের সমস্ত ভয়ংকর বিপদের তুলনায় অধিক মারাত্মক। অতএব 'খালকে কুরআন' মতবাদের ক্ষেত্রে সমসাময়িক বাদশার পক্ষ থেকে যখন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহ আলাইহিকে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত করা হয়, তখন তিনি এই বেত্রাঘাতকে মোটেই পরোয়া করেননি। এই বেত্রাঘাত সম্পর্কে বিভিন্ন পুস্তকে এভাবে বর্ণনা এসেছে যে, এত পরিমাণ বেত্রাঘাত যদি কোন হাতীকেও করা হত তাহলে সে বিকট শব্দে চিৎকার দিয়ে উঠতো। বেত্রাঘাতের বৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ইমামের মুখ দিয়ে উহ!! শব্দটিও বের হয়নি। কিন্তু এরপর বাদশা যখন ইমাম সাহেবের অবিচলতার কাছে পরাজয় বরণ করে নীতির পরিবর্তন করে নিলেন এবং বেত্রাঘাতের পরিবর্তে তাঁর ওপর উপঢৌকন ও সম্মানের বৃষ্টি বর্ষণ শুরু করলেন তখন তিনি চিৎকার দিয়ে উঠলেন, আল্লাহর শপথ! আমার কাছে এই পুরস্কার ও উপঢৌকন বেত্রাঘাতের চেয়েও কঠিন মনে হচ্ছে।"

হকের দাওয়াতের জন্য এই যুগটি খুবই পরীক্ষার যুগ হয়ে থাকে। অমনোপূত মৃত্যুর বিপর্যয়ের তুলনায় দুনিয়ার মহব্বত কয়েকগুণ কঠিন এবং শক্ত হয়ে থাকে। বড় বড় নেতা যারা লোহার জিঞ্জিরকে নিজেদের একটি মাত্র চাপে টুকরা টুকরা করে দেয়, সোনা এবং রূপার জিঞ্জির আগ্রহের অতিশয্যে অলংকারের মত পরিধান করে নেয় এবং কখনো তা থেকে মুক্ত হবার জন্য অন্তরে চিন্তাও করে না। বিপদের ভূত যেসব লোকদের প্রভাবিত করতে অক্ষম, তাদেরকে লালসা ও প্রলোভনের

শয়তান এতটা সহজে বিক্ষিপ্ত করে দেয় যেন মনে হয় এরা আগে থেকেই শক্তি সাহস হারিয়ে বসে থেকে ছিল।

এই যুগের পরীক্ষার জন্য হকের ইতিহাসে সর্বোত্তম অনুসরণীয় আদর্শ হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন চরিত্র। কোরাইশরা তাঁকে এবং তাঁর সাথীদের কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদে নিক্ষেপ করে যখন দেখল এরা নিজেদের দাওয়াত থেকে বিরত থাকার নয় এবং এতে কোনরূপ পরিবর্তন আনতেও সম্মত নয়–তখন তাঁর কাছে গিয়ে তারা আবেদন করল, আপনি কি চান? ধন সম্পদ? যদি আপনি তা চান তাহলে আমরা আপনার দাবীর চেয়েও অনেকগণ বেশী দিতে প্রস্তুত। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা বিয়ে করতে চান? যদি আপনি তাই চান তাহলে আমরা আপনার এই আকাংখা পূরণ করার জন্যও প্রস্তুত আছি। আপনি কি জাতির নেতৃত্ব চান? তাহলে আমরা তাও আপনার জন্য খালি করে দিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু খোদার শপথ! আপনি আপনার এই দাওয়াতের কাজ বন্ধ করুণ এবং বাপ–দাদার ধর্মকে পরিবর্তন করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই সমস্ত লোভনীয় প্রস্তাবের জবাবে একটি কথাও বললেন না, বরং কুরআন মজীদের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে দিলেন। যে উদ্দেশ্যের দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য তিনি কোরাইশদের হাতে অকথ্য নির্যাতন ভোগ করছিলেন, এই আয়াতগুলোতে প্রভাবশালী বাক্যে সেই উদ্দেশ্যেরই পুনরুক্তি ছিল। কোরাইশরা তাঁর এই জবাব শুনে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ল।

হকের আহবানকারীরা যখন এই মঞ্জিলও আল্লাহর অনুগ্রহে অতিক্রম করে যায়, তখন একদিকে হকের দাওয়াত এবং চূড়ান্ত প্রমান পেশের কাজ শেষ পর্যায়ে পৌছে যায়, এমনকি যাদের মধ্যে সামান্য পরিমণও নৈতিক অনুভূতি অবশিষ্ট থাকে–তারা হয় সত্যকে গ্রহণ করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে হকপন্থীদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়, অথবা অন্তত পক্ষে মনে মনে সত্যকে গ্রহণ করে নেয় এবং তা প্রকাশ করে দেয়ার জন্য অনুকূল মুহূর্তের অপেক্ষা করতে থাকে। অপরদিকে হক বিরোধীরা হকের দাওয়াতকে দমিয়ে দেয়ার যাবতীয় প্রচেষ্টা থেকে নিরাশ হয়ে তাকে একদম শেষ করে দেয়ার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় এবং যে কোন সম্ভাব্য পরিণতি থেকে বেপরোয়া হয়ে আহবানকারী এবং দাওয়াত সবকিছুই নির্মূল করে দিতে চায়।

এই পর্যায়ে পৌছেই হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে, হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে,

হযরত ঈসা মসীহ আলাইহিস সালামকে শূলে চড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে কোরাইশ বংশের সমস্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা 'দারুন–নদওয়া' নামক মিলন কেন্দ্রে একত্র হয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রস্তাব পেশ করে। কেউ বলল, তাঁর পায়ে বেড়ি পরিয়ে কোন অবরুদ্ধ কক্ষে বন্দী করে রাখা হোক। কেউ প্রস্তাব দিল তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হোক। পরিশেষে সবাই আবু জাহেলের এই প্রস্তাবে একমত হল যে, কোরাইশের প্রতিটি গোত্র থেকে এক এক ব্যক্তি প্রস্তুত থাকবে এবং সবাই মিলে এক সাথে তাঁর ওপর আঘাত হানবে। তাহলে হাশেম গোত্র তাঁর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারবে না।

যখন ব্যাপার এই পর্যায়ে পৌছে যায় যে, নিজের জাতির মধ্যেই হকের আহবানকারীদের জীবনের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা থাকে না, তখন দাওয়াত সম্পর্কচ্ছেদ এবং হিজরতের স্তরে প্রবেশ করে।

দ্বিতীয় পর্যায়—সম্পর্কচ্ছেদ এবং হিজরত

হকের দাওয়াতের দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে সম্পর্কচ্ছেদ এবং হিজরত। এই সময়টা তখনই আসে যখন হকের আহ্বানকারীরা নিজেদের পরিবেশকে দুধের মত ঘেটে তার মাখন বের করে নিয়ে নেয় এবং সামসাময়িক সমাজ নৈতিক বৈশিষ্টের দিক থেকে শুধু দুধের ঘোলের মত থেকে যায়। যেসব লোকের মধ্যে সমান্য পরিমাণ যোগ্যতাও থাকে তারা হকের অনুসারী হয়ে যায় এবং যাদের অন্তর সম্পূর্ণ মৃতবৎ হয়ে যায় তারা দাওয়াতের বিরোধিতায় ক্রোধ এবং ঘৃনার সর্বশেষ সীমায় পৌছে যায়। এমন কি দাওয়াতকে দাবিয়ে দেয়া অথবা তার সাথে সমঝোতা করার যাবতীয় সম্ভাবনা থেকে নিরাশ হয়ে দাওয়াত দানকারী এবং দাওয়াতকে সমূলে উৎপাটিত করে নিক্ষেপ করার জন্য কোমর বেধেঁ লেগে যায়। যখন এইসময় এসে যায় এবং হকের আহ্বানকারীরা অনুভব করে যে, এই পরিবেশে দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করা তো দূরের কথা, তাদের জন্য নিঃশ্বাস নেয়াটাই অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তখন তারা বাধ্য হয়ে নিজেদের পরিবেশের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয় এবং এই স্থান পরিত্যাগ করে এমন এক পরিবেশে স্থানান্তরিত হয়, যেখানে তারা নিজেদের মতবাদ অনুযায়ী জীবন যাপন করার আশা করতে পারে অথবা অন্ততপক্ষে ঈমানের সাথে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।

আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামের ক্ষেত্রে এই হিজরতের সময় এবং এর স্থান উভয়টি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা সরাসরি স্বপ্ন অথবা অহীর মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক সময়ে নির্দেশ দান করেন যে,

এখন দাওয়াতের কাজের হক আদায় হয়েছে এবং তোমাকে অমুক সময়ে এখান থেকে বের হয়ে অমুক স্থানে চলে যেতে হবে। আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে রিসালাতের তাবলীগ এবং চূড়ান্তভাবে প্রমাণ পেশ। একারণে জাতির মধ্যে যতক্ষণ তাদের উপস্থিত থাকা প্রয়োজন ততক্ষণে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জাতির মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন–যাতে তাবলীগের হক পূর্ণরূপে আদায় হয়ে যায় এবং চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে কোনরূপ ত্রুটি না থেকে যায়। যখন এই হক আদায় হয়ে যায় তখন তাঁরা হিজরতের অনুমতি পান। এই অনুমতি ব্যতিরেকে জাতিকে পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া তাদের জন্য জায়েয নয়। কেননা কোন কোন অবস্থায় এরূপ ঘটার সম্ভবনা রয়েছে যে, ব্যক্তিত্ব বোধের তীব্রতা অথবা হকের সাহায্যের প্রাবল্য অথবা অন্য কোন কারনে তাঁরা নিজ জাতিকে পরিত্যাগ করে চলে যেতে পারেন এবং চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন ও তাবলীগের দায়িত্ব তখনো পূর্ণ নাও হয়ে থাকতে পারে। হযরত ইউনুছ আলাইহিস সাল্লামের দ্বারা এই ধরনের ত্রুটি হয়ে গিয়েছিল। তিনি হকের সাহায্য–সহযোগিতার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে নিজ জাতিকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন । একারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং দীনের প্রচারের দায়িত্ব পূর্ণ করার জন্য তাঁকে পুনরায় তাদের কাছে ফেরত পাঠান। এবারকার দাওয়াতে তাঁর জাতির অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

নবী–রসূলগণ ব্যতীত হকের অন্যান্য আহ্বানকারীদের এই হিজরতের সময় নিজের ইজতিহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হয় এবং এই ইজতিহাদের ক্ষেত্রে মূলনীতি হিসাবে কয়েকটি কথা দৃষ্টির সামনে রাখতে হয়।

একঃ যে কোন হকের দাওয়াতের জন্য হিজরত অত্যাবশ্যকীয় শর্ত নয়, বরং প্রয়োজন এবং পরিস্থিতির আওতাধীন। হকের আহ্বানকারীদের আসল কর্তব্য হচেছ তারা দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে জনগণকে হকের ব্যবস্থার অনুসারী বানাবে। তারা যখন এর অনুসারী হয়ে যাবে তখন আহ্বানকারীরা তাদের সম্মিলিত শক্তির সাহায্যে হকের এই ব্যবস্থাকে বাস্তব ক্ষেত্রে কার্যকর করবে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কোন এলাকার লোকদের কাছে কোনরূপ বাধা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই গোটা দীনের দাওয়াত পেশ করতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেখান থেকে হিজরত করা তাদের জন্য জায়েয নয়, যদিও একাজে তাদের গোটা জীবনটাই নিঃশেষ হয়ে যায়, যদিও তাদের দাওয়াত কেউ কবুল নাও করে এবং নিজেদের মতবাদ অনুযায়ী কোন জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার সুযোগ না পেয়েও থাকে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম হকের দাওয়াতের কাজে গোটা জিন্দেগী শেষ করে দিলেন। কিন্তু যেহেতু

তার কাজে তৎকালীন বাদশার নিরপেক্ষতার কারনে তার সামনে এমন কোন কার্যকর প্রতিবন্ধকতা আসেনি যা তাঁর দাওয়াতকে একেবারে অকেজো করে দিতে পারে–তাই তিনি জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত নিজের দাওয়াতের কাজে মশগুল থাকেন। যদিও মিসরে তিনি এত পরিমান লোক সংগ্রহ করতে পারেননি যাদের সহযোগিতায় তিনি সেখানে সঠিক ইসলামী নীতির ভিত্তিতে কোন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করে তা পরিচালনা করতে পারতেন।

দুইঃ সাধারণ পর্যায়ের প্রতিবন্ধকতা ও বিরোধিতা কোন পরিবেশ থেকে হিজরত করার জন্য যথেষ্ট কারণ হতে পারেনা। এমন এক দাওয়াত যা প্রতিটি দিক থেকে সমসাময়িক চিন্তা ও বিশ্বাস এবং যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক মূলনীতি থেকে স্বতন্ত্র–তার প্রতি সাধারণ লোকদের অসন্তুষ্ট এবং অপরিচিত থাকাটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। এই অসন্তোষ ও অপরিচিতির কারণে সন্ত্রিস্ত হয়ে নিজের পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাবার ব্যাপারে হকের আহ্বানকারীর জন্য যথেষ্ট কারণ হতে পারেনা। এই ধরণের বিরোধিতার দাবীর মুখে নবী–রসূলগণ কোনরূপ সংশয় এবং হতাশার শিকার না হয়ে সবসময় নিজেদের কাজ অব্যাহত রেখেছেন। এই ধরণের বিরোধিতার মুখে ধৈর্য ধারণ করা অবিচল থাকা বিরুদ্ধবাদীদের ওপর চূড়ান্ত প্রমান সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন এবং হকের আহ্বানকারীদের সংকল্প পরীক্ষা করার জন্যও আবশ্যক। এই জিনিসটি যাচাই করা ব্যতীত আল্লাহ তাআলার কাছে হকপন্থীরাও তাদের সত্য প্রীতির প্রতিদান পেতে পারেনা, আর বাতিলপন্থীদের ওপর তাদের বাতিল প্রীতির কোন শাস্তি আসতে পারেনা এটা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হকপন্থীদের জন্য নির্দিষ্ট করা একটি প্রশিক্ষণ কোর্স। এই কোর্স তাদেরকে যে কোন ভাবেই অতিক্রম করতে হবে এবং তা অতিক্রম করার পরই তারা সাফল্যের সনদ লাভ করতে পারে।

অবশ্য জাতির বিরোধিতা যখন বৃদ্ধি পেতে পেতে এই সীমা অতিক্রম করে যে, তারা নিজেদের মধ্যে হকপন্থীদের অস্তিত্বকে মোটেই সহ্য করতে প্রস্তুত নয় এবং সম্মিলিতভাবে তাদের মূলোচ্ছেদ করার জন্য সিদ্ধান্ত করে নেয়–এসময় তাদের প্রত্যাখ্যান করার সিদ্ধান্ত করে তাদের থেকে পৃথক হওয়ার ঘোষণা দেয়া এবং সেখান থেকে হিজরত করা হকপন্থীদের জন্য জায়েয হয়ে যায়। কুরআন মজীদে যতজন নবীর হিজরতের কথা উল্লেখ আছে তাদের প্রত্যেকের ঘটনা থেকে এই সত্য প্রতিভাত হয় যে, জাতির লোকেরা যখন তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা, অথবা দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়ার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে–তখন তাঁরা সম্পর্কচ্ছেদ ও

হিজরত করার ঘোষনা দিয়েছেন। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে কোন নবীই হিজরত করেননি।

তিনঃ হযরত আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং হকের আহ্বানকারীদের হিজরাত এবং এক জাতির বাড়াবাড়ি ও নির্যাতনের ভয়ে অন্য জাতির লোকদের পলায়ণ–এদুটি জিনিস সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। এই পলায়ণ একজাতি থেকে অন্য জাতির দিকে হয়ে থাকে। আর হকের আহ্বানকারীদের হিজরত বাতিল থেকে হকের দিকে হয়ে থাকে। এজন্য হিজরতের পূর্বে হকের আহ্বানকারীদের দুটি জিনিসের মূল্যায়ন করা প্রয়োজন হয়। এক, যে লোকদের মধ্য থেকে তারা হিজরত করতে যাচ্ছে, সত্যকে গ্রহণ করার দিক থেকে তাদের অবস্থা কি? দুই, যেলোকদের কাছে তারা হিজরত করতে যাচ্ছে সত্যপ্রীতির দিক থেকে তাদের অবস্থা কোন পর্যায়ে রয়েছে?

এই মূল্যায়নের জন্য তাদেরকে নিজেদের পরিবেশের যোগ্যতার সঠিক অনুমান করতে হবে যে, হকের বীজ বপন করার জন্য এই যমীনের মধ্যে কোন যোগ্যতা অবশিষ্ট আছে কি না? যদি তারা এর মধ্যে কোন যোগ্যতা দেখতে পায় তাহলে তারা নিজেদের কল্যাণ প্রচেষ্টার সর্বাধিক হকদার এই পরিবেশকেই মনে করে এবং নিজেদের সর্বশক্তি তার সংশোধন ও প্রশিক্ষণের জন্য ব্যয় করে থাকে। হাঁ, যদি পূর্ণরূপে পরীক্ষা–নিরীক্ষা করার পর তার মধ্যে এই যোগ্যতা না পাওয়া যায় তাহলে তারা বাইরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। যে যমীনকে একাজের জন্য উপযুক্ত মনে হয় তারা সেখানে গিয়ে তাবু ফেলে এবং নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে থাকে।

নবী–রসূলগণ ব্যতীত হকের সাধারণ আহ্বানকারীদের যেভাবে নিজেদের ইজতেহাদের মাধ্যমে হিজরতের সময় নির্ধারণ করতে হয়, অনুরূপ ভাবে হিজরতের স্থান ও তাদেরকে ইজতেহাদের মাধ্যমে নির্ধারণ করতে হয়। এই ইজতেহাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে মূলনীতি হিসাবে যে জিনিসগুলো সামনে রাখতে হয় তা হচ্ছে এই যে, হিজরতের স্থান, দাওয়াত এবং দাওয়াতের উদ্দেশ্যের দিক থেকে অনুকুল হতে হবে। অন্য দিক থেকে তার কোন গুরুত্ব থাক বা না থাক। এই দারুল হিজরত একটি প্রস্তরময় জলশূণ্য মরুভূমিও হতে পারে। যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হেজাজের মরুভূমিতে হিজরত করেছিলেন। দারুল হিজরত দুধ এবং মধুতে সমৃদ্ধ উর্বর জমিও হতে পারে। যেমন, হযরত মূসা আলাইহি সসালাম নিজের জাতিকে সিরিয়ায় নিয়ে আসেন। দারুল হিজরত অন্বেষণ করার জন্য কখনো নিজের দেশ থেকে বাইরে যাবার প্রয়োজনও হতে পারে। যেমন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বের হতে হয়েছিল। আবার কখনো এরূপও হয়ে থাকে যে, যে দেশে হকের দাওয়াত আত্মপ্রকাশ করেছে, আল্লাহ

তাআলা সেই দেশের কোন অংশকে হকের দাওয়াতের জন্য অনুগ্রহশীল এবং অনুকূল বানিয়ে দেন। যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে হয়েছিল।

কোন দাওয়াত সম্পর্কে প্রথম পদক্ষেপেই এই ফয়াসালা করা অত্যন্ত কষ্টকর যে, যে যমীনে এর বীজ বপন করা হচ্ছে-সেই মিনেই তার ফসল উৎপাদিত হবে, অথবা বীজ তো কোন যমিনে বপন করা হচ্ছে, কিন্তু ফসল অন্য কোন যমীনে কাটা হবে? সেই জমীনটা কি রকম যমীন হবে? দেশের ভেতরে হবে না দেশের বাইরে? কোন লবনাক্ত ও অনুর্বর ভূমি হবে অথবা কোন জলবহুল ও উর্বর জমী? যেসব লোক হকের বীজ বপন করার জন্য অগ্রসর হয়, এ ব্যাপারে তাদের নিজেদের অনুমান ও পরিমাপ বিবেচ্য বিষয় নয়। বরং সেই মহান সত্তাই কেবল তাদের পথ প্রদর্শন করেন যার সন্তুষ্টি অর্জনের আকাংখায় তারা নিজেদের ঝোলায় সামান্য পরিমান রসদ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। অবশ্য এতটুকু কথা চূড়ান্ত ভাবেই বলা যায় হকের বীজ বপনকারীরা যদি নিজেদের চোখের পানি এবং শরীরের রক্ত দিয়ে তাতে পানি সিঞ্চন করার জন্য তৈরী থাকে তাহলে তা বেকার যেতে পারেনা। যমিনের একটি অংশ যদি তার প্রতিপালন করতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে অন্য কোন অংশ তার লালন পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যদি পূর্বাঞ্চলে তার চাষাবাদ সবুজ-শ্যামল না হয়ে ওঠে তাহলে পশ্চিমাঞ্চলে তার ফসল প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। অতপর এমন একদিন এসে যায় যে, সঞ্চয়কারী তা দিয়ে নিজের গোলা পরিপূর্ণ করে নেয় এবং গোটা দুনিয়া তার দ্বারা পরিতৃপ্ত হয়ে যায়।

এই হিজরাতের উদ্দেশ্য কেবল বিরুদ্ধবাদীদের নির্যাতন থেকে পালায়ণ নয়, বরং এর দ্বারা হকের দাওয়াতের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এর কতিপয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব।

এর প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে-হকপন্থীদের আকীদা-বিশ্বাসগত এবং মানসিক দাবীসমূহ বাস্তবে পূর্ণকরা। তারা যেদিন থেকে হকের স্বাদের সাথে পরিচিত হয় সেদিন থেকেই সংকল্প এবং নিয়াতের দিক থেকে মুহাজির হয়ে যায়। তারা নিজেদের সমসাময়িক আকীদা-বিশ্বাস ও কার্যকলাপের উপর অসন্তুষ্ট থাকে এবং যে কোন ভাবেই তা থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। তারা নিজেদের যুগের সমাজ থেকে পালিয়ে থাকে এবং নিজেদের আত্মবিশ্বাস ও পরিতৃপ্তির জন্য কোন সুস্থ সমাজ খুজে বেড়ায়। তারা নিজেদের সমসাময়িক যুগের সমাজ ব্যবস্থাকে বাতিলের একটি শাঁখের করাত মনে করে এবং তা থেকে যে কোনভাবে মুক্তি পাবার আকাংখা করে। তাদের বাতেনী শক্তির ঘ্রাণ জাগ্রত হয়ে যায় এবং চারপাশের পরিবেশ থেকে তারা দুর্গন্ধ

অনুভব করে। এজন্য প্রতিটি মুহূর্তে তারা এমন পরিবেশ অন্বেষণ করে যার মধ্যে তারা স্বাধীনভাবে নিশ্বাস নিতে পারবে এবং এই দুর্গন্ধ থেকে আশ্রয় পাবে। তারা এই পরিবেশে যতটুকু সময়ই অতিবাহিত করে তা কেবল দীন প্রচারের দায়িত্ব পালনের জন্যই অতিবাহিত করে। এই দায়িত্ব পালন হয়ে যাবার পর এই পরিবেশ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া এবং যে জিনিসকে তারা আন্তরীক ভাবে পরিত্যাগ করেছে তা প্রকাশ্য ভাবেও পরিত্যাগ করা তাদের একটি প্রকৃতিগত প্রয়োজনে পরিণত হয়। এ হচ্ছে হিজরতের আসল রহস্য এবং এই রহস্যের দৃষ্টিতে বাস্তব হিজরত হচ্ছে কেবল সেই লোকদের হিজরত যাদের দেহ-মন উভয়ই মুহাজির। যাদের দেহ হিজরত করে গেছে কিন্তু মন হিজরতের স্থানে আটকে রয়েছে-তাদের হিজরত আসল হিজরত নয়।

এর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যেসব লোকের হৃদয়ে জীবনের কোন স্পন্দন অবশিষ্ট আছে তাকে কর্মতৎপর করার জন্য সর্বশেষ চেষ্টা করতে হবে। যখন সমাজের সর্বোত্তম ব্যক্তিগণ-যাদের সর্বোত্তম হওয়াটা তাদের শত্রুরাও স্বীকার করে-যাদের কল্যাণকামিতা ও সহানুভূতির ওপর বিরুদ্ধবাদীদেরও আস্থা রয়েছে, যাদের সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য তাদের দুশমনরাও দিয়ে থাকে, যাদের সত্যপ্রীতি এবং খোদাভীতির ওপর তাদের বিদ্রুপ কারীরাও মনে মনে হিংসা পোষণ করে-নিজেদের সমাজকে, এর সাথের দীর্ঘকালীন সম্পর্ককে, এর মধ্যেকার নিজেদের যাবতীয় অধিকারকে, নিজেদের ঘরবাড়ী, সহায়-সম্পদ, এমনকি নিজের প্রিয়তম বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের পরিত্যাগ করে এবং এমনভাবে পরিত্যাগ করে যে, তাদের অন্তরে ক্ষোভের পরিবর্তে সহানুভূতি এবং ঘৃণার পরিবর্তে মমতা ও সমবেদনা বিরাজিত থাকে। তাদের মধ্যে আল্লাহর বন্দেগীর ভাবধারা ব্যতীত অন্যকোন প্রকারের ব্যক্তিগত ক্রোধ, অসন্তোষ, ঈর্ষা ও দুঃখ-বেদনার সামান্যতম মলিনতাও থাকেনা। যে ব্যক্তির মধ্যে সামান্য অনুভূতিও বর্তমান রয়েছে সে এই দৃশ্য অবলোকন করে প্রভাবিত না হয়ে পারেনা। এই দৃশ্য দেখে পাষাণ হৃদয়, হতভগ্য ও নির্মম শত্রু ছাড়া এমন সব লোকের মধ্যেই গতির সৃষ্টি হবে যাদের অন্তরের কোন স্থানে সত্যের প্রতি মর্যাদাবোধ বর্তমান রয়েছে। এদের মধ্যেকার উত্তম ব্যক্তিরা এই দৃশ্য দেখে এতটা প্রভাবিত হয়ে পড়ে যে, শেষ পর্যন্ত নিজের ভ্রান্ত জীবন পদ্ধতির ওপর ধৈর্য ধারণ করতে পারেনা এবং আল্লাহর নাম নিয়ে সত্য পথের প্রাণ উৎসর্গকারী সৈনিকদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। এটা হকের আহ্বানকারীদের পক্ষ থেকে নিজেদের জাতির প্রতি যেন শেষবারের মত ঝাঁকুনি দেয়া হচ্ছে-যার পর

মৃতের মত নিদ্রামগ্ন ব্যক্তিরা ছাড়া আর সব লোক নিজেদের বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যায়।[১]

এই হিজরতের তৃতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে হকপন্থীদের আত্মশুদ্ধ করণ। হকের আহ্বানকারীদের জন্য যতক্ষণ হিজরতের পর্যায় না আসে ততক্ষণ তাদের মধ্যেকার মোখলেস (একনিষ্ঠ) ও অ–মোখলেস লোকদের মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হয়না। অনেক লোক নিফাকের কদর্যতা নিয়ে হকের আহ্বানকারীদের কাতারে শামিল হয়ে যায় এবং নিজেদের কপটতাকে লুকাতে পূর্ণরূপে কামিয়াব হয়ে যায়। বহু লোক নিজেদের অন্তরের গোপন প্রকোষ্ঠে আল্লাহ ছাড়া নিজেদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন অথবা নিজেদের ধনসম্পদের প্রতি কিছুটা যোগসূত্র রাখে। এই জিনিসগুলো এতটা গোপন থাকে যে, অন্তরের এ চোরের খবর তার নিজের কাছেও থাকেনা। এই লোকদের ক্ষেত্রে হিজরত একটি কষ্টি পাথরের কাজ দেয়। এরপর ভাল এবং মন্দের মধ্যে পূর্ণরূপে পার্থক্য সূচিত হয়। আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা একদিকে হয়ে যায়, আর যেসব লোক হকের বিরোধী অথবা অন্তরে কোন চোর লুকিয়ে রাখে তারা একদিকে হয়ে যায়। কিয়ামতের প্রসিদ্ধ পুলসিরাতের মত হিজরতের রাস্তাও চুলের চেয়ে অধিক সূক্ষ্ম এবং তরবারীর চেয়ে অধিক ধারালো। যারা শতকরা একশ ভাগই মুমিন এবং মোখলেস কেবল তারাই যারা এ পথ অতিক্রম করতে পারে। যদি নিফাক এবং দুনিয়ার মলিনতার সমান্য পরিমানও অন্তরের মধ্যে গোপন থাকে তাহলে অন্যান্য পরীক্ষায় হয়ত সফলকাম হওয়া সম্ভব, কিন্তু হিজরতের পরিক্ষায় অবশ্যই ধরা পড়ে যায়।

১· হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে যেসব জিনিস ইসলাম গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তার মধ্যে তার বোন এবং ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণকে যদিও সাধারণ ভাবে অন্যসব কিছুর ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে–কিন্তু ইতিহাস পাঠে জানা যায়, আবিসিনিয়ায় মুসলামানদের হিজরতই তাঁকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে। তিনি যখন দেখলেন, অনেক ভালো ভালো লোক ইসলামের প্রেমে যে কোন প্রকারের দুঃখ ও বিপদ–মুসীবত বরদাশত করছে, এমন কি ইসলামের জন্য তারা নিজেদের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করতেও প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং তাদের মধ্যে এমন কতক লোকও ছিল যারা স্বয়ং তাঁর অত্যাচারের শিকার হয়েছিল–তখন তাঁর মনের অবস্থা পরিবর্তিত হতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের বোনের সত্যের ওপর অবিচলতা সর্বশেষ পর্দাও সরিয়ে দিল। সীরাতে ইবনে হিশামে এই ধরনের কতগুলি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যা এই কথার সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত উমরের (র) মানসিক অবস্থার পরিবর্তনে হাবশায় (ইথিওপিয়া) হিজরতের ঘটনারই অধিক দখল ছিল।

এই হিজরতের চতুর্থ উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, একটি স্বাধীন এবং পবিত্র পরিবেশে হকপন্থীদের প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে তারা বাতিলের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া, একটি সৎকর্মশীল সভ্যতা–সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করা এবং দুনিয়ার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব পদের দায়িত্ব শামলাবার জন্য তৈরী হতে পারবে। কুফরী পরিবেশ যেখানে কুফর ক্ষমতাসীন রয়েছে তা এই উদ্দেশের জন্য উপযুক্ত এবং অনুকুল হতে পারে না। হকের দাওয়াতের বৈশিষ্ট হচ্ছে যেন এমন একটি বীজ যা অংকুরিত হবার তা যেকোন যমিনেই অংকুরিত হতে পারে। কিন্তু তার প্রতিপালন ও পরিবর্ধন তখনই হয় যখন তাকে এখান থেকে তুলে নিয়ে এমন যমিনে রোপন করা হয় যেখানে অন্য কোন বৃক্ষের ছায়া নেই। এসময় তার স্বভাবের যাবতীয় দাবী পূর্ণ হয়। এই অবস্থায় তা নিজের স্বাভাবিক গতিতে বড় হতে থাকে এবং পত্রপল্লবে সুশোভিত হয় এমনি করে একদিন তার শিকড় পাতাল পর্যন্ত চলে যায় এবং তার শাখা–প্রশাখা শূণ্যলোকে ছড়িয়ে যায়। যতক্ষণ এই শর্ত পূর্ণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত হকের দাওয়াতের শক্তি মৃতবৎ এবং এর আসল যোগ্যতা পরাভূত অবস্থায় থেকে যায়। এর ভেদ আপনজনদের মধ্যেও সুপরিচিত থাকেনা এবং এর অলৌকিকত্ব অপরের সামনেও প্রতীয়মান হয়না।

কিন্তু বিচ্ছিন্ন মুলনীতি নিজ স্থানে যতই আর্কষণীয় এবং ভারসাম্যপূর্ণ হোক তার আসল সৌন্দর্যের খোঁজ পাওয়া কখনো সম্ভব নয় যতক্ষণ তা একটি জীবন ব্যবস্থার কাঠামোতে দেখা না যাবে এবং যাচাই করা না হবে। একটি কুফরী জীবন ব্যবস্থার অধীনে তৌহীদ,আল্লাহর আনুগত্য, মানব জাতির অখন্ডতা এবং আখেরাত ভীতির ওয়াজ করা যেতে পারে এবং এই ওয়াজ অনেক সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী লোকদের প্রভাবিতও করতে পারে, কিন্তু যখন এসব মূলনীতির ভিত্তিতে কোন স্বাধীন পরিবেশে একটি সামগ্রিক কাঠামো অস্তিত্ব লাভ করে, তার যাবতীয় বিভাগ স্তরে স্তরে মকুরিত হয়ে ওঠে এবং নিজের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালন করতে থাকে , তখন আমরাও এর যোগ্যতা এবং কল্যাণকারিতা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে যাই এবং অন্যরাও এর শক্তি ও কর্মকুশলতা দেখে হতভম্ব হয়ে যায়।

যে হিজরত এসব উদ্দেশ্য ও শর্তাবলীর অধীনে সংঘটিত হয় তা থেকে কয়েকটি অপরিহার্য ফলাফল সৃষ্টি হয়।

এর প্রথম ফল এই পাওয়া যায় যে, হিজরতের পর হকের দাওয়াত পূর্ণ শক্তিতে ছড়িয়ে পড়তে এবং বিস্তারিত হতে থাকে। এর কারণ এই যে, হকের কলেমার মধ্যে পরিবৃদ্ধি এবং পরিব্যাপ্ত হওয়ার, বিজয়ী হওয়ার ও ছেয়ে যাওয়ার অসাধারণ

যোগ্যতা ও শক্তি বর্তমান থাকে। মানব প্রকৃতি এবং এই বিশ্বের মেজাজের সাথে তার স্বাভাবিক পরিচিতি থাকে। এই দুটি জিনিসই তাকে লালন-পালন এবং উন্নতি বিধান করতে চায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এর ওপর বাতিলের পর্দা পড়ে থাকে ততক্ষণ তার অবস্থা সেই চারাগাছের মতই ম্লান এবং বিশুষ্ক হয়ে থাকে যার ওপর কোন পরগাছা ছেয়ে আছে এবং তা এর রস চুষে খাচ্ছে। যখন তা পর গাছা মুক্ত হয়ে যায় এবং উর্বর যমীন ও স্বাধীন পরিবেশ পেয়ে যায় তখন তার সমস্ত চাপাপড়া শক্তি মুহুর্তের মধ্যে উত্থিত হয়ে আসে এবং ক্রমাগতভাবে তা একটি সম্ভাবনাময় ও উন্নতিশীল বৃক্ষের মত নিজের চার পাশের জমিন এবং নিজের ও পরের শূণ্যস্থানের শক্তিকে নিজের খাদ্যে পরিণত করা শুরু করে দেয়। দেখতে দেখতে তা এমন এক প্রকান্ড বৃক্ষে পরিণত হয়ে যায় যে, তার ছায়াতলে পরিব্রাজকদের কাফেলা আশ্রয় নেয় এবং লোকেরা তার ফল খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়।

দ্বিতীয় ফল এই হয় যে, বাতিল দ্রুত অথবা পর্যায়ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এর কারণ এই যে, বাতিলের কোন মূল এবং ভিত্তি নেই। মানব প্রকৃতির সাথেও এর কোন সংযোগ নেই এবং বিশ্বব্যবস্থার সাথেও এর কোন মেজাজগত সামঞ্জস্য নেই। আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়াকে একটি সৎ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর গোটা সৃষ্টি ব্যবস্থায় সত্যের প্রাণশক্তি কার্যকর রয়েছে। একারনে যে বাতিলের মধ্যে থেকে হকের সমস্ত অংশগুলো বের করে পৃথক করে নেয়া হয়েছে সেই বাতিলের লালন-পালন করা বিশ্বব্যবস্থার মেজাজের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তার মধ্যে যদি কোন বাতিল পাওয়া যায় তাহলে তা এই অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে যে, তার মধ্যে হকেরও কিছু মিশ্রণ রয়েছে। কেননা এই বাতিল চারাগাছ অথবা কচি আগাছার মত এই হকের আশ্রয়ে জীবিত থাকে। হকের আশ্রয় যখন তার ওপর থেকে সম্পূর্ণ সরে যায়-যেমনটা হকপন্থীদের হিজরতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে-তখন বাতিলের জন্য জীবিত থাকাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। যে দেহ থেকে প্রানবায়ু চলে গেছে তার মরে যাওয়াটা যেমন অত্যাবশ্যক, অনুরূপভাবে যে বাতিলের মধ্য থেকে হকপন্থীরা সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিয়ে বিদায় নিয়েছে তারও বিলীন হয়ে যাওয়াটা নিশ্চিত। এ কারনেই আমরা নবী-রসূলদের জীবন-চরিতে পাঠ করে থাকি যে, তাঁদের হিজরতের পর আল্লাহ তাআলা তাঁর জাতিকে অবকাশ দেননি, বরং তাদের সাথে দুই ধরনের ব্যবহার করা হয়েছে।

হিজরতকারী ঈমানদার সম্প্রদায়ের সংখ্যা যদি অতি নগণ্য এবং বাতিল পন্থীদের সংখ্যা যদি অধিক থেকে থাকে, তাহলে আল্লাহ তাআলা কোন যমিনী অথবা আসমানী আযাব পাঠিয়ে বাতিল পন্থীদের ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং হক

পন্থীদের হাতে পৃথিবীর উত্তরাধিকার অর্পণ করেছেন। হিজরতকারী ঈমানদার সম্প্রদায়ের সংখ্যা যদি উল্লেখযোগ্য পরিমান হয়ে থাকে, তাহলে এই অবস্থায় ঈমানদার সম্প্রদায়কে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে হকের সামনে মাথা নত করে দিতে বাধ্য করবে।

এই দুই অবস্থায় হকের বিজয় এবং বাতিলের পরাজয় একেবারেই নিশ্চিত। আল্লাহর শাস্তি যেভাবে অবর্ণনীয় এবং তার মোকাবিলা করা যেতে পারেনা, অনুরূপভাবে হকপন্থী ও বাতিলপন্থীদের সংঘাতও অপরিহার্যরূপে হকের বিজয়ের মাধ্যমেই সমাপ্ত হয়। এই সংঘাত শুরু হয়ে যাবার পর বাতিলের পক্ষে অনেক দিন টিকে থাকাটা মোটেই সম্ভব নয়। আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাদের নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত জামাআত সমূহ নিজ নিজ যুগের বাতিলপন্থীদের জন্য খোদায়ী আদালত হিসাবে কাজ করে। এবং তা হক ও বাতিলের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে। বাতিল যতই শক্তিশালী হোক তাকে এই আদালতের ফয়সালার সামনে মাথা নত করতেই হয়।

নবী-রসূলদের হিজরতের পর এই দ্বিবিধ ফলাফল অপরিহার্যরূপে প্রকাশ পায়। বুদ্ধি-বিবেক এবং ঐশী জ্ঞানও একথার সাক্ষ্য দেয় যে, নবীদের এই পন্থায় সালেহীনদের কোন দল যখন আন্দোলন পরিচালনা করে তখনও এই একই ফলাফল প্রকাশ পায়। অবশ্য আম্বিয়ায়ে কেরাম নিজেদের পরিবেশে চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব যতটা পূর্নাংগভাবে আদায করতে পারেন, অন্যদের পক্ষে তদ্রুপ সম্ভব নয়। একারণে নবীদের নিজ জাতির মধ্য থেকে হিজরত করার পর তাদের ওপর আযাব আসা যেমন অপরিহার্য অন্যান্য হকপন্থী মুমিনদের হিজরত করার পর তাদের জাতির ওপর এ ধরনের আযাব আসা তেমনি অপরীহার্য নয়। তা সত্ত্বেও হক এবং বাতিলের সংঘাতে হকপন্থীরা যদি হকের মস্তক উত্তোলন করার জন্য প্রয়োজনীয় দাবী পূরণ করতে পারে, তাহলে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদের সাহায্য করবেন এবং তাদের সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবেই।

এই হিজরতের পর হকের দাওয়াত তৃতীয় পর্যায় অর্থাৎ জিহাদ এবং যুদ্ধের পর্যায়েপ্রবেশকরে।

তৃতীয় পর্যায়—জিহাদ

হকের দাওয়াতের ক্ষেত্রে যুদ্ধের ডংকো তখনই বেজে উঠে যখন তাবলীগ ও শাহাদাত আলান-নাস এবং হিজরতের পর্যায় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এর কারণ এই যে, ইসলামী যুদ্ধের জন্য কতিপয় জরুরী শর্ত রয়েছে।এই শর্ত যতক্ষণ পূর্ণ না হয়,

হকপন্থীদের জন্য তরবারী ধারণ করা এবং যমিনের বুকে রক্তপাত করা জায়েব নয়। তারা যদি তাড়াহুড়া করে এইরূপ করে বসে তাহলে তাদের এই কাজ একটা বিপর্যয়মূলক কাজ হিসাবে গণ্য হবে। এর জন্য আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা করা তো দূরের কথা উল্টো জবাবদিহি এবং যমিনের বুকে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। এই শর্তগুলো নিম্নরূপঃ

১· প্রথম শর্ত হচ্ছে এই যে, যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হবে, প্রথমে তাদের সামনে পূর্ণরূপে হকের প্রচার করতে হবে। হকের এই প্রচারের পূর্বে কোন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া জায়েয নয়। কিন্তু কেবল প্রতিরোধ মূলক যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ এই মুলনীতির উর্ধে। প্রতিরোধ মূলক যুদ্ধ যে কোন অবস্থায় করা যায়। এ যুদ্ধ ব্যক্তিও করতে পারে এবং ব্যক্তিদের জামাআতও করতে পারে। এ যুদ্ধ তাবলীগের শর্তের সাথে আবদ্ধ নয়। যখনই কারো জান-মাল ও ইজ্জতের ওপর কোন আক্রমন আসবে সে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে নিজের হেফাজতের জন্য প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এই রাস্তায় সে যদি নিহত হয় তাহলে সে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি আক্রমনকারী দুশমন নিহত হয় তাহলে তার দ্বিগুন গুনাহ হবে। এটি এজন্য যে, সে তার জীবনকে একটি অপরাধমূলক কাজ এবং অন্যের অধিকার আত্নসাৎ করার পথে রক্তাপ্লুত করেছে। দ্বিতীয়ত, সে একজন সত্যপন্থী লোকের তরবারী রক্তে রঞ্জিত করিয়েছে। এখন থাকল আক্রমণাত্মক যুদ্ধ। এসম্পর্কে কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাবলীগের উপরোক্ত শর্ত পূরণ না হবে ততক্ষণ এই যুদ্ধ শুরু করা জায়েব নয়। কিন্তু এই তাবলীগের দুটি পথ আছে এই দুই অবস্থায় যুদ্ধের নীতিমালার ধরনও কিছুটা পার্থক্য হয়ে থাকে।

(ক)· একটি পন্থা হচ্ছে এই যে, এই তাবলীগ নবীর মাধ্যমে হবে। নবী তাবলীগ এবং প্রমান চূড়ান্তভাবে পেশ করার জন্য কামেল এবং পূর্ণাংগ মাধ্যম। তাঁর মাধ্যমে প্রমান চূড়ান্তভাবে পেশ করার যাবতীয় শর্ত পূর্ণরূপে পালিত হয়। কার্যকারণের এই জগতে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্বস্ত করার জন্য যা কিছু করা সম্ভব তা একজন নবীই সর্বোত্তম পন্থায় পুরা করে দেন। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁকে যাবতীয় উপায়-উপকরণের দ্বারা সুসজ্জিত করে পাঠান। তিনি জাতির মধ্যেকার সর্বোত্তম ব্যক্তি হয়ে থাকেন, সর্বোচ্চ আভিজাত্য নিয়ে আবির্ভূত হন, তিনি নবুওয়াত লাভের পূর্বেও এবং নবুওয়াত লাভের পরেও পবিত্রতম চরিত্র-নৈতিকতার প্রাকাশ ঘটান, মিথ্যা কথন, অপবাদ, ষড়যন্ত্র, খারাপ আচরণ, অহংকার ভাব এবং মাতব্বরীর খাহেশ ইত্যাদি মলিনতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর এই সৌন্দর্যের সাক্ষী যেভাবে তাঁর বন্ধু মহল দেয় অনুরূপ ভাবে তাঁর দুশমনরাও তাঁর উন্নত বৈশিষ্ট ও

গুণাবলী অস্বীকার করতে পারেনা। তিনি সবচেয়ে মার্জিত ভাষায় এবং সর্বসাধারণের বোধগম্য করে নিজের দাওয়াত পেশ করে থাকেন। এই দাওয়াতকে জাতির শিশুদের পর্যন্তও পৌঁছে দেয়া নিজের রাত–দিনকে এক করে দেন। তার শিক্ষা জ্ঞান ও যুক্তির দিক থেকে এতটা মজবুত এবং শক্তিশালী হয়ে থাকে যে, বিরোধীদের পক্ষে তার জবাব দান সম্ভব হয়না। তাঁর শিক্ষা ও সাহচর্যের প্রভাবে লোকদের জীবনধারা সম্পূর্ণ বদলে যায়–যালেম এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা হকপন্থী ও ন্যায় নিষ্ঠ হয়ে যায়, ডাকাত এবং লুণ্ঠনকারীরাও নেককার ও শান্তিপ্রিয় হয়ে যায়, ব্যভিচারী, লম্পট ও অসৎব্যক্তিরা পূণ্যবান এবং পবিত্র হয়ে যায়। মদখোর ও জুয়াড়ী পবিত্র চরিত্র ও খোদাভীরু হয়ে যায়।

রসূল যা কিছু বলেন তা প্রথমে নিজে করিয়ে দেখান। তিনি যে বিধিবিধান ও জীবন–ব্যবস্থার দাওয়াত দেন, তার সবচেয়ে বেশী অনুগত ও অনুসারী তিনি নিজেই হয়ে থাকেন। তিনি তাঁর সাথীদের জীবনেও তাঁর দাওয়াতের বাস্তব প্রকাশ ঘটান। তিনি লোকদের দাবী অনুযায়ী মু'জিযাও দেখিয়ে থাকেন। এসব কারণে একজন নবীর দাওয়াত চূড়ান্ত প্রমান সম্পন্ন করার সর্বশেষ উপায়। যখন নবীর মাধ্যমে কোন জাতির সামনে চূড়ান্ত প্রমান পেশ সম্পন্ন হয়ে যায়, এরপর আল্লাহ তাআলা সেই জাতির মধ্যেকার হক প্রত্যাখ্যানকারীদের বেঁচে থাকার আর অবকাশ দেননা। বরং অপরিহার্যরূপে দুটি জিনিসের কোন একটি হয়ে থাকে। সত্যকে গ্রহণকারীদের সংখ্যা যদি নগণ্য হয়ে থাকে এবং জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সত্যের প্রত্যাখ্যানকারী এবং বিরোধী থেকে যায় তাহলে এই অবস্থায় আল্লাহ তাআলা ঈমানদার সম্প্রদায়কে পৃথক করে সরিয়ে নেন এবং হক প্রত্যাখ্যানকারী ও বিরোধীদের কোন আসমানী এবং যমিনী আযাব পাঠিয়ে ধ্বংস করে দেন। হযরত নূহ (আঃ) হযরত সালেহ (আঃ) হযরত শোআইব (আঃ) প্রমুখ নবীদের জাতির সাথে এই ব্যবহারই করাহয়েছে।

যদি হকপন্থীদের সংখ্যা হকবিরোধীদের মত উল্লেখযোগ্য পরিমান হয়ে থাকে, তাহলে এই অবস্থায় ঈমানাদার সম্প্রদায়কে হক প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এই হক প্রত্যাখ্যানকারীরা যতক্ষণ তওবা করে আল্লাহর দীনকে কবুল করে না নেয় অথবা তাদের অপবিত্রতা থেকে খোদার যমিন যতক্ষণ পাকপবিত্র না হয়ে যায়–ততক্ষণ এই যুদ্ধ চলতে থাকে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চূড়ান্ত ভাবে প্রমাণ পেশ করার পর বণী ইসমাঈলের বিরুদ্ধে এই ধরণের যুদ্ধের ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এই বিধান যে নীতির ওপর ভিত্তিশীল তা হচ্ছে এই যে, আল্লাহর রসূল তাঁর গুপ্ত বিধানের প্রকাশকারী হয়ে থাকেন। তিনি যমিনের বুকে আল্লাহর আদালত হয়ে আসেন। তাঁর প্রেরণের একটি অপরিহার্য ফল হচ্ছে এই যে, হক ও বাতিলের মধ্যে চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে। হকপন্থীরা জয়যুক্ত হবে এবং বাতিলপন্থীরা পরাজিত হবে। যেহেতু এধরনের শাস্তি ও প্রতিফল পাবার জন্য শাস্তির উপযুক্ত লোকদের সামনে আল্লাহর প্রমান চূড়ান্তভাবে পেশ করা জরুরী, এজন্য আম্বিয়ায়ে কেরামদের প্রমান চূড়ান্ত করণের যাবতীয় উপায়–উপাকরণ সহ পাঠানো হয়। এই শর্ত যখন পূর্ণ হয়ে যায়, তখন আল্লাহর আমোঘ বিধান হক প্রাত্যাখ্যানকারী ও আল্লাহর যমিনে বিপর্যয় সৃষ্টকারীদের আর বেঁচে থাকার সুযোগ দেননা। এই শাস্তি যেহেতু চূড়ান্ত প্রমান পেশ করার পর পাঠানো হয় যার–পরে চূড়ান্ত প্রমাণ পেশ করার আর কোন পর্যায় অবশিষ্ট থাকেনা–একারণে এই শাস্তিকে বলপ্রয়োগে জোরপূর্বক দেয়া হয়েছে এরূপ বলা যায়না। বরং আদল ইনসাফের একান্ত দাবীই হচ্ছে তাই।

আম্বিয়ায়ে কেরামদের মাধ্যমে প্রমান চূড়ান্ত হওয়ার পরও যেসব লোক আল্লাহর দীনকে কবুল করেনা–তাদের জন্য যদি আরো কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে তাহলে – তা শুধু এই যে, অদৃশ্য জগতের পর্দা তুলে নেয়া হবে আর তারা যাবতীয় রহস্য সচক্ষে দেখে নেবে। কিন্তু এই ধরনের পর্দা উত্তোলন আল্লাহ তাআলার প্রাকৃতিক বিধানের পরিপন্থী যা এই দুনিয়ায় কার্যাকর রয়েছে। এই দুনিয়ায় আমাদের কাছে ঈমান ও ইসলাম গ্রহণের দাবী জ্ঞানবুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও যুক্তির ভিত্তিতে করা হয়েছে, পর্যবেক্ষন ও প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে নয়। এজন্য জ্ঞান ও যুক্তির জন্য যা কিছু প্রয়োজন যখন তা নবীদের মাধ্যমে পাওয়া যায় তখন অবকাশ দেয়ার কোন অর্থ হয়না এবং এরপর শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রেও অযৌক্তিকতার প্রশ্ন উঠতে পারেনা।

(খ) দ্বিতীয় পন্থা হচ্ছে এই যে, নেককার লোকদের মাধ্যমে তাবলীগ হবে। নবীদের মাধ্যমে চড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করার কাজ যেরূপ পূর্ণাংগভাবে হয়ে থাকে নেককার লোকদের দ্বারা তদ্রূপ সম্ভব নয়। নবীদের কাছে যে উপায়–উপকরণ থাকে তাও তাদের কাছে পরিপূর্ণরূপে থাকেনা। নেককার লোকদের মানসিক এবং আন্তরীক অবস্থাও আম্বিয়ায়ে কেরামদের সমপর্যায়ে উন্নিত হতে পারে না। উপরন্তু মাসুম নবীগণ যেভাবে সংশয়–সন্দেহ এবং কুধারণার উর্ধে অবস্থান করেন, নেককার লোকদের তা থেকে এরূপ মুক্ত হওয়াটা সম্ভব নয়। এজন্য হকের প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে নেককার লোকেরা যে যুদ্ধ পরিচালানা করে থাকে তার উদ্দেশ্য কেবল ন্যায় ইনসাফ ও শান্তি–শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করা। তাদের কেবল এই অধিকার আছে যে, যেসব লোক আল্লাহর দীন কবুল করবেনা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করে তাদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে। কারণ এ ক্ষমতাই তাদের ব্যাধিকে আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের আক্রান্ত করতে পারে। যে পর্যায়ে পৌঁছে তাদের এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে সেই সীমায় তাদের থেমে যেতে হবে। এই সীমা অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি নেই। যদি তারা এই নির্দিষ্ট সীমা লংঘণ করে এক কদমও সামনে অগ্রসর হয় তাহলে এজন্য তারা আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য হবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরে সাহাবায়ে কেরামের যুগে এধরণের যুদ্ধই হয়েছে। সাহাবাগণ নিজেদের বিপক্ষ জাতির সামনে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব পেশ করতেন। এক, ইসলাম গ্রহণ কর এবং ইসলাম গ্রহণ করে প্রতিটি জিনিসে আমাদের সমান অংশীদার হয়ে যাও। দুই, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা হয়ে যাও এবং একটি নির্দিষ্ট কর প্রদান করে তোমাদের ব্যক্তিগত আইন (Personal Law) ছাড়া অন্য যাবতীয় ব্যাপারে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার আনুগত্য কর। তিন, আমাদের যুদ্ধের ঘোষণাকে গ্রহণ কর। এই অবস্থায় যদিও মনে হয় যে, সাহাবাদের এই তাবলীগ খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেরূপ ব্যাপক ও বিস্তারিত ভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন--সাহাবাগণ লোকদের সামনে অনুরূপভাবে দাওয়াত পেশ করতেন না অথবা দাওয়াতকে মনোপূত করার জন্য যতটা আকর্ষনীয় ভাবে পেশ করা দরকার তারা ততটা করেননি।

এই ধারণা সঠিক নয়। আসল কথা হচ্ছে এই যে, সাহাবাদের যুগে হকের একটি সমাজ ব্যবস্থা কার্যত কায়েম হয়ে গিয়েছিল যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতী যুগে বর্তমান ছিলনা। একরণে সাহাবাগণ ইসলামকে হৃদয়াংগম করানোর জন্য বিস্তারিত ও ব্যপক প্রচারের মুখাপেক্ষী ছিলেননা। তাদের প্রতিষ্ঠিত হকের ব্যবস্থা স্বয়ং এই সত্যকে প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, ইসলাম কি এবং তা আল্লাহর বান্দাদের কাছে তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে কোন জিনিসের দাবী করে। এই বাস্তব ও কার্যকর সমাজ ব্যবস্থার কারণে তাদের যুগে প্রতিটি সত্য সুস্পষ্ট এবং প্রতিটি কথা পরিষ্কার ছিল। আকীদা--বিশ্বাস হোক অথবা কাজকর্ম, সমাজ হোক অথবা রাজনীতি--প্রতিটি জিনিস একটি পূর্ণাংগ ও সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি আকারে বিশ্ববাসীর দৃষ্টির সামনে বর্তমান ছিল। প্রতিটি ব্যক্তি তা স্বচক্ষে দেখে অনুমান করতে পারত যে, ইসলামের ভেতর এবং বাহির কি, কোন দিক থেকে তা দুনিয়ার অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার তুলনায় শ্রেষ্ঠ এবং কেন শুধু এই ব্যাবস্থারই টিকে থাকার অধিকার রয়েছে এবং এছাড়া অন্যান্য ব্যবস্থাকে ধ্বংস হয়ে যেতে হবে।

এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থা যখন কায়েম থাকে তখন তা হকপন্থীদেরকে বিস্তারিত ভাবে দাওয়াত পেশ করার দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেয়। শুধু এই ব্যবস্থা কায়েম থাকার কারণেই হকপন্থীদের এই অধিকার থাকবে যে, তারা এই ব্যবস্থার আনুগত্য করার জন্য লোকদের কাছে দাবী জানাবে। লোকেরা যদি এই দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করে তাহলো তারা এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই দাবী মেনে নিতে বাধ্য করবো। অ-নবীদের বেলায় চূড়ান্ত প্রমান সমাপ্ত না হওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষের এই ব্যক্তিগত অধিকার স্বীকার করে যে, সে যে ধরনের আকীদা বিশ্বাসের ওপর কায়েম থাকতে পারে, কিন্তু ইসলাম কোন দলের এই অধিকার স্বীকার করেনা যে,তারা কোন অবিচার পূর্ণ-জীবন ব্যবস্থাকে জনগণের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়েরাখবে।

২· দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, এই যুদ্ধ নেককার লোকদের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে হবে। কেননা ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়াকে বিপর্যয়, বিশৃংখলা ও বিকৃতি থেকে পবিত্র করা। এজন্য যেসব লোক বিকৃতি ও বিপর্যয়ে লিপ্ত রয়েছে তাদের দ্বারা এই যুদ্ধপরিচালিত হওয়ার কোন অর্থ নেই। যে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আল্লাহ তাআলা জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন, সেই উদ্দেশ্যের ওপর যেসব লোকের শতকরা একশোভাগ ঈমান রয়েছে-এই জিহাদ কেবল তাদেরই কাজ এবং কেবল তারাই এই জিহাদ করতে পারে। এই ধরণের লোকদের জন্যই তরবারী ধারণ করা জায়েয এবং তাদের যুদ্ধকেই 'আলজিহাদু ফী সাবীলিল্লাহ' বা 'আল্লাহর পথে জিহাদ' পরিভাষার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। তারা যদি এই জিহাদে নিহত হয় তাহলে তারা শহীদের মর্যাদা লাভ করে। আর যদি জীবিত ফিরে আসে তাহলে গাজী অর্থাৎ আল্লাহর পথের সৈনিক উপাধি পাবার অধিকারী হয়। যে সত্য ও ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেই সত্যের প্রতি যাদের ঈমান নেই ইসলাম তাদেরকে কোন একটি লোকেরও রক্তপাত করার অধিকার দেয়না। যদি তারা কোন ব্যক্তির রক্তপাত ঘটায় তাহলে তাদের এই কাজ একটি বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ হিসাবে গণ্য হবে এবং এজন্য তাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

ভাড়াকরা লোকদের নিয়ে ইসলামী ফৌজ গঠিত হতে পারেনা। বরং তা এমন লোকদের সমন্বয়ে গঠিত হয় যারা ইসলামের ওপর ঈমান রাখে এবং তার জন্যই যুদ্ধ করে, মৃত্যু বরণ করে। ইসলামী ব্যবস্থার প্রকৃতিগত দাবীই হচ্ছে তা কেবল তার অনুসারীদের দ্বারাই প্রসারিত হবে এবং যেসব লোক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও হকের প্রতিষ্ঠার খাতিরে ইসলাম প্রচারের জন্য চেষ্টা করে কেবল তারাই এটা প্রচার করবে। তাদের প্রচেষ্টার মধ্যে যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং সত্যের প্রতিষ্ঠার পবিত্রতম

উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন আবেগ শামিল হয়ে যায়, তাহলে তাদের এই প্রচেষ্টা ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল মূল্যহীনই নয়, বরং তারা এজন্য যে রক্তপাত ঘটিয়েছে তার শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

একারণেই আম্বিয়ায়ে কেরাম জিহাদের ঘোষণা দেয়ার পূর্বে এই ফরজ আদায় করার জন্য নেককার লোকদের নিয়ে দল গঠন করেছেন। তারা ভাড়াকরা লোকদের নিয়ে কোন সেনাবাহিনী গঠন করেননি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধের ব্যাপারে কোন কোন সময় এমনও হয়েছে যে, যেসব লোক ইসলামের ওপর ঈমান রাখতনা এবং শুধু বংশ, গোত্র, ভাষা ও বর্ণভিত্তিক জাতিত্ববোধে অনুপ্রাণিত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহায্য করতে চাইত তারা মুসলামানদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করার জন্য নিজেদের খেদমত পেশ 'করত। তিনি তাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করেননি এবং পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, যে উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে সেই উদ্দেশ্যের প্রতি যাদের ঈমান নেই আমি এ কাজে তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারিনা। হযরত মূসা (আঃ), হযরত দাউদ (আঃ), হযরত সুলায়মান (আঃ) প্রমুখ নবীগণ যেসব যুদ্ধ করেছেন তা সবই ঈমানদার নেককার লোকদের সাহায্য নিয়ে করেছেন।

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের দ্বারাও একথা প্রমাণিত যে, তাঁদের যুগেও যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে তার সবই এমন লোকদের দ্বারা হয়েছে যারা বিশ্বাসে ও কর্মে ইসলামের প্রতি অনুগত ছিল। যে জিনিসের প্রচারের জন্য তাদেরকে তরবারী ধারণের অধিকার দেয়া হয়েছে তার প্রতি ছিল তাদের অবিচল ঈমান। তাদের প্রভাব এত বিস্তৃত ছিল যে, ইচ্ছা করলে তারা সহজেই ভাড়াকরা লোকের সাহায্যে সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে পারতেন। শুধু তাই নয় তারা নিজেদের লোকদের নিয়েও বেতনভুক সেনাবাহিনী গঠন করেননি। যখন যুদ্ধের মুহূর্ত সামনে এসে যেত প্রতিটি ব্যক্তি নিজের রসদ এবং নিজের বাহন নিয়ে বেরিয়ে পড়ত এবং শুধু ইকামতে দীনের খাতিরেই জিহাদ করত। তাদের সতর্কতা ও তাকওয়ার মান এতটা উন্নত ছিল যে, শত্রুর সামনা সামনি হওয়ার ঠিক মুহূর্তে যদি কারো অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আবেগ ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াবী আকর্ষণ এসে যেত তাহলে সাথে সাথে তারা নিজেদের তরবারী কোষবদ্ধ করে নিতেন। তাদের ভয় ছিল নিজেদের ব্যক্তিগত খাহেশের বশবর্তী হয়ে যেন তাদের হাতে অন্যের রক্তপাত না ঘটে।[২]

৩· তৃতীয় শর্ত হচ্ছে এই যে, এ যুদ্ধে একজন ক্ষমতাসীন ও কর্তৃত্বের অধিকারী আমীরের নেতৃত্ব পরিচালিত হতে হবে। কর্তৃত্বসম্পন্ন ও ক্ষমতাসীন আমীর বলতে নিজের জামাআতের ওপর তার আইনানুগ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কায়েম থাকতে

হবে, তিনি লোকদের ওপর শরীআতের আইন জারি করে এর আনুগত্য করতে তাদের বাধ্য করতে পারেন। এবং তিনি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তির অধীনস্ত হবেন না। এই শর্তের সবচেয়ে পরিষ্কার প্রমান হচ্ছে এই যে, নবী–রসূলদের কেউই যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের অনুসারীদের নিয়ে হিজরত করে কোন মুক্ত এলাকায় সুসংগঠিত হতে পারেননি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন যুদ্ধের ঘোষণা দেননি। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জীবন চরিত থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন থেকেও এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। পাবর্তীকালেও যারা আম্বিয়ায়ে কেরামের পন্থা অনুযায়ী এই ফরজ আঞ্জাম দেয়ার চেষ্টা করেছেন–যেমন হযরত সইয়েদ আহমদ শহীদ এবং মাওলানা ইসমাঈল শহীদ–তাঁরাও এ জিনিসটিকে দৃষ্টির সামনে রেখেছেন। তাঁরা একটি মুক্ত এলাকায় পৌছে প্রথমে নিজেদের স্বার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করেছেন এবং নিজেদের জামাআতকে সুসংগঠিত করে তাদের মধ্যে ইসলামী শরীআতের যাবতীয় আইন কানুনও কার্যকর করেছেন।

এই শর্তের দুটি কারণ রয়েছে।

(ক) প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাআলা কোন বাতিল ব্যবস্থাকে উৎখাত করাটা ততক্ষণ পর্যন্ত পছন্দ করেন না।

যতক্ষণ এই সম্ভাবনা না থাকে যে, যেসব লোক এই বাতিল ব্যবস্থার উৎখাতে লিপ্ত আছে তারা এর পরিবর্তে কোন হকের ব্যবস্থা কায়েম করতে পারবে। নৈরাজ্য ও বিশৃংখল অবস্থা হচ্ছে একটি অপ্রাকৃতিক অবস্থা। বরং এটা মানব প্রকৃতির এতটা পরিপন্থী যে, একটি অবিচারমূলক ব্যবস্থাও এর পরিবর্তে অগ্রাধিকার পেতে পারে। একারণেই আল্লাহ তাআলা এমন কোন দলকে যুদ্ধ বাধাবার অধিকার দেননি যা সম্পূর্ণ অপরিচিত, যার শক্তি ও ক্ষমতা অজ্ঞাত ও সংশয়পূর্ণ, যার ওপর কোন ক্ষমতাশালী আমীরের কর্তৃত্ব কায়েম নেই, যার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার পরীক্ষা হয়নি, যার জনশক্তি বিক্ষিপ্ত ও বিশৃংখল অবস্থায় রয়ে গেছে, যা কোন ব্যবস্থাকে উলোটপালট করে দিতে পারে সত্য কিন্তু তদস্থলে এই বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থাকে সুসংহত

২· ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকরা কোন কোন অবস্থায় ইসলামী জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু তার শর্তাবলী এবং পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের। এখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। আমার অন্য পুস্তকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

করতে সক্ষম–এরূপ প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। এই ভরসা কেবল এমন একটি জামায়াতের ওপরই করা যায়–যারা কার্যত একটি রাজনৈতিক দলের আকার ধারণ করেছে এবং নিজের গণ্ডির মধ্যে এমন ভাবে সুশৃংখল সুসংগঠিত যে, তার ওপর 'আল–জামায়াত' পরিভাষা প্রযোজ্য হতে পারে। এই ধরণের বৈশিষ্ট ও মর্যাদা অর্জন করার পূর্বে কোন জামায়াতকে 'আল–জামায়াত' হওয়ার চেষ্টা করার অধিকার নেই। তবে তাদের এই প্রচেষ্টা জিহাদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু সশস্ত্র জিহাদ করার জন্য পদক্ষেপ শুরু করার অধিকার তাদের নেই।

(খ) দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে, জনগণের জানমালের ওপর যুদ্ধে লিপ্ত কোন জামায়াতের যে কর্তৃত্ব কায়েম হয় তা এতটা অসাধারণ এবং গুরুত্বপূর্ণ যে, এমন কোন জামায়াত তা আয়ত্বে রাখতে পারেনা–যার ওপর তার নেতার নৈতিক পর্যায়ের কর্তৃত্ব স্বীকৃত। নৈতিক পর্যায়ের কর্তৃত্ব লোকদেরকে যমিনের বুকে বিশৃংখলা সৃষ্টি থেকে বিরত রাখতে সক্ষম নয়। এ কারণে শুধু নৈতিক কর্তৃত্বের ওপর ভরসা করে কোন ইসলামী দলের নেতার পক্ষে তার অনুসারীদের তরবারী ধারণের অনুমতি দেয়া জায়েয নয়। অন্যথায় একবার তরবারী যখন চমকে উঠবে তখন তা হালাল–হারামের সীমার অনুগত না থাকার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। তাদের দ্বারা এমন সবকাজ হবে যার উৎখাতের জন্যই তরবারী ব্যবহার করা হয়েছিল।

সাধারণ বিপ্লবী দলগুলো–যারা শুধু একটি বিপ্লব ঘটাতে চায় এবং যাদের দৃষ্টির সামনে এর বেশী কিছু থাকেনা যে, তারা বর্তমান ব্যবস্থাকে ওলোটপালট করে দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের কর্তৃত্ব খতম করে তদস্থলে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করবে–এ ধরণের বাজি খেলে এবং খেলতে পারে। তাদের দৃষ্টিতে কোন ব্যবস্থার ভেংগে পড়াটাও কোন দুর্ঘটনা নয় এবং জুলুম অত্যাচারের আশ্রয় নেয়াটাও কোন অপরাধ নয়। এ কারণে তাদের জন্য সবকিছুই জায়েয।

কিন্তু একটি ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যপ্রিয় দলের নেতাদের অবশ্যই দেখতে হয় যে, তারা যে ব্যবস্থা থেকে আল্লাহর বান্দাদের মুক্তি দিতে চাচ্ছে–তার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা তাদের জন্য কায়েম করার যোগ্যতা তাদের আছে কি না? যে জুলুম অত্যাচারকে তারা নির্মূল করার পদক্ষেপ নিচ্ছে–নিজেদের লোকদেরকেও এই ধরণের অত্যাচার থেকে বিরত রাখতে তারা সক্ষম কি না? যদি তা না হয় তাহলে লোকদের জানমাল নিয়ে বাজি খেলার অধিকার তাদের নেই। তাহলে তারা যে বিপর্যয়ের মুখ বন্ধ করার জন্য তরবারী ধারণ করেছিল সেই বিপর্যয় নিজেরাই সৃষ্টি করে বসবে।

৪· চতুর্থ শর্ত হচ্ছে শক্তি অর্জন। কিন্তু নেককার লোকদের সংগঠনকে এজন্য আলাদা কোন বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন নেই। উপরে যে তিনটি শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে তা যথাযথভাবে পূর্ণ করতে পারলে প্রয়োজনীয় শক্তি আপনা আপনি এসে যায়। একটি সঠিক দাওয়াত বিভিন্ন ধরণের শক্তি ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের নিজের চারপাশে সংঘবদ্ধ করে নেয় এবং তাদের মাধ্যমেই প্রয়োজনীয় পুঁজিও সরবরাহ হয়ে যায় এবং কাজের প্রয়োজনীয় উপায়–উপকরণ অথবা তা সৃষ্টি করার যোগ্যতাও তাদের মধ্যে পাওয়া যায়। অতপর যখন তা সংগঠনের আকার ধারণ করে এবং একটি স্বাধীন পরিবেশে নিজেকে একটি আনুগত্যের অধীন করে নেয়–তখন তার নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিও দ্বিগুণ হয়ে যায় এবং বস্তুগত উপায়–উপকরণ সরবরাহ ও সৃষ্টি করার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। অতএব শক্তি অর্জনের বিষয়টি মূলত উল্লেখিত শর্তসমূহ পূরণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। শক্তি অর্জনের জন্য এর থেকে ভিন্নতর কোন বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়না। তবুও আক্রমনাত্মক যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহও একটি অপরিহার্য শর্ত। এই শক্তি অর্জনের পূর্বে যদি কোন জামায়াত যুদ্ধের ঘোষণা দেয় তাহলে সে নিজের হাতে নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করার অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

এই সব শর্তের ধরণ ও স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার পর আপনা আপনিই এই সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠে যে, কোন হকের দাওয়াতের ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রসংগটি দাওয়াত ও হিজরতের পর্যায় অতিক্রম করার পর কেন আসে? মূলত এই দুটি পর্যায় অতিক্রম করার পরই–যাদের বিরুদ্ধে ইসলাম যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছে–তারা সুনির্দিষ্ট ভাবে সামনে এসে যায়। আর এই দুটি পর্যায় অতিক্রম করার পরই কোন সংগঠন সঠিক অর্থে আপন সত্তায় প্রতিভাত হয়–তরবারীর সাহায্যে ন্যায়–ইনসাফ ও শক্তি–শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করায় যার অধিকার রয়েছে। যেসব লোক আম্বিয়ায়ে কেরামের কাজের এই ধারাপথ সম্পর্কে অবহিত নয় এবং শুধু সাধারণ বিপ্লবী সংগঠণ সমূহের কর্মপন্থার দ্বারা প্রভাবিত, তাদের এই সব পর্যায়ের উপকারিতা ও পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করা উচিৎ।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—